যে শুভ খনে মম

লিলি দেবী

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দোল পূর্ণিমা—১৩৫৩ সাল

প্রিন্টার—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচা[illegible]
শৈলেন প্রেস
৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিক[illegible]

উৎসর্গ

সাহিত্যাচার্য্য

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাদামহাশয় শ্রীচরণেষু ।

আমার প্রথম উপন্যাস

আপনার চরণে সমর্পণ করিয়া

ধন্য হইলাম ।

—আপনার চির-স্নেহের—লিলি

কয়েকটি কথা

উপন্যাসের ভূমিকা লেখার রীতি আজকাল নেই, তবু দু'চারটি কথা না লিখে পারছি না।

বাংলা সাহিত্যে এই আমার প্রথম উপন্যাস। ইতিপূর্ব্বে সাময়িক পত্রের মারফৎ দু'চারটি গল্প প্রকাশ করেছি মাত্র। সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমার এই প্রথম লেখা অত্যন্ত সংকোচ নিয়েই প্রকাশ ক'রছি। এই সংকোচ কাটাবার ভার বাংলার পাঠকপাঠিকাদের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রছে।

আমার রচনাটি হয়তো অপ্রকাশিত থেকে যেতো যদি না সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশক, ডি, এম, লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীগোপালদাস মজুমদার মহাশয়ের অসীম স্নেহ এবং অনুগ্রহ না পেতাম। তাঁ'র প্রেরণা পেয়েই আমি প্রথম উপন্যাস লিখ্‌তে সাহসী হই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাঁ'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

আর একজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালে আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি থেকে যায়। যিনি সাগ্রহে আমার রচনাটি 'ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট্‌' অবস্থায় পড়ে প্রকাশ করার জন্য আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং আগাগোড়া এর ভুল সংশোধন করে' আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করেছেন, তাঁ'র নাম কা'রও অজানা নয়—তিনিই বেতারের স্বনামধন্য শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

আরও একজনের আপ্রাণ চেষ্টায় এত শীগ্‌গির এই উপন্যাসখানি প্রকাশ করার সুযোগ পেলাম—এঁদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ ক'রলাম।

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
দোল-পূর্ণিমা
২৩শে ফাল্গুন,
১৩৫৩

—লেখিকা

যে শুভ খনে মম

অপরিচ্ছন্ন ও মোটামুটি একটি মেসের কামরায় বসিয়া শ্যামলাল একখানি চিঠি পড়িতেছিল। চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে সে যে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল দেখিলেই বোঝা যায়।

একটি চব্বিশ পঁচিশ বছরের সুশ্রী যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি শ্যামদা, কার চিঠি—বউদির বুঝি, খবর সব ভালতো? বলিয়াই সে অদূরে একটি চৌকির উপর বসিয়া পড়িল।

শ্যামলাল একবার তাহার দিকে চাহিয়াই পুনরায় চিঠিখানি পড়িতে লাগিল—পড়া শেষ করিয়াই সে চিঠিখানি আগন্তুকের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, দেখ ভন্ট তুই দেখ। মা চিঠি লিখেছে—তোর বউদির অসুখ করেছে; হুকুম হয়েছে আমাকে যেতে হবে। মাইরি বলছি, আমার বাড়ীর লোকের আক্কেলখানা একবার দেখ।

ভন্টু সে কথার জবাব না দিয়া চিঠিখানি পড়িতে আরম্ভ করিল।

শ্যামলাল আপন মনে তখন বকিয়া যাইতেছে—আমি যেন পয়সার গাছ, যাওয়া বললেই যাওয়া।

তোদের চোখের সামনে দিয়েই গত সপ্তাহে বাড়ী গেলাম, দেখলি

তো? শুনে আটটি টাকা খরচ হ'য়ে গেল। আবার আজ বাড়ী যাই কি ক'রে?

বিস্ময়ের ভান করিয়া ভণ্টু বলিল, ফের আজ আবার বাড়ী যেতে লিখেছে—এ সত্যিই অন্যায়।

শ্যামলাল কাঁদ কাঁদ সুরে বলিল, দেখ্ দেখি।

হাসি চাপিয়া বেশ গম্ভীর হইয়া ভণ্টু বলিল, তুমি তো আর ডাক্তার নও। তা' মিছেমিছি তোমার যাওয়ার কি দরকার। তোমাদের গ্রামে ডাক্তার-ফি কত?

শ্যামলাল বলিল, ডাক্তার এক টাকায় পাওয়া যায় আর ক'বরেজ আট আনায় আসে।

ভণ্টু বলিল, তা'হলে ক'বরেজই তো ভালো। ক'বরেজরা প্রায়ই নাড়ী জ্ঞানে বেশ বিচক্ষণ হয়—অথচ ফিও অর্দ্ধেক।

শ্যামলালের চোখে যেন খানিকটা আশার আলো আসিয়া পড়িল। সে একটু ভাবিয়া বলিল, তাই লিখে দিই, কি বলিস্ ভণ্টু? হারাণ ক'বরেজকে বরং দু'দিন এনে দেখাক্। কি আর করবো, চারদিক্ দিয়েই খরচ।

ভণ্টু বলিল, তাই দেখছি শ্যামদা, তোমার আর কোন উপায় নেই। কি আর করবে বল—গ্রহের ফের।

হঠাৎ মেসের চাকরকে দেখিয়া ভণ্টু বলিল, কি হে বাবজী নেপালচন্দ্র-তুমি কি মনে করে?

নেপাল শ্যামলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনার কাছে দোলের পাব্বনি পাইনি, অনেকদিন হ'য়ে গেল—আজ যদি দেন বড়ো ভালো হয়।

ভণ্টু হাসিয়া ফেলিল—তোরা সবাই মিলে শ্যামদাকে পাগল করে

ছাড়বি দেখছি। একেই বলে শ্যামদার দুঃসময় চলছে—ডাক্তার, বদ্যি কত কাণ্ড—ওদিকে বাড়ীতে মা, বউ—এদিকে নেপালচন্দ্র।

শ্যামলাল ভন্টুর কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ দেখনা, মরছি নিজের জ্বালায় আর পার্ব্বনি পার্ব্বনি ক'রে মাথা খারাপ ক'রে দিলে।

নেপাল যে শ্যামলালের কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হইল তাহার লক্ষণ দেখা গেল না। ভন্টু তাহার দিকে চাহিয়া একটু চোখ টিপিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আচ্ছা, চলি শ্যামদা, প্রায় ন'টা বাজে।

হুগলী জেলার অন্তর্গত শিউড়ী গ্রামে শ্যামলালের বাড়ী। ষ্টেশনের সন্নিকটেই বাড়ী। গ্রামটিতে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস তো আছেই, তা'ছাড়া মধ্যবিত্ত লোকদেরও বসবাসের উপযোগী গ্রামটি। বিশেষ কোন অসুবিধাই নাই। একটি হাই স্কুল, পোষ্টাফিস, বাজার এবং সরকারি হাসপাতালও আছে। অনতি দূরে গঙ্গা—দৃশ্যও বেশ মনোরম। জল-হাওয়া ভালই ছিল, কিছুদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে।

শ্যামলালের বাবা বহুদিন মারা গিয়াছেন। পিতার জমিজমা কিছু ছিল, এবং মায়ের গায়ের গহনা ছিল আর নগদ সামান্যই ছিল।

পিতা হরমোহন বেশ বিষয়ী ও মিতব্যয়ী লোক ছিলেন। গ্রামের লোকের মুখে মুখে একটা প্রবাদও নাকি প্রচলিত ছিল যে তাঁহার মুখ দেখিলে সেদিন বুঝি অন্ন জোটা ভার।

পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে শ্যামলাল পিতৃদত্ত এই গুণটির অধিকারী হইয়াছে। মা দুর্গাদেবী চিরদিনই নীরব প্রকৃতির মানুষ, স্বামীর মৃত্যুর পর বহু কষ্টে একমাত্র সন্তান শ্যামলালকে মানুষ করেন।

বিধবা স্বামীর শেষ উপদেশ স্মরণ করিয়া সামান্য যাহা কিছু পুঁজি ছিল তাহারই কিছু সুদে খাটাইয়া এবং কিছু বা বন্ধকী কারবারে

লাগাইয়া কিছু জমাইয়া ফেলেন, এবং পুত্র শ্যামলালও পিতার আদর্শে অল্প বয়স হইতেই মিতব্যয়িতা শিক্ষা করে।

শ্যামলালকে টিফিনের একটি পয়সাকে জমাইয়া মাস শেষে সাড়ে সাত আনাকে বছরে টাকা ও আনায় পরিণত করিয়া গোয়াল পাড়ায় দাদন দিতে দেখা যাইত। পাড়ার মুরুব্বিরা মন্তব্য করিতেন, জাত সাপের চাইতে তার 'ড্যাকার' জোর বেশী। কালে যে শ্যামলাল একজন হইবে এ বিষয়ে তাঁহারা নিঃসন্দেহ ছিলেন।

শ্যামলাল সত্যই হুঁসিয়ার ছেলে। লেখাপড়া করিলে ভবিষ্যতে পয়সার সম্ভাবনা আছে—সে বিষয়ে শ্যামলালের সম্যক জ্ঞান ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সে যে রাত্রে হ্যারিকেন জ্বালিয়া পড়িতে বসিবে সে ছেলেও শ্যামলাল ছিল না।

স্কুল-মাষ্টারদের মনস্তুষ্টি করিয়া এবং তাঁহাদের বাড়ী যাইয়া তাঁহাদের যাবতীয় কাজ করিয়া দিতে সে লজ্জাবোধ করিত না। কাজেই মাষ্টার মহলে শ্যামলালের সুনাম ছিল, এবং সেই সঙ্গে মাষ্টারদের কাছ হইতে যাবতীয় নিজের পড়া বুঝিয়া লইত।

শিশুকাল হইতে শ্যামলালের ধারণা যে, বিনা স্বার্থে এক পা অগ্রসর হওয়া বোকামি। নিজের সুবিধা হইলে কোন কাজই করা অসম্ভব নয়। দুনিয়ায় একমাত্র জিনিস পয়সা, এবং সেই পয়সা উপায় করিতে হইলে পরিশ্রমের প্রয়োজন।

একটা পয়সা যেখানে মাটি খুঁড়িলে মিলিবে না সেখানে সেই পয়সার অসদ্ব্যবহার মানুষ যে কি করিয়া করে, ছেলেবেলা হইতেই শ্যামলাল ভাবিয়া পাইত না।

যাহাই হো'ক, যথা সময়ে শ্যামলাল ম্যাট্রিক পাস করিল, এবং

মামাদের সুপারিশে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট অফিসে তাহার একটি চাকরিও জুটিল।

দুর্গাবতীর বাপের বাড়ীর সবাই বেশ কৃতী এবং উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। ভাইয়েরা আসিয়া দুর্গাবতীকে প্রায়ই বলিত,—দিদি তুই কেমন হ'য়ে গেছিস—তোর ছেলেটাও এই বয়সে যেন জ্যাঠামশাই।

শ্যামলালের মেজ মামা একবার শ্যামলালের কাছে বহুদিন আগে দু'টি টাকা ধার লইয়াছিল।

শ্যামলাল বিনা দ্বিধায় বলিয়াছিল, সুদ দিতে হবে কিন্তু।

মামা হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন, হবেরে হবে। টাকা দেবার সময় মামা সুদের চারিটি পয়সা দিতে ভুলিয়া যান, কিন্তু শ্যামলাল চাহিয়া লইতে ভোলে নাই।

পুত্রের ব্যবহারে মা লজ্জিত হইয়াছিলেন। ছেলে মাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—পয়সার কাছে কোন মামাই না। এই শ্যামলালের স্ত্রীই ভারতী এবং অসুখটা তাহারই।

ভারতী আজকালকার আধুনিকা মেয়ে। ভাগলপুরে তাহার বাবা থাকেন। শ্যামলালের পিসিমাও ভাগলপুরে থাকেন। সেই সূত্রে এবং প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে অতি অল্প বয়সেই শ্যামলালের সহিত ভারতীর অদৃষ্ট গাঁথা হইয়া গিয়াছিল।

পিসি, মাসী, মা এবং মামা, মামী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজন থাকা সত্ত্বেও শ্যামলাল নিজের ওজন অনুসারে দাবি করিতে ভোলে নাই। মেয়ে সুন্দর হ'ক বা না হ'ক, শ্যামলালের কিছু আসে যায় না। গুণ থাকিলেই যথেষ্ট।

মা কিন্তু ছেলের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ভীত হইলেন, এবং ভ্রাতাদের

সহিত যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন—সহরের একটি যদি বয়স্থা ও সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনিতে পারেন, তবে যদি ছেলের কিছু পরিবর্ত্তন হয়।

যথা সময়ে শ্যামলাল বাঁকিয়া বসিল। ওরে বাবা, সহরের মেয়ের খাঁই—মেটাবে কে? আজ স্নো, কাল পাউডার, মাসে মাসে বিভিন্ন ডিজাইনের ব্লাউজ! কি দরকার বাবা গরিবের ঘোঁড়া রোগে। তা'ছাড়া আবার কোন দিন ধরে বসবে—কলকাতায় গিয়ে সিনেমা দেখবো।

কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডন করিবার সাধ্য মানুষের নাই। কাজেই ভারতীর সহিত শ্যামলালের শুভ বিবাহও কেহ আটকাইতে পারিল না।

ভারতী সত্যই সুন্দরী। কথা বলিবার ভাল 'এটিকেট্' তাহার জানা আছে। ভাগলপুরে, কত ছেলে তাহার পাণি-প্রার্থী হইতে চাহিয়াছিল। গান, বাজনা, সেলাই-ফোঁড়াই সবই জানা আছে। লেখা-পড়ায়ও তাহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে।

ফুল-শয্যার রাত হইতেই শ্যামলাল সতর্ক হইল। দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলেই খরচ আছে। তবে একথা বলিলে ভুল হইবে না যে শ্যামলাল ভারতীকে সত্যই ভালবাসে। কিন্তু তাই বলিয়া আজকালকার নব্য যুবকদের মত বাড়াবাড়িও তাহার ভাল লাগে না।

ভারতীকে বোঝাইতে চেষ্টা করে সে,—তুমি আমার সহধর্ম্মিনী, তোমার জন্যেই রোজগারপাতি; তুমি হুঁসিয়ার না হলেই আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শনিবারে বাড়ী যাইয়া সোমবারে সে ফিরিত, তবে অবশ্য মাসে একবার। যদি কোনদিন ভারতী আবদার করিয়া বলিত—গত শনিবারে এলেনা কেন? তাহা হইলে শ্যামলাল গর্ব্বের সঙ্গে স্ত্রীকে বোঝাইত—এই দেখ ছেলেমানুষি। তুমি তো আমারি, আমার চোখের সামনে সর্ব্বদাই তুমি থাকো, তাই দরকার হয় না বাড়ী আসবার।

যত আধুনিকাই ভারতী হ'ক, শ্যামলালের একথার কি উত্তর দিতে হয় সে জানিতো না। ভারতীর কিন্তু মুস্কিল হইত বন্ধুদের বোঝাইতে। পরিণামের প্রসঙ্গ তাহাদের বোঝাইতে গেলে—বন্ধুরা গালে হাত দিত—ওমা একি! যে বয়সের যা—তুই একা পড়ে থাকিস্ গাঁয়ে; কলকাতায় বাসা ক'রে তোকে না হয় নাই নিয়ে গেল—তা'বলে প্রত্যেক শনিবারেও আসবে না? এখন না খেয়ে না পরে যৌবন শুকিয়ে যাক্, বুড়ো বয়সে তোর বর টাকার হুণ্ডি এনে দেবে—তুই তখন বসে বসে গুনিস্।

ভারতী লজ্জিত হইত—এ কথার কি উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইত না।

রমা ভারতীকে গল্প করিতে করিতে বলে, জানিস্ ভারতী—একটা টিউশানি পেয়েছিল 'ও' মোটা টাকার। তা কি বললে জানিস্? 'দরকার নেই বাপু পয়সার—নেহাৎ চাকরি না করলে নয় তাই করা'। 'ও' আবার আমাকে বলে, 'জান রমা—কলেজে গিয়ে সময় কাটেনা'! আর তোর বরের কি জানি ভাই, সবই উল্টো।

ভারতী চিন্তা করিয়া সূত্র খুঁজিয়া পায় না, তালগোল পাকাইয়া যায়। কি জানি কেন, শ্যামলালকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না সে। সত্যই তো রমা যা বলে, তা'র মধ্যেও নিগূঢ় সত্যের ছাপ রহিয়াছে। কোন এক অজানিত আশঙ্কায় মন তার ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

এক মনে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে চোখ দু'টি তার সজল হইয়া উঠে। মনে পড়ে দূর ভাগলপুরকে, আজন্মের স্নেহের নীড়—ও পিতা মাতাকে। দিদি, তারও বিবাহ হইয়াছে দিল্লীতে—স্বামী ডাক্তার। সব থেকে বেশী করিয়া মনে পড়ে ছোট্ট ভাই শানুকে। কি ভালই

না বাসিত শানু ভারতীকে, দিদি ছাড়া একদণ্ডও চলিত না। সেই শানুকে সে কতদিন দেখে নাই, প্রায় বছরখানেক।

শ্যামলাল পছন্দ করে না, ঘন ঘন বাপের বাড়ী যাওয়া আসা।

শাশুড়ী দুর্গাবতী অবশ্য মাঝে মাঝে দরদীকণ্ঠে বলেন—বাছা আমার কতদিন এসেছে।

শুভ্র মেঘ পানে চাহিয়া চাহিয়া ভারতী নিঃশ্বাস ফেলে। ভাবে, হয়ত বা এই মেঘ ঘুরিতে ঘুরিতে যাইবে তাহারি আজন্মের বহু পরিচিত—সেই ভাগলপুরে।

কতক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করে ঠিক নাই, হঠাৎ রমার ডাকে চমক ভাঙে।

—ভারতী যাবি, বোসেদের তাল পুকুরে চান কর্‌তে? ওমা, একা বসে এখানে কি করছিস; শ্যামদার ধ্যান করছিস্ বুঝি?

বিষণ্ণ হইয়া ভারতী উত্তর দিল, ধ্যান করাটা কি অন্যায়?

রমা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, তা—আমি কি মানা করছি। হঠাৎ ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোর মুখটা শুখনো কেনরে ভারতী—তোর কি হয়েছে?

মৃদু হাসিয়া ভারতী বলিল, কই কিছুই না তো।

গা স্পর্শ করিয়া কি বলিতে গিয়া রমা বিস্ময়ের সুরে বলিল, তোর জ্বর হয়েছে?

ভারতী বাধা দিয়া বলিল, কই জ্বর—না তো।

রমা বলিল, না—কিরে। 'জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠাইমা।'

কি রে, রমা ডাকছিস? দুর্গাবতী ঢেঁকিশালে বসিয়া ধানে পেঁকেল দিতেছিলেন, রমার ডাকে উত্তর দিলেন, এবং ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—তা যাওনা বাছা রমার সঙ্গে গিয়ে স্নান ক'রে

এস গে। চাবিটা বরং আমায় দিয়ে যাও—শোবার ঘরে তালা লাগিয়ে।

রমা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, না জ্যেঠাইমা তোমার বউএর জ্বর হয়েছে।

জ্বর কেন? দুর্গাবতী উঠিয়া আসিতেই ভারতী বিব্রত হইয়া প্রতিবাদ করিল, না মা সামান্য, কিছুই না। রমা বাড়িয়ে বল্‌ছে।

দুর্গাবতী উত্তর দিলেন, না বাছা, জ্বর জ্বালা ভালো না। আপন মনেই বলিলেন, তাইতো, শুধু শুধু জ্বরই বা হলো কেন?

.. ..

পুত্রবধূর উপর—সাধারণতঃ শাশুড়ীর যেরূপ মনোভাব হয়, দুর্গাবতীর সেরূপ ছিল না। বরং বলিতে গেলে দুর্গাবতী ভারতীকে স্নেহ একটু বেশীই করিতেন। শ্যামলালের তরফ হইতে বউ বেচারীর কিছুই প্রত্যাশা ছিল না। শুধু শুধু পরের মেয়ের উপর এই অবিচারে সময় সময় দুঃখিতই হইতেন। তবে যা'কে কেন্দ্র করিয়া মনের এই ভাবান্তর—নীরব শ্যামলালের কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

জগতের সার জিনিস পয়সা, শুধু তাহারি ধ্যানে তখন শ্যামলাল মগ্ন। আর তাহারি অবিচারে তাহারি স্ত্রী ভারতী তখন মনের জ্বালায় অহনিশ অশান্তি ভোগ করিতেছে। কিন্তু শ্যামলাল ও সব দুর্ব্বলতাকে মনের মধ্যে পোষণ করিয়া বাতুলতাকে প্রশ্রয় দেয় না।

তা'র ধারণা মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য—মোটামুটি খাওয়া পরা পাইলেই যথেষ্ট।

মা দুর্গাবতীকে শ্যামলাল ভাল ভাবেই জানে। খরচ পত্র বরং একটু বেশীই করিয়া থাকেন তিনি। কাজেই খাওয়া পরার দিক দিয়া

ভারতীর বিশেষ কোন কষ্ট নাই। আবার সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে কি প্রত্যাশা করিতে পারে? শ্যামলালের ধারণা ভারতী সর্ব্বসুখী।

শ্যামলালের চাকরিটি সত্যিই ভাল, মাহিনাও মোটা। এরই মধ্যে শ্যামলাল মাহিনা পায় ১১০্ টাকা। ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনাও আছে, তা'ছাড়া উপরওয়ালাদের নজরও শ্যামলালের উপর ভালই আছে। শ্যামলাল খোশামোদ করিতে পটু। অফিসে গিয়া কিরূপে যোগ্য ব্যক্তিকে তোয়াজ করিতে হয়—সে তাহা জানে। বাড়তি খাটুনিও তাহাকে অনেক খাটিতে হয়। রবিবার ছাড়া, নিজের কোন প্রয়োজনে অফিস হইতে একদিনও ছুটি লয় না সে। আর নিজের বলিতে এক পয়সা বাহুল্য খরচও নাই, শুধু মেসের খরচ যাহা যেটুকু।

ভবানীপুর অঞ্চলে খুব নিম্ন শ্রেণীর একটি মেসে শ্যামলাল থাকে। মাসিক 'চার্জ্জ' বাইশ টাকা। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া ইহাপেক্ষা শ্যামলাল আর সুবিধা করিতে পারে নাই।

অফিস টাইমে শুধু ট্রামে যায়, আসে হাঁটিয়া। মেসের বাসিন্দারা মুখ টিপিয়া হাসে এবং ঠাট্টা করে। শ্যামলালের কিন্তু ওসব বাজে কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই।

ভারতী যখন তাহারি ধ্যানে চোখের জলের মালা রচনা করে—শ্যামলাল তখন ব্যাঙ্কের পাস বই লইয়া হিসাব করিতে বসে, এবং মাস কাবার হইলে ৮০্ টাকা যে কোন প্রকারে জমা দিবার জন্য শেষরাত্রের নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করে। তখন অন্য চিন্তা বা স্ত্রী ভারতীর চিন্তাও তাহার কাছে নগণ্য হইয়া দাঁড়ায়।

শ্যামলালের মেসের বাসিন্দারা সকলেই প্রায় সামান্য বেতনের কেরাণী। জন পনর লোক থাকে। ভণ্টু ছেলেটিকে শ্যামলালের

ভালই লাগে। ছেলেটি টিউশানি করিয়া নিজের পড়া চালায়, প্রাইভেটে বি, এ দিয়াছে। আসলে ছেলেটি বেশ কৌতুক-প্রিয়। 'ভণ্টু' তার ডাক নাম, ভাল নাম-আশীষকুমার।

শ্যামলাল বাড়ীতে চিঠি লিখ্‌লেও মনটা তাহার বিশেষ ভাল নাই। ভারতীর অসুখ আবার বেশী হয় নাই তো? কি জানি, কেমন আছে। হয়তো গেলেই ভাল হ'তো। ভারতীর সুন্দর মিষ্টি মুখখানি বার বার মনে পড়ে এবং থাকিয়া থাকিয়া শ্যামলালের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায়।

কিন্তু মনের মানুষেরই জয় হয় শেষ পর্য্যন্ত। ভারতীকে ভালবাসে বলিয়াই তো শ্যামলালের এই প্রাণপণ পরিশ্রম ও পয়সা উপার্জ্জন। এবং ভবিষ্যতে সে সুখে থাকিবে সেই কারণেই তাহার সঞ্চয়, অথচ মেয়ে মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিতে পারে না ইহাই সকলের চেয়ে বিস্ময়কর।

ভণ্টু ছেলেটী কর্ম্মঠ, গায়ে শক্তি প্রচুর এবং মনেও আনন্দ যথেষ্ট। কোন দুঃখকে মনে আঁকিয়া অকারণে নিজেকে কষ্ট দেয় না।

দেশের বাড়ীতে মা থাকেন। একটি বোন—তাহার শ্বশুর-বাড়ী তাহাদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে। ভণ্টু হইতে তাহার দিদি বছর চারেকের বড়।

কলিকাতার কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে থাকিলেও ভণ্টুর মন ছুটিয়া যায় তাহার দুখিনী মায়ের স্নেহের নীড়ে। ছোট্ট দোচালাকে আশ্রয় করিয়াই ভণ্টুর গৃহ, তাহাতেই যেন মনে হয় কত তৃপ্তি।

বাড়ীর পাশে বাঁশ ঝাড়, সন্ধ্যা হইলেই যেন মনে হয় জোনাকিরা সহস্র বাতি জ্বালিয়া তাহাদের গৃহটিকে পাহারা দিতেছে। ঝিঁঝির ডাক,

তাহাই না কত মিষ্টি। রূপকথার ঘুম পাড়ানি মাসী পিসিকে মনে পড়িয়া যায়।

ভাল ফুলের সন্ধান কোনদিন ভণ্টু কল্পনায়ও আনে না। বেশ লাগে গ্রামের সেই অনাদৃত ফুলের সৌরভ, ভেঁটে আর সেওড়া, কুর্চি আর বাকস. স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়া কেমন শোভা বিস্তার করে।

জগতে তাহাদের সৌন্দর্য্যই কি কম যাহারা নিজে হইতে বিকশিত হইয়া অনাদরে ঝরিয়া পড়ে।

ভণ্টুর সব থেকে বেশী করিয়া মনে পড়ে মায়ের তৈরী সেই আচার কাসুন্দি; এক এক সময়ে ভণ্টুর মন চলিয়া যায় তাহার সেই গ্রাম অভিলাষপুরে। কিন্তু পরক্ষণেই মায়ের সেই কাতর মুখ ভাসিয়া উঠে চোখের সামনে। সারাদিনের হাড় ভাঙ্গা খাটুনি ঢেঁকির সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করিয়াও মা বোধ হয় কোনদিন নিজের এক বেলার আহারও যোগাইতে পারেন না। সেই মায়ের গলগ্রহ হইতে ভণ্টুর লজ্জা লাগিত।

তাই ভণ্টু একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী হইতে বিদায় লইয়াছিল,—প্রকৃত মানুষ যদি হইতে পারে তবেই দেশে আসিবে—নচেৎ নয়।

মা—পরম স্নেহভরে ষাট্‌ ষাট্‌ বলিয়া ভণ্টুর গা স্পর্শ করিয়া কত কাঁদিয়াছিলেন,—না ভণ্টু, তুই যাসনে, তুই গেলে আমি কা'কে নিয়ে থাকবো? আমি মা, তুই ছেলে—তুই কেন ভাবছিস? আমার কর্ত্তব্য তোকে খাওয়ানো; পাগলা ছেলে, সব তাতেই তোর বাড়াবাড়ি। মা বেশী কিছু জানেন না, শুধু জানেন তিনি মা, তাঁর কর্ত্তব্য সন্তান পালনে। ভণ্টু তাঁর কাছে আজও শিশু, তাই আজও ভণ্টুকে তিনি আগলাইয়া রাখিতে চান।

চারি বৎসর ভণ্টু কলিকাতায় আসিয়াছে আজও বাড়ী যায় নাই। পল্লীমায়ের ডাক নিস্তব্ধ রাতে ভণ্টু রোজই শুনিতে পায়। ঝিল্লীর রব ও

বেতস বনের সন্ সন্ শব্দ অর্দ্ধরাতে ঘুম ভাঙ্গাইয়া লইয়া যায় সেই আজন্মের নীড় পল্লীর কোলে।

মাকে প্রতি হপ্তায় দুইখানি করিয়া পোষ্টকার্ড লেখে ভণ্টু। বি, এ পরীক্ষার 'রেজাল্ট' বাহির হইয়াছে, ভাল ভাবে পাস করিয়াছে সে। মাকে সংবাদ দিয়াছিল মাও খুব সন্তুষ্ট হইয়া এবং শত আশীর্ব্বাদ জানাইয়া পত্র দিয়াছেন। সর্ব্বশেষে তিনি লিখিয়াছেন—তুমি রাজা হও।

ভণ্টু মায়ের চিঠি পড়িয়া 'রাজা হও' লেখা দেখিয়া হাসিয়া আকুল।

এম, এ পড়িবার সখ তাহার বরাবরই ছিল, কিন্তু কালের নিষ্ঠুর বিধানের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

দেশে থাকিয়া কোন রকমে অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিল, সে কাহিনী মনে পড়িলে ভণ্টু আজও শিহরিয়া উঠে। তারপর টিউশানির সাহায্যে কোন রকমে টানা হেঁচড়া করিয়া বি, এ পাস করিয়াছে। কিন্তু আশার সামা নাই। এম, এ পড়িবার সখও মনের অন্তরালে উকি মারিতেছে। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল—কেহ যদি গৃহ শিক্ষক রাখে।

কিছু দেনাও হইয়াছে শ্যামলালের কাছে। শ্যামলাল অবশ্য বিশ্বাস ভরেই ভণ্টুকে ধার দিয়াছে। ভগবান্ নাকি যাহাকে অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষমতা দেন তাহাকে মানুষ চিনিবারও ক্ষমতা দেন। ভণ্টু যে ফাঁকি দিবেনা শ্যামলাল সে বিশ্বাস ভণ্টুর উপর রাখে।

ভণ্টুর কাগজে বিজ্ঞাপন বিফলে যায় নাই। শ্যামবাজারের পরলোক গত রাজা তারামোহনের বিধবা স্ত্রী সেক্রেটারির মারফতে শনিবারে দেখা করিবার জন্ত জানাইয়াছেন। সকাল ৯ টা হইতে ১২ টার মধ্যে।

ভারতীর খুব অসুখ গেল, একজর অবস্থায় ক'দিন ছিল। দুর্গাবতী

প্রথমটা গ্রাহ্য করেন নাই। বাঙ্গলা মতে তিনি বধূকে দু'দিন শিউলি ও বেল পাতার রস এবং তুলসী মধু দিয়াছিলেন। জ্বর উল্টা পথ ধরিল। হাই টেমপ্যারেচার উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ভুল বকুনি।

যদিও দুর্গাবতী শ্যামলালকে জানিতেন, তবু স্ত্রী-তো, কিছুতেই না আসিয়া পারিবে না, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দুর্গাবতীর। তা'ছাড়া তা'র তো একটা কর্ত্তব্য আছে? আশা পথ চাহিয়া চাহিয়া এবং সম্মুখে বিকার গ্রস্থ রুগী লইয়া দুর্গাবতী কি যে করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না।

সাহায্য বলিতে শুধু রমা—প্রাণ দিয়া কি সেবাই না করিল।

যেদিন শ্যামলাল নিজে না আসিয়া সামান্য পোষ্টকার্ডে মাকে জানাইল,—হারাণ ক'বরেজকে ডাকিবার জন্য, অনর্থক তাহার যাওয়ার কোন প্রয়োজনই নাই, সেদিন দুর্গাবতীর মনের যে কি অবস্থা হইয়াছিল—তাহা তিনিই জানেন।

উৎকণ্ঠা লইয়া ভারতী শুধু ট্রেণের সময় হইলে দুয়ার পথে চাহিয়া থাকিত, তার পর সময় উত্তীর্ণ হইলে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিত। যেদিন দুর্গাবতীর হাতে পোষ্টকার্ড দেখিয়াছিল—সেই দিন সন্ধ্যা হইতে ভারতী জ্ঞান হারাইয়াছিল।

দুর্গাবতীর সংসারের উপর কেমন একটা অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। এই তাহার সংসার, যত অবিচার, অন্যায় তাহারি সন্তান শ্যামলাল হইতে। দুর্গাবতীর অন্তর ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বংশানুক্রমে ইহারা কৃপণ—তবু তাহার একটা সীমা ছিল। এ যেন সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছে। দুর্গাবতীর ধারণা ছিল কালের হাওয়ায় এবং সুন্দরী বউ পাইলে হয়তো শ্যামলাল শুধরাইয়া যাইবে। কিন্তু ধারণা তাঁহার বদলাইয়া গেল। বাপ পিতামহকে ছাড়াইয়া শ্যামলাল তাহার স্থান আরও উঁচুতে করিয়া লইল। দোষ তাঁহারি, কেন পরের

মেয়ে গলায় চাপাইলেন। তিনি তো নিজে জানেন বালিকা বধূ হইতে প্রৌঢ়ত্বে আসিয়া পর্য্যন্ত কত অশান্তিতে দিন কাটাইয়াছেন। পয়সাই যে ইহাদের সব। একটা পয়সা পাইলে ইহাদের মনে জাগিয়া ওঠে ‘আলাউদ্দিনের স্বপ্ন’।

ভারতীর উপর সমবেদনায় দুর্গাবতীর মন আর্দ্র হইয়া উঠিল। পয়সাকে দুনিয়ায় সবলোকেই ভালবাসে। তাই বলিয়া এতখানি বাড়াবাড়ি কেউ তো করে না।

জ্যাঠাইমা—

অনুযোগের দাবি লইয়া রমা আসিয়া দুর্গাবতীকে কঠোর ভাবে দু'চারিটা কথা শুনাইয়া দিল।

তাঁর শ্যামের বিরুদ্ধে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিবে তাহা দুর্গাবতীর ভাল লাগিল না, তাই পুত্রের দোষ ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—হয়তো কাজের চাপে আস্‌তে পারেনি মা। তা'ছাড়া মাথার উপর আমি রয়েছি, কিইবা দরকার তা'র আসার। সে চিরকাল একটু লাজুক গোছের ছেলে কিনা।

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া রমা বলিল, না জ্যোঠিমা সে খরচের ভয়েই আসেনি।

বিমনা হইয়া দুর্গাবতী খানিক কি চিন্তা করিলেন, তারপর মৃদু স্বরে বলিলেন হ্যাঁ বাছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। বলি, শ্যাম বউমাকে ভালবাসে তো? কোন বদ্ খেয়াল টেয়াল—তোকে বউমা কিছু বলেনা তো?

হাত নাড়িয়া রমা উত্তর দিল. নাও তোমার কথা, বদ্ খেয়াল এমনি হয় না; তারও পয়সা দরকার। খরচের ভয়ে যে মরণাপন্ন বউএর খবর নিতে পারেনা—তার আবার বদ্ খেয়াল।

কি জানি বাছা, বুঝে উঠতে পারি না। নীরবে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুর্গাবতী উঠিয়া গেলেন।

দুর্গাবতী প্রাণপণে বধূর সেবায় নিজেকে মগ্ন করিলেন। ভারতীর যত্নের যাহাতে কোন ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক হইলেন। সহর হইতে বড় ডাক্তার আনাইলেন। এবং ডাক্তারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্য যাহা প্রয়োজন সবই ব্যবস্থা করিলেন।

থাকিয়া থাকিয়া রুগ্ন বধূর দিকে চাহিয়া দুর্গাবতী নিঃশ্বাস ফেলেন। বেচারীর অদৃষ্টে শুধুই ফাঁকি, নিজে ইচ্ছা করিয়া তিনি আর ফাঁকি দিবেন না। অতীতের কত কথা অজানিতে মনের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া মনকে শত ছিন্ন করিয়া দেয়।

যদিও তাঁহার স্বামীর বিশেষ পয়সা ছিলনা তবুও কি কঠোর সাধনাই না তিনি করিয়াছিলেন পয়সার জন্য।

শ্যামলালের পূর্ব্বে দুর্গবতীর আর এক ছেলে ছিল। সেই ছেলে সবেমাত্র একটা পাস করিয়াছিল, কত আশা ভরসার সন্তান। ভবিষ্যতের রঙিন্ স্বপ্ন আঁকিয়া স্বামী স্ত্রীকে বোঝাইতেন। দুর্গাবতীও বিহ্বল হইয়া শুনিতে শুনিতে বাস্তব জগৎ হইতে নূতন এক রাজ্যে চলিয়া যাইতেন। শ্যামলালের বয়স তখন দু'বছর মাত্র। উপরের গুটি-চারেক দাঁতের ফাঁক দিয়া সবেমাত্র দু' একটা ভাঙ্গা উচ্চারণ শিখিয়াছে। হামাগুড়ি টানিয়া সারা ঘর তোলপাড় করে।

দুর্গাবতীর বড় ছেলে একদিন বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল ভয়ানক জ্বর লইয়া। সেই যে বিছানায় শুইল, আর উঠিল না।

কোথা দিয়া যে দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গেল, আজও দুর্গাবতী ঠিক করিতে পারেন না। কেবল মনে পড়ে, শোকে যখন তিনি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় মাটির উপর পড়িয়াছিলেন, স্বামীর আহ্বানে জ্ঞান

ফিরিয়াছিল। স্বামীর সেই কথা কয়টি আজও তাঁহার কানে বাজিয়া উঠে।

—বউ, ওঠ, পড়ে থাকলে তো চলবে না। সন্ধ্যে হ'য়ে এল। মানুষ বেটা পালিয়ে গেল ফাঁকি দিয়ে, এবার বোবা বেটার 'লক্ষণ' করগে। তা' না হ'লে পেটের অনন্ত গহ্বর—সে তো বুঝবে না।

টপ্ টপ্ করিয়া স্বামীর চোখের দু' ফোঁটা অশ্রু দুর্গাবতার কপালের উপর পড়িয়াছিল।

দুর্গাবতী দু'হাতে নিজের অশ্রু-ভরা মুখ চাপা দিয়া বলিয়াছিলেন,—কি ক'রে এত নিষ্ঠুর হ'য়ে গেলে? খোকা যে এইমাত্র বিছানা থেকে উঠে গেল, আর এরি মধ্যে আমাকে বুক বেঁধে তোমার সংসারের সব ব্যবস্থা করতে হবে? তবে কি খোকাই তোমার অমঙ্গল ছিল? যত অশান্তি, অকল্যাণ সেই নিযে চলে গেল?

মলিন মুখে স্বামী বলিয়াছিলেন, আমিতো কিছু অন্যায় বলিনি। যা সত্য, শুধু সেইটুকু বলেছি। বৃদ্ধ বয়সে দু'টি অন্ন যোগাবে বলে কত কষ্টে মানুষ করেছিলাম, দেখলেতো, ধনে প্রাণে মেরে পালিয়ে গেল—স্বার্থপরের মত।

তাই বলছি, দুনিয়ায় কেউ কা'রো নয়। শুধু বোবা বেটার কল্যাণ কামনা কর, সকাল সন্ধ্যায় তারি বাড় বাড়ন্তয় লক্ষ্য দাও, তবে যদি ভবিষ্যতে দু'মুঠো খেতে পাও। আমিও একদিন চলে' যাবো তখন তোমার কে থাকবে বল? এখন সময় থাকতে বোঝ।

শ্যামলালকে দেখাইয়া তিনি আরো বলিয়াছিলেন, দেখছ না—দেনার দাবি নিয়ে আর এক পাওনাদার উপস্থিত। ওকে তো ওর প্রাপ্য মটাতে হবে। কেঁদনা, কাঁদলে কোন ফল নেই, শুধু শরীরের পীড়া বাড়ানো মাত্র।

বহুদিনের কথা তবু আজও দুর্গাবতীর মনে পড়িয়া যায়

দুর্গাবতীর প্রাণপণ যত্নে ভারতী ক্রমশঃ ভালোর দিকে। পুত্রকে তিনি আর চিঠির জবাব দেন নাই—ইচ্ছা করিয়াই।

রমাকে ভারতীর নিকটে বসাইয়া দুর্গাবতী জেলেপাড়ায় গিয়াছেন জ্যান্ত মাছের সন্ধানে।

ক্ষীণ স্বরে ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি ক'রে রমা বল্‌তো, তোর দাদা এলনা কেন? এত তাচ্ছিল্য কেন বল্‌তে পারিস রমা? কি আমার অন্যায়, তাই এত অবহেলা? দুঃখে ভারতীর চোখে জল দেখা দিল।

রমা বাধা দিয়া বলিল, বাজে কথা কেন বল্‌ছিস্ ভাই! রোগ শরীরে ওসব অমূলক চিন্তা করিস নে, কত ক'রে ভাল হলি। হয়তো কাজের ভিড় পড়েছে তাই আসতে পারেননি।

একটা মানুষ মরছে তখনও কি কাজটা বড় হ'ল? সামান্য একটা কুকুর, বেড়াল পুষ্‌লেও মানুষের মায়া পড়ে, সেটুকু কর্ত্তব্যও কি আমার উপর নেই?

রমা ভারতীর মুখ চাপিয়া ধরিল। চুপ কর, বেশী কথা বল্‌তে ডাক্তারের মানা।

ভারতী আর কথা বলিল না, আস্তে আস্তে পাশ ফিরিল।

রমা জানে, ভারতী কতখানি ব্যথা পাইয়াছে শ্যামলালের না আসায়। ভারতী কি গভীর ভালবাসে শ্যামলালকে—তাই আঘাতটা বড় বেশী করিয়া লাগিয়াছে ভারতীর।

ক্রমে ক্রমে ভারতী ভাল হইয়া উঠিল। কিন্তু শরীর খুব দুর্ব্বল দুর্গাবতী খুব সাবধানে রাখেন ভারতীকে।

রমা ও ভারতী পরস্পর পরস্পরকে খুব ভালবাসে। ভারতী প্রথম যেদিন শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছিল, সর্ব্ব প্রথমে রমা ঘোম্‌টা তুলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—আমি কিন্তু বউদি বলবো না, নাম ধ'রে ডাক্‌বো।

—শ্যামদা, রাগ কর্‌তে পারবে না কিন্তু। যা বল বাপু, তোমার বউ-ভাগ্যি ভাল বল্‌তে হবে।

রমা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পিতা মাধব রায় কলিয়াড়ীতে বড় চাক্‌রি করিতেন। ঐখান হইতেই রমার বিবাহ হইয়াছিল। বাহিরে পিতার নিকট থাকার দরুন রমার লেখাপড়া শিখিবার অসুবিধা হয় নাই। মাধব রায় এবং স্ত্রী সর্ব্বজয়া একমাত্র সন্তান রমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না বলিয়া সুপাত্র অনুপমের সহিত রমার বিবাহ দেন।

অনুপম ছেলেটি খুব ভাল। শৈশবে পিতামাতা মারা যায়, মামার কাছে মানুষ: লেখাপড়ায় খুব ধারাল, পরীক্ষায় বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। দেখিতেও খুব সুন্দর।

মাধব রায় এই রকম পাত্রই খুঁজিতেছিলেন। তাই সব দিক দিয়াই যোগ্য পাত্র হিসাবে অনুপমকে জামাই করেন।

অনুপম বছর দুই হইল কলিকাতায় প্রফেসারি পাইয়াছে। মধ্যে কিছুদিনের জন্য মা বাবার কাছ হইতে রমাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছিল। সর্ব্বজয়া ও মাধব রায় থাকিতে পারেন নাই। তিনবার আসিয়া তাঁহারা কন্যাকে দেখিয়া যান।

বুদ্ধিমান্ অনুপম শ্বশুর শাশুড়ীর অবস্থা বুঝিয়া নিজে হইতে রমাকে ঝরিয়ার রাখিয়া আসে।

দিন বেশ আনন্দের সহিত অতিবাহিত হইতেছিল। সর্ব্বজয়ার ভারি ইচ্ছা রমার একটি সন্তান হয়।

বড় সাহেবের মাধব রায় ছিলেন ডান হাত। সাহেব মাধব রায়কে খুব ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন এবং কলিয়াড়ী সম্বন্ধে যাবতীয় পরামর্শই রায়ের কাছে গ্রহণ করিতেন।

কলিয়াড়ী সংক্রান্ত কি প্রয়োজনে এবং কি একটা নূতন মেসিনের জন্য বিলাত যাওয়ার দরকার। সাহেব মাধব রায়কে বলিলেন, 'রয়', তোমার তো চিরদিনের ঝোঁক আমাদের দেশ দেখার। তার সুযোগ কিন্তু এই; যদি ইচ্ছা কর ছ'মাস ঘুরে আসতে পারো। আমার যাওয়ার অসুবিধা আছে, মেমসাহেবের শরীর খারাপ।

তুমি বিলেত থেকে ঘুরে এলে তোমার মাহিনাও বাড়বে। উপস্থিত তোমার মাহিনা তোমার স্ত্রীকে দেওয়া হবে। ওখানকার তোমার যাবতীয় খরচ কলিয়াড়ী অফিস বহন করবে।

মাধব রায় সাহেবসুবার সঙ্গে মিশিয়া সমুদ্র যাত্রাকে জীবনের সব চেয়ে বেশী সৌভাগ্য মনে করিতেন। বিদেশী আচার ব্যাভারে এবং পোশাক পরিচ্ছদে সব তাতেই কেতাদুরস্ত ছিলেন, কেবল আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই স্ত্রীকে। কাজে কাজেই বিলাত যাত্রায় তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে না, বরং নিজের অদৃষ্টকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

তখন সবেমাত্র জার্ম্মান রণ-হুঙ্কার ছাড়িয়া পোলাণ্ডে পদার্পণ করিয়াছে। চারিদিক হইতে তখন মানুষের মনের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। জলপথ, স্থলপথ সবই তখন বিপৎসংকুল। সর্ব্বজয়ার

মনেও তখন আতঙ্কের রেখাপাত করিয়াছে, কিছুতেই স্বামীর কথায় রাজী হইলেন না।

কি দরকার বেশী পয়সায় বা বাজে হুজুকে। একটা মেয়ে তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মাত্র দু'টি প্রাণী। কাহার জন্য ইচ্ছা করিয়া বিপৎসংকুল প্রবাস যাইবার অহেতুক খেয়াল্!

মাধব রায় বলিয়াছিলেন, কত জিনিস দেখ্বার···যা তুমি কল্পনা কর্‌তে পার্‌বে না। আমার বহুদিনের স্বপ্ন সফল হবে। তোমার কিন্তু জোর বরাত বল্‌তে হবে। বিলাত-ফেরত স্বামী, ক'জনের ভাগ্যে হয় বল?

মুখ বাঁকাইয়া সর্ব্বজয়া বলিয়াছিল,—ভাগ্যে কাজ নেই, বেশ আছি। ভারতে কি দেখ্বার কিছুই নেই। সব পড়ে থাক্‌লো চল্‌লে এখন রঙিন্ মন নিয়ে রঙিন্ দেশে। আমার ইচ্ছে হয় তীর্থ-ধর্ম্ম করি, সময়মত ভগবানের বিষয় কিছু আলোচনা করি। আর তোমার কেবল বিলিতী অনুকরণ। আগেকার লোকেরা সাধে কি সাহেবের চাক্‌রি করতোনা? বল্‌তো, ওদের চাক্‌রি কর্‌লেই নাকি প্রায় লোকের মতিভ্রম হয়। দেখ্ছি, সত্যিই তাই। পৈতে বাদ দিয়ে ডিনার কর্‌ছ মুরগীর 'ঠ্যাং' দিয়ে। আবার তাতেও হচ্ছেনা—জীবন বৃথায় যাচ্ছে ম্লেচ্ছ দেশে না গেলে। এর পরে শুনবো মেম্ বিয়ে না কর্‌লে বিলেত যাওয়াই ঠিক হয় না।

মাধব রায হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, সেভয় কি এখনও কর জয়া?

জয়া বলিল ভয় করি না। মনের খেয়াল তো, হ'লেই হ'ল। যা সত্যি শুধু তাই বল্‌ছি। তবে বলা যায় না, মনে যখন নতুন করে কুঁড়ি ফুটেছে—তা' ফুল ফুট্‌তে আর কতক্ষণ।

মাধব রায় কিন্তু কোন বাধাই মানিলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিনে পৈতৃক বাড়ী শিউড়ীতে স্ত্রী ও কন্যাকে রাখিয়া ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বিলাতে রওনা

হইলেন এবং যথাসময়ে সুস্থভাবে পৌছান সংবাদ দিলেন। কর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে ছ' মাসের জায়গায় দশমাস হইল।

দেখিতে দেখিতে সারা পৃথিবীব্যাপি মহাপ্রলয়ের তূর্য্যনাদ বাজিয়া উঠিল। জাপান্ নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমগ্র এসিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য আগাইয়া আসিতেছে। জলে, স্থলে, শূন্যে সর্ব্বদিকেই বিপদের কালো ছায়া ঘিরিয়া ধরিয়াছে। মাধব রায়কে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষে আসা স্থগিত রাখিতে হইল।

জয়া দেবী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

—একটু সুবিধা পাইলেই আসিবেন, ভাবিবার কোন কারণ নাই,—মাধব রায় লিখিলেও জয়া দেবী চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তিন বছর হইয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত মাধব রায়ের আসার কোন সুবিধা হয় নাই।

* * * * *

নির্দ্দিষ্ট দিনে ভণ্টু সাড়ে ন'টার সময়—সাবান-কাচা কাপড় জামা পরিয়া শ্যামলালের ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল—শ্যামদা।

—আয় ভণ্টু, শ্যামলাল তখন জামায় পটি মারিতেছিল, বলিল—কি? যাচ্ছিস্ বুঝি? যা ভণ্টু, আমি বলছি, তোর নিশ্চয় ভালো হবে। আমার একটা কথা মনে রাখ্‌বি—কষ্ট না করলে পয়সা হয় না। আর একটা কথা, রাগটাকে, যাকে বলে ক্রোধ, যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চল্‌বি। উন্নতির পথে ঐ শুধু বিঘ্ন ঘটায়। তোর বউদির অসুখ লিখেছিল, বাড়ী যাইনি ব'লে আর চিঠি দেয়নি। তা না দিকগে, ভালই আছে, কি বলিস্ ভণ্টু।

ভণ্টু বলিল, তা তুমি একবার বাড়ী গেলে না কেন? কতদিন চিঠি পাওনি?

শ্যামলাল আড়চোখে একবার ভণ্টুর দিকে চাহিয়া লইল। তারপর বলিল, বেশ 'মাইরি'; তুই তো বল্লি—আমি তো ডাক্তার নই, শুধুশুধু যাওয়া।

ভণ্টু বলিল, ডাক্তার না হ'লে কি বাড়ী মাড়াতে নেই।

এইবার শ্যামলাল উত্তেজিত হইয়া বলিল, তোদের কোন কথার ঠিক নেই। কখন যে কি বলিস্ তা' নিজেদেরই মনে থাকে না, পর মুহূর্ত্তেই ভুলে যাস্। কথার যে কোন দাম আছে তা' তোরা বুঝিস্ না।

সত্যই ভণ্টু মনে মনে লজ্জিত হইল। মারাত্মক জায়গায় পরিহাস করা ভাল হয় নাই।

আমি বড্ড ব্যস্ত ছিলাম শ্যামদা, তাই এসে আর খোঁজ নিতে পারিনি। বউদি নিশ্চয় ভাল আছেন। আজ শনিবার, তুমি একবার বাড়ী যাও।

উঠি শ্যামদা, দশটা বাজে। সোমবা র আমার শ্যামবাজারের খবর জানতে পারবে।

বউদি ভাল আছেন কিনা ঐদিন আমিও জানতে পারবো, অবশ্য যদি তুমি বাড়ী যাও। বউদিকে আমার প্রণাম দিয়ে ব'ল, আমার সুযোগ হ'লেই আমি একবার তাঁকে দেখতে যাবো।

শ্যামলাল আনন্দিত হইয়া বলিল বেশ, বেশ, যেতে হবে কিন্তু। তোর বউদিকে বলবো। শ্যামলাল মনে মনে ভারতীর প্রশংসা করিত এবং সেইজন্যে সময় সময় গর্ব্বও হইত। ভণ্টুকে যদি একবার দেখাইতে পারে তবে তা'র গর্ব্ব সার্থক হয়।

ভণ্টুর দাঁড়াইবার সময় ছিল না, বাধ্য হইয়া শ্যামলালকে জানাইল—তাহার দুইটি টাকার দরকার।

ভণ্টুর হাতে দুইটি টাকা দিয়া শ্যামলাল বলিল, নে ভণ্টু, এর তোকে সুদ দিতে হবে না। যদি তোর চাকরিটা হয় কিছু দিস্। দাঁড়া, খাতায় টাকা দুটো জমা ক'রে দিয়ে যা।

ভণ্টু পিছন হইতে শ্যামলালের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে শুধু একবার মাথা নাড়িল।

শ্যামবাজারে—রাজা তারামোহনের বাড়ীতে ভণ্টু যথাসময়ে আসিল।

প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রাসাদ বলিলেও ভুল হয় না।

ভণ্টুর দেখিয়া তাক্ লাগিয়া গেল। এই বাড়ীর মধ্যে তাহাকে চাকরি লইতে হইবে, মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সত্যিকার বড়লোক দেখিবার সৌভাগ্য ভণ্টুর আজ পর্য্যন্ত হয় নাই, তার জন্য অবশ্য ভণ্টু দুঃখিত মোটেই নয়। বরং বড়লোকের সঙ্গ ভণ্টু যতদূর পারে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে। ভণ্টুর ধারণা বড়লোকেরা অন্য বিধাতার সৃষ্টি এবং তাহারা ভিন্ন জগতের মানুষ। ওদের সঙ্গে মিশ্‌তে যাওয়া বিপদজনক।

বাড়ীর ফটকের পাশে একজন ভোজপুরী দারোয়ান একটি টুলের উপর বসিয়া খৈনি টিপিতেছিল। ফটকের ভিতরে দুই ধারেই দেখা যাইতেছে প্রকাণ্ড 'লন', কেয়ারি করা পথের দু'পাশ দিয়া। বিলাতী ঝাউ, পাম, ইউক্যালিপটাস্ এবং আরও অনেক সুদৃশ্য ছোট ছোট গাছ সাজানো—তেরচা করিয়া ফেলা জমির উপর। বিলাতী ঘাসগুলিও ভারি চমৎকার লাগিতেছিল।

ভণ্টুর আর ওদিকে লক্ষ্য করিবার মত সময় ছিল না। এখন সে কি করিবে বোধ হয় চিন্তা করিতেছিল। নিজের কাপড় জামার দিকে চাহিয়া এবং দারোয়ানের পোশাক লক্ষ্য করিয়া মনে মনে 'হোপলেশ' বলিয়া ভণ্টু ইতস্ততঃ করিয়া ভাবিতেছিল ঢুকিবে কি না।

দারোয়ান অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিল, ভণ্টুকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়াই বলিল,—এ বাবু, কিস্‌কো মাঙ্গতা ?

ভণ্টু বাংলাতেই বলিল, না, কারুকে চাই না। ফিরিয়া যাইতে যাইতে শুনিল, দারোয়ান বল্‌ছে, 'বাবু পাগলা আছে।'

ভণ্টু অন্যমনস্কভাবে চলিতেছিল। হঠাৎ পিছন হইতে একটি ছেলের কণ্ঠস্বরে চকিতে ফিরিয়া চাহিল—বা, আপনি যে চলে যাচ্ছেন দেখা না ক'রে !

ভণ্টু বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল ছেলেটির পানে। ষোল সতেরো বছর বয়স হইবে। অতি সাধারণ বেশভূষা যা' এ বাড়ীতে বে-মানান। এ বাড়ীর মালিকের ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া জমির ধূলি মাটিগুলি পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হইয়াছে—পরিবর্ত্তে বিলাতী দুর্ব্বাদল স্থান করিয়া লইয়াছে। অথচ ছেলেটি তাহার পরিচিত তাহা তো মনে হয় না। হয়তো অনাহূত তাহারি মত একজন।

ছেলেটি কিন্তু ভণ্টুকে ভাবিতে সময় দিল না।

আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। আপনি দেখা না করেই চলে যাচ্ছেন।

বিস্মিত হইয়া ভণ্টু বলিল, আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে, মানে ! কই, আমি তো তোমায় চিনি না।

মৃদু হাসিয়া ছেলেটি বলিল, আমি বোধ হয় ভুল করিনি। আপনি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন—গৃহ শিক্ষকের জন্যে।

ছেলেটির অসাধারণ ধারণাশক্তি দেখিয়া ভণ্টু মনে মনে 'বাহবা' না দিয়া পারিল না। শুধু বুদ্ধিমান বলিলে ভুল হইবে। অল্প বয়সেই দস্তুরমত জ্ঞানী। আনন্দে ভণ্টু বলিল,—তুমি ঠিক বলেছ। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি তোমার অনুমান দেখে।

ছেলেটি বলিল, আসুন আমার সঙ্গে। তির্যক্ দৃষ্টিতে ছেলেটি ভণ্টুকে দেখিয়া কেমন একটু বিমনা হইয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত্তেই সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া সহাস্যে বলিল, চলুন।

সামান্যই ব্যাপার এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে, কিন্তু ভণ্টুর দৃষ্টি এড়াইল না।

ছেলেটি ভণ্টুকে লইয়া গেল ড্রইংরুমে। একটা সোফায় ভণ্টুকে বসাইয়া পনরো মিনিট অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

ড্রইংরুমে বসিয়া ভণ্টু আরো বিব্রত হইয়া উঠিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল আপন মেসের জীর্ণ ঘরখানি। সব থেকে লজ্জার কারণ হইয়া উঠিল তাহার হাতে-কাচা কাপড় জামার পানে লক্ষ্য করিয়া। ভাল করিয়া নীল বোধ হয় দেওয়া হয় নাই, জায়গায় জায়গায় থোবা থোবা হইয়া নীল রং গাঢ় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। না আসিলেই হয়তো ভাল ছিল। মনের চিন্তা দূরে ফেলিয়া ঘরখানিকে দেখিতে লাগিল।

প্রকাণ্ড হল্ ঘর। মেঝে, সাদা কাল ইটালিয়ান মার্ব্বেল পাথরে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পা ফেলিতে ভয় হয়। মনে পড়িয়া যায় মহাভারতের কথা। হস্তিনাপুরে ইন্দ্রপ্রস্থে স্ফটিকের মেঝেকে সরোবর ভাবিয়া বেচারা দুর্য্যোধন কি নাকালেই পড়িয়াছিল। পাণ্ডবরা না হয় কুরুদের জব্দ করিবার ইচ্ছায় সেই ব্যবস্থা করিয়াছিল। বড় লোকদের এও বোধ হয় একটা পরিহাস—হঠাৎ দেখিলে আনাড়ী লোকেদের সত্যই সমস্যায় পড়িতে হয়।

ঘরের চারিদিকে নানা ছাঁদের স্প্রিংএর চেয়ার। দু'সেট সোফা—

মাঝখানে মস্ত বড় মার্ব্বেল পাথরের গোল টেবিল। কোণের দিকে টেলিফোন্, আর এক কোণে রেডিও-সেট্। দেওয়ালে বড় বড় বিলাতী পেন্টিংস্। দুয়ারে পাতলা সাদা নেটের পর্দ্দা। চারদিকে চারখানি আয়না—মানুষ সমান। ভণ্টুর বেশীক্ষণ খুঁটিয়া দেখিবার সময় হইল না। বাহিরে পায়ের শব্দ শুনিয়া সাবধান হইয়া বসিল।

ছেলেটি একটি সুন্দরী ও মার্জ্জিত, 'মেম' বলিলেও ভুল হয় না— এমনি একটি মেয়েকে লইয়া ঘরে ঢুকিল। হ্যাঁ, বসন ভূষণে এ বাড়ীর উপযুক্ত বটে!

মেয়েটি অপাঙ্গ দৃষ্টিতে ভণ্টুকে দেখিয়া অগ্রাহ্যভাবে একটি সোফায় গিয়া বসিল।

ভণ্টু ও মেয়েটির ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া যেমনি বসিয়াছিল তেমনিই বসিয়া রহিল। উঠিয়া দাঁড়াইবার কি হাত তুলিয়া নমস্কার করিবার প্রয়োজন বোধ করিল না।

মিহি গলায় মেয়েটি ডাকিল, 'বয়'।

তক্‌মা আঁটা সাদা পোশাকপরা 'বয়' দুয়ারের কাছেই বোধ হয় ছিল। আসিয়া সেলাম দিল।

মেয়েটি প্যাডের এক টুকরা কাগজে কি লিখিয়া দিল এবং বলিল, রাণীমাকে দাও গে। তারপর ছেলেটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, অরূপ দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

সব কথার মধ্যেই যেন দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইতেছে।

ভণ্টুকে লক্ষ্য করিয়া মেয়েটি বলিল, আপনি টিউটরের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?

ভণ্টু উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মেয়েটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভণ্টুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, পড়াতে পারবেন ?

ভণ্টু মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া উত্তর দিল, আশা তো করি পারবো। ভণ্টু লক্ষ্য করিল, মেয়েটি সোজা হইয়া বসিল এবং মুখখানা অসম্ভব লাল হইয়া উঠিল, আর কপালের উপর এক জোড়া সাপের মত দুইটি শিরা ফুলিয়া উঠিল। চাপা ক্রোধে তাহার গলা কাঁপিতেছিল।

কাঁপা সুরে মেয়েটি ভণ্টুকে বলিল, আপনি তো বেশ স্পষ্ট কথায় উত্তর দিতে পারেন। অথচ চাকরি ক'রতে এসেছেন তো ?

ভণ্টু সহজ গলায় বলিল, আপনি ভুল বলছেন। চাকরি করতে আসিনি—মাত্র অনুসন্ধানে এসেছি। আপনারাও যেমন পছন্দসই লোক রাখবেন তেমনি আমারও একটা মতামত থাকতে পারে। আর চাকরি ক'রতে এসেছি বলেই মনে ক'রবেন না নিজের আত্মসম্মান একেবারে বিক্রি করতে এসেছি।

চোখ দুইটি টানিয়া ভণ্টু আবার বলিল—আপনারা ধনী হতে পারেন. তা' ব'লে ব্যক্তিত্বে মনে ক'রবেন না যে আপনারাই শুধু মানুষ। মানুষকে যারা সম্মান দিয়ে কথা বলতে পারেন, জানবেন তারাই বড়।

আপনাদের উচিত ছিল, চিঠি দিয়ে আমাকে জানানো।

টিউটারিটা আর কিছু না, শুধু আপনাদের ঐশ্বর্য্যের একটা অলঙ্কার।

এই ক'টি কথা বলিয়া ভণ্টু সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ছেলেটিকে লক্ষ্য করিয়া একেবারে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, আচ্ছা তা' হ'লে আমি চলি।

ছেলেটি কেমন অস্বাভাবিক গলায় বলিল—না, না, আপনি যাবেন না।

মেয়েটিও যত সম্ভব গম্ভীর হইয়া বলিল, কলকাতায় থাকেন, অথচ কোন ভদ্রতাই জানেন না। আবার এসেছেন চাকরির জন্যে। শুধু

শিখেছেন কতকগুলো অনর্থক বাজে কথা বলতে। ধনী-বিদ্রোহী হওয়া শুধু গরিবের একটা পরশ্রীকাতরতার চিহ্ন—নিছক্ গাত্র-জ্বালা।

ভণ্টু অন্যদিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, তাই হয়তো হবে।

মেয়েটি বলিল,আপনি যেতে পারেন.অনর্থক কষ্ট দেওয়ার আমরা দুঃখিত।

অরূপ দৃঢ়তার সহিত ভণ্টুকে বাধা দিয়া বলিল, বসুন আপনি; আপনার যাওয়া হবে না। আমার জন্যে টিউটরের প্রয়োজন—আমি আপনাকে মনোনীত করলাম। তুচ্ছ কথাকে, আমার অনুরোধ, আপনি নিশ্চয় বড় ক'রে দেখবেন না।

যাইবার পথে অরূপের বাধা পাইয়া ভণ্টুকে বাধ্য হইয়াই দাঁড়াইতে হইল। প্রথম দেখার পর হইতেই ভণ্টুর ছেলেটির উপর কেমন একটা মায়া পড়িয়াছে। কি একটা দুর্ব্বার আকর্ষণে সে ভণ্টুকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

ভণ্টু কি বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ বাধা পাইল একটি বর্ষীয়সী মহিলার আগমনে।

মহিলাটিকে লক্ষ্য করিয়া মেয়েটি বলিল, এই নাও মা তোমার ছেলের নির্দ্ধারিত টিউটর। আমি চল্‌লাম। তোমার ছেলে যেখানে নিজেই স্বাধীন সেখানে শুধুশুধু আমাকে ডেকে এনে অপমান করার তো কারণ ছিল না।

মহিলাটি বিব্রত হইয়া উঠিলেন,—

খুকী যাসনি, শোন।

কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া হাল্কা বাতাসের মত কাঁপিতে কাঁপিতে মেয়েটি চলিয়া গেল।

ভণ্টু স্তম্ভিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন ঝড় বহিয়া গেল, শুধু তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া। সে শুধু আসিয়াছে চাক্‌রির আবেদন লইয়া, স্পষ্ট কথায় ইহারা মনোনীত না করিলেই তো পারিত।

আভিজাত্যপূর্ণ বড় সংসারের এই কি রীতি? ইহার চাইতে জীর্ণ মেস এবং শ্যামদা অনেক ভাল।

মহিলাটি ভণ্টুকে বলিল, দাঁড়িয়ে কেন, বস বাবা।

কথার মধ্যে কেমন একটা মিষ্টি সুর মিশানো ছিল—ভণ্টু তাহা উপেক্ষা করিতে পারিল না।

মহিলাটি বিধবা। দিশি থান ও সাদা সেমিজ পরনে। মুখখানি যেন প্রতিমার মত। প্রশস্ত ললাট ও বড় চোখ। কেমন একটা দৃঢ়তার ছাপ মুখের উপর রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, সহজে যেন সংকল্প-চ্যুত হন না। মুখের উপর চিন্তার রেখা পড়িয়াছে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

অরূপ বলিল, ইনি আমার মা, আর সকলের রাণীমা।

ভণ্টু লজ্জিত হইল। সামান্য ভদ্রতা পর্য্যন্ত তাহার লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাই তাড়াতাড়ি অত্যন্ত নত হইয়া নমস্কার জানাইতে গিয়া হঠাৎ মহিলাটির পায়ের তলায় ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিয়া বসিল।

থাক্ বাবা, থাক্, ব্যস্ত হতে হবে না।

ভণ্টু যেন বিব্রত হইয়া পড়িল, পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করা ঠিক হইল কি না। এরা হয়তো এর পক্ষপাতী নয়।

মহিলাটি ঠিক যেন মায়ের মত। ভণ্টুর অজ্ঞাতেই মস্তক নত হইয়া মহিলাটির পায়ের উপর পড়িয়াছিল। ভণ্টু ভাবিয়া দেখিবার সময় পায় নাই।

তোমার নাম কি বাবা?

শ্রীআশীষকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বেশ বাবা, বেশ। তুমি তা'হ'লে আমাদের স্বজাত। এই আমার

একমাত্র ছেলে অরূপ। টিউটরের দরকার আমার ছেলের জন্যে আর একটি আমার ছোট মেয়ে আছে—সে ভারি দুষ্টু, এদের দু'জনের জন্যে।

—তা তুমি যদি থাকো খুব ভালো হয়।

ভণ্টু বিব্রত হইয়া উত্তর দিল, কিন্তু—

মহিলাটি বাধা দিয়া কথা সমাপ্ত করিতে দিলেন না।

তুমি যার জন্যে 'কিন্তু' ক'রছ বুঝতে পারছি। একটু মলিন হাসিয়া আবার বলিলেন, আমার বড় মেয়ে শুক্লার কথা বোধ হয়। ওর স্বভাব ওই রকম। বিলিতী ষ্টাইল ওর খুব পছন্দ।

দিশি ধরণের লোক এ বাড়ীতে কেউ ঢোকে ওর ইচ্ছা নয়। তবে যদি কেউ ওরই মত রুচি-মার্জ্জিত হয়, তবে ও বিবেচনা ক'রে দেখে। কর্ত্তার বড় আদরের ছিল কিনা—তা' ছাড়া কর্ত্তার সঙ্গে দু'দুবার বিলেতও গিয়েছিল। ও বড্ড খেয়ালি। ওর কথার কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না—ওকে নিয়েই আমি মুস্কিলে পড়েছি।

এই অরূপই হবে ভবিষ্যতে রাজা। এবং আর বছর দুই পরেই ওকে অভিষেক ক'রে বসানো হবে রাজ গদিতে।

আমাদের বাড়ী গড়-মুক্তেশ্বর—ইউ, পিতে। ওখানকার রাজাই হ'ল এরা।

অরূপ মায়ের কথা শুনিয়া লাল হইয়া উঠিল। আস্তে আস্তে মাকে বলিল, কি বলছ মা ওসব কথা, বাদ দাও।

রাণীমা বলিলেন, না বাবা, ছেলেটিকে বলতে দাও। আশীষকে আমার বড্ড ভাল লাগছে—তাই দু'এক কথা না বলে পারছি না।

আর এক কথা, অরূপ যেখানে তোমায় মনোনীত করেছে সেখানে আর কোন কথাই নয়। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

ভণ্টু যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। দু'ঘণ্টা

পূর্ব্বেও যাহাকে তাহারি মত সমকক্ষ ভাবিয়াছিল—সেই কিনা গড়-মুক্তেশ্বরের রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী!

ভণ্টুর বড় আনন্দ হইল, কারণ ছেলেটিকে সত্যই ভাল লাগিয়াছে। বড় না হইলে বড় গুণ কাহার হয়?

পুনরায় রাণীমা বলিলেন, ওদের খেয়াল হ'ল ভিন্ন প্রকারের। ছেলে মত বিলিতী বর্জ্জন, এমন কি খাওয়া পর্য্যন্ত। আর মেয়ে হ'ল ভিন্ন প্রকৃতির। দেশী জিনিসে ওর বিশেষ আস্থা নাই।

ভণ্টু হতবাক্ হইয়া গেল। এ আবার কি সমস্যা। খানিক বলিল, দেখুন, আমার তো আসা এই জন্যেই। তবে আমার থাকা ঠিক হবে কি?

রাণীমা একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, তুমি যা বলছ ঠিকই। তোমার বিবেচনা শক্তি দেখে আনন্দ পেলাম। কিন্তু, এ ছাড়া উপায়ই বা কি? এ বাড়ীতে যেই আসবে একজন অপ্রস্তুত হবেই। অরূপের পড়ার বড্ড ক্ষতি হচ্ছে আর ওর ক্ষতি করানো ঠিকনা। যাকে তুমি পড়াবে সেই যেখানে তোমাকে মনোনীত করেছে সেই কথাই হ'ল সব চেয়ে বড় কথা। তবে তুমি দেখ, তোমার নিজের মতামত কি। মানুষের মনের ওপর তো জোর চলে না!

রাণীমা ভণ্টুর সব পরিচয় জানিয়া লইলেন। পরে বলিলেন, পয়লা পর্য্যন্ত আমরা তোমার অপেক্ষা করবো। তবে এখানে থাক কালীন তুমি কি কি সুবিধা পাবে ও মাইনের কথা ম্যানেজারের কাছে জেনে নিয়ে যেও।

পথে নামিয়া ভণ্টু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এতক্ষণ কি দুর্য্যোগের মধ্যেই তাহাকে কাটাইতে হইয়াছিল। রাণীমার

কথা আর অরূপের কথা ভণ্টু জীবনেও ভুলিবে না। কি উদার অকপট ব্যবহার।

মাহিনাও ভাল; নিজের যাবতীয় খরচ বাদ মাসিক ৭৫৲ টাকা। প্রাইভেটে এম-এ, পড়িয়া যদি সময় পাওয়া যায়—আর্ট স্কুলে সে এক ঘণ্টা করিয়া যাইতে পারে।

মানুষ মাত্রেরই একটা না একটা সখ থাকেই। ভণ্টুর একটু ছবি আঁকিবার সখ চিরদিনই ছিল।

অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে মনের সখ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিছু আশা পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের ঘুমন্ত খেয়াল হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিল। পাঁচ রকম চিন্তা করিতে করিতে ভণ্টু যাইয়া ট্রামে চাপিল।

* * * *

ভারতী সম্পূর্ণ ভাল হইয়া গিয়াছে।

রমা ও প্রতিবেশী দু'এক জন বান্ধবী আসিয়া দুর্গাবতীকে অনুরোধ করিল, ভারতীকে তালপুকুরে যাইবার জন্য।

দুর্গাবতীও যাইবার জন্য বলিলেন—তবে সাবধানে গা ধুইতে আদেশ দিলেন।

রমা বলিল, তুমি কিছু ভেবনা জ্যেঠিমা, আমি তো আছি। একটু বাইরের বাতাস গায়ে লাগানো ভাল।

দুর্গাবতী কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছেন, বিশেষ অসুখের পর হইতে—ভারতী যেন সর্ব্বদাই বিমনা। মুখের হাসি যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। তবু রমা আছে তাই রক্ষা।

ছেলেমানুষ, কতদিন বাপের বাড়ী যায় নাই। মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। শ্যাম এবার আসিলে যেমন করিয়াই হোক, মত করাইতে হইবেই। বউটাকে একবার পাঠানো বিশেষ কর্ত্তব্য।

কার্ত্তিকমাস চলিয়া গিয়াছে। শীত বেশ পড়িয়াছে। আকাশ যেন কেমন শান্ত শ্রী ধারণ করিয়াছে। তালপুকুরে যাইবার পথে বাঁ দিকে খানিকটা ধানের জমি পড়ে; শেষপ্রান্তে শুধু দিগন্ত প্রসারিত ফাঁকা মাঠ—শুধু সবুজে ভরা। উন্নতশিরে সোনালি রংএর ধানগাছগুলি বাড়িতেছিল। দিনান্তে, সূর্য্যের শেষ বিদায়ের ইঙ্গিতস্বরূপ রক্তিম আভা ধান-বনের উপর পড়িয়া যেন রামধনু রং লইয়াছে।

... ...

ভারতীর ভারি সুন্দর লাগিতেছিল সেই মুক্ত বায়ু, উদার আকাশ আর সীমাহীন ক্ষেত্র। যেন মনে হয় না বদ্ধ গৃহকোণে আর ফিরিয়া যায়।

দৃষ্টি মেলিয়া লক্ষ্য করিলে মাঠের শেষ প্রান্তে রেল লাইন নজর পড়ে। ষ্টেশন ডান-হাতী—আরো দক্ষিণে। মাঠ ভাঙ্গিয়া তালপুকুরে যাইতে হয়।

এখানকার জমিদার সখ করিয়া তালপুকুরটিকে কাটান। তিনি অবশ্য বিদেশে থাকেন। গ্রামের বউ-ঝিরা মধ্যে মধ্যে সঙ্গী জুটাইয়া গা ধুইতে ও আনন্দ করিতে আসে।

নিরালা পুকুরে হাসি, গল্প, সাঁতার কিছুরই বাধা পড়েনা। তা'ছাড়া এ দেশে চোর বা বদমাশ লোকের উৎপাত বড় একটা নাই।

সাধারণতঃ গঙ্গার স্নান করিতে যাওয়ার রেওয়াজই এখানে বেশী।

তবে গঙ্গার ঘাটে স্নান বা বৈকালের গা-ধোওয়া বউ-ঝিদের বিশেষ সুবিধা হয় না। নৌকা লইয়া মাঝিরা প্রায় ঘাটের কিনারায় থাকে, তা'ছাড়া হুগলীর গঙ্গা বেশ বড়, মহাজনী নৌকা এবং ষ্টীমারও চলে।

মাঠের মধ্য-প্রান্তে বেশ বড় একটা মুড়ি জামগাছ পড়ে। এত বড় মুড়ি জামগাছ নাকি এ তল্লাটে কোথাও নাই। দুঃখের বিষয় জাম কখনো হয় না। ডাল পাতা বিস্তারিত করিয়া চলন্ত পথিককে গাছটি আশ্রয় দেয়।

গাছতলায় একটি রাখাল বালক কতকগুলি শুখনো ঘুঁটে কুড়াইয়া এক জায়গায় জমা করিতেছিল।

রমা ছেলেটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই সুদো আমাদের ঘুঁটে দিস্‌না কেন? মায়ের কাছ থেকে আগে যে পয়সা চেয়ে আন্‌লি তেল কিন্‌বি ব'লে—আর ওদিকে হাঁটিস্‌ না; দরকার বুঝি ফুরিয়ে গিয়েছে?

সুদো পিঠের আড়াল দিয়া ঘুঁটেগুলিকে গোপন করিবার চেষ্টা করিল।

রমা হাসি চাপিয়া বেশ গম্ভীর হইয়া বলিল—উত্তর দিচ্ছিস্‌ না যে?

সুদো উত্তর দিল, ঘুঁটো লাইকো, হল্যে তো দ্যাবো।

রমা অনুরূপ ভঙ্গী করিয়া বলিল, ওই তো তোর পিঠের আড়ালে একরাশ ঘুঁটো। ফের মিথ্যে কথা বলছিস্‌?

আমার লয়কো—হাবলার। পেত্যয় না হয় হাবলাকে শুদোও। প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া সুদো চীৎকার করিতে লাগিল—হাবলারে, উ হাবলা—আর কেনে।

রমা হাসিয়া বলিল, আর তোমায় চীৎকার করতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি ; তোমার ঘুঁটে নয়। হ'লে কিন্তু দিয়ে আসবে।

রমা যাইতে যাইতে বলিল, ভারতী তুই এত গম্ভীর হ'লি কেন রে ?

সহসা ট্রেনের আওয়াজে সবাই চকিত হইয়া একটু আগাইয়া গেল।

মুখে এক রাশ ধোঁয়া লইয়া অজানার উদ্দেশ্যে বিরাট্ যন্ত্র-দানব ছুটিযাছে—বিকট আর্ত্তনাদে। ট্রেন দেখিলেই মন কেমম উদাস হইয়া যায়। মনে হয় সংসারের সকল কর্ত্তব্য পড়িয়া থাক্। ওরি একটি কক্ষে চাপিয়া অনির্দ্দিষ্টের পথে বাহির হইতে পারিলে সকল অশান্তির সমাধা হইয়া যায়।

ভারতীর চোখ দু'টি সজল হইয়া উঠে। কতদিন পিতামাতাকে দেখে নাই।

ভাই শানু,—তাহার কথা বেশী করিয়া মনে পড়িয়া গেল। মা লিখিয়াছেন—শানু বড্ড রোগা হইয়া গিয়াছে, কিছু খাইতে চায় না ; সর্ব্বদা অন্যমনস্ক। বাড়ীর সামনে কোন গাড়ি আসিলেই ছুটিয়া যায় 'দিদি এসেছে' বলিয়া। পিওন আসিলে ছুটিয়া যায় এবং পিওনকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমার মেজদির চিঠি এনেছ ?'

শানু যখন দেড় বছরের তখন ছোট বোন টুনি হয়। ছোট্ট শানু শুধু ভারতীকে উপলক্ষ করিয়া বাঁচিয়া ছিল। সময় সময় কি বায়নাই না ধরিত। রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতও না। মায়ের জন্য কাঁদিয়া অস্থির হইত—শেষ পর্য্যন্ত মাকে না পাইয়া নিবিড়ভাবে ভারতীকে জাপটাইয়া ধরিত।

দরিদ্রের সংসার—ঝি-চাকরও ছিল না।

বাবা স্কুল মাষ্টার, মাহিনা বেশী পাইতেন না, তবে টিউশানির সামান্ত কিছু আয় ছিল। ভারতীরা ছ'টি ভাই বোন।

বড়দিদির বিবাহে কিছু দেনাও ছিল। পরিশোধ হইবার পূর্ব্বেই ভারতীও বড় হইয়া উঠিল।

মা এবং বাবার একান্ত জেদ্ ছিল, নিজেরা কষ্ট করিয়া মেয়েদের সৎ পাত্রে দান করার।

দিদির স্বামী ছিলেন ডাক্তার। ভারতীকেও দিয়াছেন অনেক দেখিয়া শুনিয়া। মায়ের এক সন্তান, জমিজমাও কিছু আছে এবং ছেলেটি গবর্ণমেণ্ট অফিসে ভাল চাক্‌রি করে। খরচ দস্তুরমতই বাবাকে করিতে হইয়াছিল।

কানু, ভানু ও শানু তিনটি ভাই। কানু এইবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে।

সংসারের যাবতীয় কাজই ভারতী করিত। পাড়ার লোকে শত মুখে ভারতীর সুখ্যাতি করিত।

লেখা পড়ায়ও ভারতী খুব ভাল ছিল। আর এক বছর পড়িতে পাইলে সে ম্যাট্রিক্ দিত। স্কুল ম্যাগাজিনে একবার একটা কবিতা লিখিয়া ভারতী খুব প্রশংসা পাইয়াছিল। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় খুশি হইয়া ভারতীকে একখানা গীতাঞ্জলি পুরস্কার দিয়াছিলেন।

অতি যত্ন সহকারে আজও ভারতীর বাক্সের মধ্যে গীতাঞ্জলিখানি তোলা আছে।

বাবার কি আনন্দ! একটা টাকা দিয়াছিলেন কানুকে মিষ্টি আনিবার জন্য। উৎসাহ না পাইলে মানুষের কিছুতেই উন্নতি হয়না— বাবা এই কথা প্রায় বলিতেন।

শানুর সেই লোভাতুর মুখখানি সহসা ভারতীর চোখের সামনে

ভাসিয়া উঠিল। রক্ত আমাশয় সেবার ভুগিয়া ভুগিয়া সে চারটি পোরের ভাতের জন্য কি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত।

বায়স্কোপের ছবির মত পর পর সব ঘটনাই ভারতীর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সবারি অজ্ঞাতে ভারতী মুখ ফিরাইয়া চোখ দু'টি একবার মুছিয়া লইল।

ঘাটের কিনারায় আসিয়া পড়িল।

প্রকাণ্ড পুকুরটি। চারিদিকে বাঁধানো বড় বড় সিঁড়ি সার বাঁধিয়া জলের কোলে নাবিয়া গিয়াছে। সবুজে জলের উপর হাল্কা ঢেউ ধীরে বহিতেছিল। চারিপাশ নারিকেল, সুপারি ও বড় বড় তাল গাছে ঘেরা —তাই নাম 'তালপুকুর'।

রমা ও আর আর সঙ্গীরা বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে জলের বুকে গা ভাসাইয়া এদিক ওদিক সাঁতরাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ভারতীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া রমা পার্শ্ব-সহচরীকে কহিল, জানো ভাই বউদি, ভারতীর মনে বিরহ উথলে উঠেছে—তাই ও এখন নীরবে শ্যামদার চিন্তায় বিভোর হ'য়ে গিয়েছে। পায়ের তলায় জল, মাথার উপর আকাশ, দূর হ'তে ট্রেনের ঝক্ ঝক্ শব্দ—এ সময় কি আমাদের ভাল লাগে।

দরদ-পূর্ণ কণ্ঠে বউদি বলিলেন, না হবেই বা কেন? তুমি না হয় গিয়েই বরটিকে দেখতে পাবে, তোমার আর কি। খুশিতে মন তোমার ভরা। পুকুরের বুকে প্রেমে গদগদ হ'য়ে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছ। তোমার বর ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে, তুমি আর লোকের মনের খবর কি জানবে বল। ও বেচারী যদি একটু চিন্তাই করে—অন্যায় কি? এও

বলি বাপু, শ্যাম ঠাকুরপো যেন কি রকম অদ্ভুত মানুষ। বউ বেচারী একাটি পড়ে থাকে—একবার আসার নামও নেই। ভারতী আগের চাইতে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে—কিছুদিন আগেও কি সুন্দর চেহারা ছিল। যে বয়সের যা—সোমত্ত মেয়ে, এখন কোথায় আনন্দে উপ্‌চে পড়বে তা' না—হাসতে যেন ভুলেই গেছে।

ভারতী মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল,—কি কথা আসিয়া পড়িবে তাহার জানা আছে।

রমার কথা খণ্ডন করিতে ভারতী বলিল—রমা পাগলীর কথা বাদ দিন দিদি। মন আমার সত্যি ভাল নেই, মায়ের চিঠিতে জানতে পেরেছি আমার ছোট ভাই শানুর বড্ড শরীর খারাপ। এই কয়টি কথা বলিতে গিয়া ভারতীর আর ধৈর্য্য থাকিল না—সবারি সামনে ভারতীর চোখ হইতে অঝোরে জল পড়িতে লাগিল।

রমা বিব্রত হইয়া উঠিল। কৌতুক ছলে ভারতীকে আঘাত দেওয়া ঠিক হয় নাই।

বউদি স্নেহভরে পুনরায় বলিলেন, আহা, ভাইএর অসুখ মন আবার খারাপ হবে না? কথায় বলে, ভাইএর মত মায়ার জিনিস দুনিয়ায় আর কিছুই নয়। কাকামা বলেন শুনিতো—তোমার আবার হাতে ক'রে মানুষ। তা বলি বউ, রাগ করিস না, আজকালকার মেয়ের মত তুই ন'স। তা' না হ'লে তোর কিসের অভাব! শ্যাম ঠাকুরপোর কানে ধরে তিনবার বাপের বাড়ী থেকে ঘুরিয়ে আনতে পারতিস এতদিনে।

সবারি কাছ হইতে স্বামীর অন্যায় অভিযোগ শুনিতে শুনিতে ভারতী তিক্ত হইয়া উঠে। ভারতী তো এমন করিয়া জানিতোনা তাহার স্বামী তাহার উপর অন্যায় ব্যবহার করে।

কি যে অন্যায় তাহাও ভারতী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শুধু এইটুকু বোঝে, তাহার স্বামী তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখায় বলিয়াই পাড়ার এবং পাঁচজনের তাহার প্রতি এত সহানুভূতি।

পুকুরের অপর প্রান্ত হইতে কয়েকখানি শুখনো পদ্ম পাতা ভাসিয়া আসিতেছিল। রমা সাঁতরাইয়া গিয়া ধরিল, নে ভারতী ধর।

ভারতী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও দিয়ে কি করবো?

রমা বলিল, আজ যদি শ্যামদা বাড়ী আসেন কাল আমায় এই পাতায় ক'রে সন্দেশ খাওয়াবি। আমি তোর শুখনো বন্ধু, তবে একটা কথা মনে রাখিস; কাঠ কিন্তু ভিজে থেকে শুখনোই জ্বলে ভাল। শুখনো জিনিসেরই অনেক সময় প্রয়োজন হয় বেশী।

ভারতী হাসিয়া বলিল, তুই দেখছি হিতোপদেশ শোনাতে বসলি। আজ যে দেখছি স্ফূর্তিটা একটু বেশী রকমের—ব্যাপার কি? ও বুঝতে পেরেছি কাল যে রবিবার।

হাসিতে হাসিতে তাহারা যখন উঠিল বেলা তখন পড়িয়া গিয়াছে। সূর্য্য সবে মাত্র অস্ত গিয়াছে। দূর চক্রবালে এক সারি বলাকা বোধ হয়, কেমন উড়িয়া চলিয়া গেল। মনে হয়, সারাদিন ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া সামনেই কোন আশ্রয়ের জন্য চলিয়াছে।

জীব মাত্রেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে পরিশ্রম করিলে।

আর সে যদি ক্লান্ত দেহটিকে না বহিতে পারে, তার কোন আশ্রয়ই নাই। ক্লান্ত হইলে আশ্রয় নাই, অভিযোগ করিলে শ্রোতা নাই;—কি বৈচিত্র্যহীন জীবন তাহার।

ভারতী যখন বাড়ী ঢুকিল সামনেই দেখিতে পাইল শ্যামলালকে :—কুলীর সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

দুর্গাবতী পাশে দাঁড়াইয়া কুলাকে বোঝাইতেছেন—যা বাছা, যা, পেয়েছিস তো—বরং চারটি মুড়ি নে।

প্রকাণ্ড একটা পোঁটলা ও টিনের স্যুটকেস্ দেখাইয়া কুলী জানাইল, তুমিই বলনা ঠাকরুণ—এই ব'য়ে এনেছি। ঠাকুর বলছে চারটে পয়সা নিতে। সেই আলের পথ বেয়ে মাথা ঝিন্ ঝিন্ কচ্ছে।

দুর্গাবতী বলিলেন, তা বাপু তুমি দর না ক'রে মোট মাথায় করলে কেন?

কুলী উত্তর দিল, এজ্ঞে আমি কি এতই বোকা, দর না করেই মোট কাঁধে করেছি। আমি বললাম আট আনা, ঠাকুর অনেক বলা কওয়াতে ছ'আনা দর হ'ল; তা ঠাকুর আবার পাঁচ জায়গায় দেখতে গেল, কিন্তু নোক কোথা?

দুর্গাবতী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শ্যামলালের মুখের পানে চাহিলেন।

সেদিকে আর মনোযোগ না দিয়া শ্যামলাল কুলীটার প্রতি চড়াও হইয়া বলিয়া উঠিল, দর না দিলে তুই আস্‌তিস? ফের যদি বেশী বকাবকি করিস—সোজা নিয়ে যাবো সেই ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে।

মাথায় কাপড় টানিয়া ভারতী ঘরের মধ্যে ঢুকিল। দুর্গাবতী কোন কথা না বলিয়া আঁচল হইতে একটি সিকি ও দু'টি আনি বাহির করিয়া লোকটির হাতে দিয়া দিলেন।

শ্যামলাল 'কর কি, কর কি' বলিয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। পয়সা বড্ড সস্তা? ছোটলোকেরা তোমাদের প্রশ্রয়েই বেড়ে উঠেছে দিন দিন।

দুর্গাবতী বলিলেন, দর করেই এনেছ; এখন না দিলে অন্যায় হয়। মিছেমিছি ওর সঙ্গে বকে হয়রানি হওয়া। এখন গায়ের জামাটা খোল।

বউমা কোথায় গেলে গা—মাদুরখানা বিছিয়ে দিয়ে যাও। হ্যাঁরে শ্যাম, তোর তো এ শনিবারে আসবার কথা ছিল না, হঠাৎ এলি, শরীর ভাল ছিল তো?

যথাসম্ভব মুখখানা গম্ভীর করিয়া শ্যামলাল উত্তর দিল, না এসে উপায় কি বল, একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিলে না। অসুখ লিখ্‌লে, ব্যাস্‌। বাধ্য হয়েই অনর্থক খরচ করে আসতে হ'ল।

দুর্গাবতী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, ভালই তো করেছিস্ এসে।

শ্যামলাল বলিল, তোমাদের একটা উচিত, অনুচিত সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই।

দুর্গাবতী এবার বিরক্ত হইলেন। রুষ্টভাবে ছেলেকে বলিলেন, তুমি তো বেশ দেখছি। অনুচিত জ্ঞানটা আমার কিসে হ'ল, কোনখানে দেখলে? বউ মরণাপন্ন—ডাক্তার বলে টাইফয়েড্, জ্ঞান ছিল না—তার ওপর ভুল বকুনি। তোমায় লিখ্‌লাম পত্র পাঠ চলে এস, চিঠিকে টেলিগ্রাম মনে ক'রে; তুমি নির্ব্বিকারচিত্তে লিখে জানালে—'আমার যাওয়া কি দরকার, বেশী বুঝলে ক'বরেজ ডেকো।' তুমি তোমার কর্ত্তব্য সারলে। আর একা বুড়োমানুষ আমি—'রুগী', ডাক্তার আর সাত দিকের তাল আমার ওপর দিয়ে গেল।

বউমা যে ভাল হবে কেউ বলেনি—সোমত্ত বয়সে ও রোগ হ'লে সহজে ভালই হয় না। বাছা আমার কি কষ্টই পেল। শুধু ভগবানের কৃপা আর ওর বাপ মায়ের পুণ্যির জোরে এ যাত্রায় বউ আমার ভাল হয়ে' উঠলো।

ওই যে বউমা জল দিয়ে গেল, হাত মুখ ধুয়ে নে।

বউমা শোন।

ভারতী নীরবে আসিয়া দাঁড়াইল।

দুর্গাবতী বলিলেন, পাট-কাটি জেলে একটু চায়ের জল বসাও।

বাধা দিয়া শ্যামলাল বলিল, চা আবার কেন—চা আমি খাইনে।

দুর্গাবতী বলিলেন, চা তুই খাসনে?

শ্যামলাল উত্তর দিল, বাজে নেশার পক্ষপাতী আমি নই।

বউমা, শুধু তুমি একটু চা ক'রে আগে খেয়ে নাও। তুমি রোগা মানুষ, ও না খায় না খাক্! চায়ের জল বসিয়ে তুমি বরং শ্যামকে চারটি মুড়ি মেখে দাও, ধানি-লঙ্কা গাছ থেকে একটা টাট্‌কা লঙ্কা তুলে দিও।

আনন্দের সহিত শ্যামলাল বলিল, ওই ভাল, দেশী আহার। কল্‌কাতায় মুড়ি পর্য্যন্ত কি আক্রা—একেবারে ডাকাতের দেশ, কথায় কথায় পয়সা।

তুই ততক্ষণ খা, আমি মালোপাড়া ঘুরে আসি, যদি একটু মাছ পাই দেখে আসি।

শ্যামলাল বলিল, আবার মাছ কেন? পোঁটলা খোল, অনেক ডা'ল আছে।

দুর্গাবতী অবাক্ হইয়া বলিলেন, ডা'ল!

শ্যামলাল উত্তর দিল, হ্যাঁ—ডা'ল। কিন্তু এতে তুমি অবাক্ হচ্ছ কেন?

দুর্গাবতী বলিলেন, আমি ভাবছি রোগা বউএর জন্যে ফলমূল, নতুন কোপি, কড়াইশুঁটি বুঝি। তা'না কতকগুলো ডা'ল—কিসের, সোনা-মুগের?

মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া শ্যামলাল উত্তর দিল, রেশনে পাওয়া যায়, ছ'আনা সেরে। মসুর, অড়হর, কলাই, মটর, খেসারিও আছে।

অবাক্ করলি বাবা! দু'জন মানুষে থাকি, বউমা ডা'ল ছোঁয়ও না। তারপর রেশনের ডা'ল, সেদ্ধ ক'রতে ছ'আনাকে সুদে আসলে—দশ আনায় দাঁড় করাবে।

তুই ব'স শ্যাম, আমি একটু ঘুরে আসি।

শ্যামলাল বসিয়াছিল, মাকে যাইতে দেখিয়া চারিদিকে চাহিয়া পা টিপিয়া আস্তে আস্তে রান্নাঘর পানে তাকাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং ভারতীর চোখ দু'টি চাপিয়া ধরিল।

ভারতী নীরবে বসিয়া রহিল কোন কথা না বলিয়া।

কিগো, কথা বলবে না, রাগ করেছ বুঝি?

ভারতী শ্যামলালের হাতখানি সরাইয়া দিল।

খানিক চুপ করিয়া থাকিবার পর ভারতী বলিল, রাগ করাটা কি অন্যায়?

শ্যামলাল হাসিয়া বলিল, মানা তো করিনি। রাগ একশোবার ক'রবে; তুমি যদি রাগ না করতে তা'হ'লে আমার বাড়ী আসার আনন্দই মাটি হ'য়ে যেত।

ভারতী কাঁপা গলায় উত্তর দিল, তোমার জীবনে আবার আনন্দের প্রয়োজন আছে নাকি? নতুন কথা মনে হচ্ছে যে।

শ্যামলাল বলিল, নতুন কথাই বল আর পুরনো কথাই বল, রাগ তুমি মাইরি আমার উপর জীবন ভোর করো। সত্যিই বলছি, তুমি রাগ করলে আমার খুব ভাল লাগে।

ভারতী উত্তর দিল, ভাল লাগার কারণ আর কিছুই না, এ শুধু তোমার সব জিনিসকে এড়িয়ে যাবার ভান।

শ্যামলাল বলিল তা' হয়তো তুমি বলতে পার। আমার যদি কোন দোষ বা ত্রুটি থাকে সেটা কি তোমারও গ্লানি নয়? ভারতীর কথার কোন অপেক্ষা না করিয়া শ্যামলাল ভারতীকে আপনার বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে চাপিয়া ধরিল। পরিপূর্ণ আবেগভরে ভারতীর কপালের উপর চুলগুলি হাত দিয়া সমান করিতে লাগিল।

ভারতী স্বামার বুক হইতে মুখ তুলিয়া আস্তে আস্তে অনুযোগের সুরে বলিল, আমার এত অসুখ গেল তবু তুমি এলে না। তুমি একবার ভেবেও দেখলে না যদি মরেই যেতাম, তা' হ'লে আর তো দেখতে পেতে না।

শ্যামলাল ভারতীর মুখখানা দু'হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল, কেন আসিনি জানো? তখন এলে তো তোমায় কাছে পেতাম না। শুধু অসুখ দেখ তে এসে কি হ'তো?

ভারতী শ্যামলালের কাছ হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল ও সজোরে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ও তাই বল।

কিন্তু মনে কর আমার যদি একটা শক্ত অসুখ হয়। মানুষের শরীর, বলাতো যায় না—যদি দু'মাস পড়েই থাকি, তা' হ'লে বোধ হয় তখন তোমার কোন কর্ত্তব্যই থাকবে না। কারণ তখন আমায় দিয়ে তোমার কোন প্রয়োজন থাকবে না। দরকার না থাক্‌লে তুমি আমার সঙ্গের সম্বন্ধ অস্বীকার করতেও পারো। স্বার্থই তোমার কাছে বড় আর আমি তুচ্ছ।

শ্যামলাল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, কি যে বল তার ঠিক নেই। সামান্য কথাকে বড্ড বড় করে ধর, ওই তোমার দোষ। ব্যাপারটাকে লঘু করিবার ছলে শ্যামলাল বলিল, তোমার জন্যে অনেক জিনিস এনেছি। সাবান, স্নো, আল্‌তা, পাউডারও এক কৌটো এনেছি।

ম্লান হাসি হাসিয়া ভারতী বলিল, ফেলে দাও গে, ও আমি চাই না। তা' ছাড়া ও দিয়ে আমার দরকারই বা কি? আমার গরিব বাবা আমায় অনেক মাখিয়েছেন।

শ্যামলাল উত্তেজিত হইয়া বলিল, এ সব কি বলছ, আমি টাকা খরচ' করে এনেছি ফেলে দেবার জন্মে? শরীর জল করে পয়সা উপায় ক'রতে হ'লে বুঝতে কি কষ্ট করতে হয়।

তাচ্ছিল্যের সুরে ভারতী কহিল, আমার বুঝেও কাজ নেই। পয়সা উপায় করা আমার তো কাজ নয়। এক তুমি পয়সার সার মর্ম্ম বুঝেছ তা'তেই অস্থির, আবার তোমার সঙ্গে আমি যদি পয়সাকে চিনতে আরম্ভ করি তা'হ'লে পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক মিলে লোক-সমাজ থেকে সেই সুন্দরবনে না হয়তো গারদখানায় দিয়ে আসবে। পয়সা উপায় সব লোকেই করে, তা' বলে' তোমার মত মনুষ্যত্ব কেউ বিসর্জ্জন দেয় না।

শ্যামলাল অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল ভারতীর পানে। আজ পর্য্যন্ত ভারতীকে শ্যামলাল কোন দিন জোরে কথা বলিতে কিম্বা কথার প্রতিবাদ করিতে শোনে নাই। সেই ভারতীর এত অল্প সময়ে কি করিয়া এত পরিবর্ত্তন হইল?

দুর্গাবতীর সাড়া পাইয়া ভারতী মাথার কাপড় টানিয়া ফুটন্ত জলে চ'াল ছাড়িতে বসিয়া গেল।

শ্যামলাল দাওয়ায় বসিয়া মুড়ির বাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে পয়সার সম্বন্ধে ভারতীর উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ভীত হইল। কিছু পূর্ব্বেও শ্যামলালের জলযোগের প্রয়োজন ছিল, এখন যেন মনে হইতেছে আহারের আর প্রয়োজন নাই—পেট যেন পরিপূর্ণ।

দুর্গাবতী বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাকিলেন বউমা, একবার বাইরে এস। পাঁচী মাছ এনেছে, দেখে নাও।

একটা ঝাঁকায় গুটিকতক মাছ লইয়া পাঁচী ডাকিল, এসগো বউদি তাড়াতাড়ি।

ভারতী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইতে পাঁচী একটা বড় ইলিশ মাছ হাতে করিয়া তুলিয়া ধরিল—নাও বউদি এই মাছটা। কেমন উপোর পাতের মত চক্‌চকে আঁশ। তাজা মাছ, এখনো কান দিয়ে অক্ত গড়াচ্ছে। বিশ্বেস না হয় এই দেখ।

দাদামশায়ের কপাল ভাল। তা' নাহ'লে কি অসময়ে এত বড় ইল্‌শে পাওয়া যায়। ও পাড়া পানে যাচ্ছিলাম, পথ থেকে বড় খুড়ী ডেকে আন্‌লো। মরা গাঙের মাছ খুব সোয়াদ হবে। আপন মনেই পাঁচী কথাগুলি বলিয়া গেল।

দুর্গাবতী বলিলেন, থাম বাছা; অত যদি এক বাড়ীতেই বকিস্‌ একটা মাছের জন্যে তাহ'লে পাঁচটা মাছ বিক্রি করতে তুইতো হয়রানি হ'য়ে পড়বি।

নিয়ে যাও বউমা একটা মাছ, ওকে ছেড়ে দাও।

তুই দাম বল পাঁচী কত করে সের, ওজনসুদ্ধ কত হ'ল?

পাঁচী উত্তর দিল, দেড় টাকা।

চম্‌কিয়া শ্যামলাল বলিল, দে-এ-ড় টাকা!

দুর্গাবতী ধমক্‌ দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই থাম্‌। উঠানের এক কোণে বড় মান গাছের একটি পাতা কাটিয়া আনিয়া বলিলেন. দে পাঁচী, ওই চওড়া বড় মাছটা।

বউমা, কুলুঙ্গির ভিতর বাটিতে টাকা আছে, দেড়টা টাকা এনে পাঁচীকে দিয়ে দাও।

টাকা দেড়টা মাথায় ঠেকাইয়া পাঁচী ঝাঁকা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্যামলাল উত্তেজিত হইয়া ডাকিল, মা—

দুর্গাবতী মাছ কুটিতে কুটিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু বলছিস্ শ্যাম?

বলছি, তোমারও কি মতিভ্রম হ'ল; এই ভর সন্ধ্যে বেলা টাকা দিলে?

ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, কই, সন্ধ্যে দিলে না—ওসব পাট্ বুঝি উঠিয়ে দিয়েছ? একবারে সাহেব বাড়ী হ'ল দেখছি।

দুর্গাবতী কথা গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, শ্যাম শোন্; তুই মাছের ঝোল ভালবাসিস্ কচু, কাঁচা কলা দিয়ে। ওই দেখ্ কোণে আঁকশি আছে, তোর ঘরের পেছনে কলাগাছ থেকে চারটে কাঁচা কলা পেড়ে দে। বউমা, হারিকেনটা দেখাও শ্যামকে।

তুমি বউমা রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এস, রোগা মানুষ, আর উনানের তাতে থেক না।

শ্যামলাল বাক্যব্যয় না করিয়া চারটে কাঁচা কলা পাড়িয়া দিয়া পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইল।

হেমন্তের সন্ধ্যাকে পল্লীগ্রামে রাত বলিলেও ভুল হয় না। রাত্রি ন'টার সময়ই যেন মনে হয় গভীর রাত্রি। বিরাট কালো জাজিম্ কে যেন বিছাইয়া দিয়াছে ধরিত্রীর বুকে। শুধু সীমাহীন আকাশের বুক চিরিয়া লক্ষ লক্ষ তারা হীরকখণ্ডের মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

শ্যামলাল এখনও বাড়ী ফেরে নাই। দুর্গাবতী চিন্তিত হইয়া ঘর বাহির করিতেছেন।

খানিক পরেই শ্যামলাল বাড়ী ফিরিল। দুর্গাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়েছিলি এত রাত পর্য্যন্ত? আমি বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে তোর দেখা পেলাম না। নতুন হিম পড়ছে, একেই তো ঠাইনাড়া হয়েছে; বেশ করে হিম লাগিয়ে এলি তো?

হাসিয়া শ্যামলাল বলিল, খেজুরের রস খেতে ষ্টেশনের ধারে কুলীপাড়ার মধ্যে দিয়ে রায়েদের যে বড় বাগানটা পড়ে তারই উত্তর দিকে যে খেজুর গাছগুলো আছে ওইখানে অবিনাশের সঙ্গে গিয়েছিলাম। জিড়েন কাঠের রস অনেক খেয়েছি মা।

দুর্গাবতী গালে হাত দিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশ! ওখানে যে বাঘ বেরিয়েছিল, কুলীদের একটা গরু ওইখানে বাঘে ধরেছিল। আমাকে বল্‌লেই তো পারতিস্। কাল্‌কে দুলে বাগ্‌দী এক ভাঁড় রস দিত, মাত্র দু'আনা পয়সা দিলেই হতো।

শ্যামলাল কথা না বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল গরম কোট ও সোয়েটার খুলিতে।

দুর্গাবতী শ্যামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, নে বাছা তাড়াতাড়ি। রাত অনেকখানি হ'ল। ছেলেমানুষ বউটা শুখোচ্ছে।

শ্যামলাল কি একটু চিন্তা করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা মা, তুমি আজকাল আমার থেকে তোমার বউকেই বেশী ভালবাস, না?

দুর্গাবতী বলিলেন, বউমার কথা বলছিস্ তো? তা' ভাল না বেসে কি করি বল? ছেলেমানুষ একধারে মুখ বুজে পড়ে থাকে, কোন সাধ আহ্লাদ পায় না। কতদিন বাপের বাড়ী থেকে এসেছে। ওর মন কি চায় না একবার বাবা মার কাছে যেতে?

ব্যথিত হইয়া শ্যামলাল উত্তর দিল, কা'কে বল্‌ছ মা, তুমি যদি ইচ্ছা কর পাঠিয়ে দিলেই তো পার।

দুর্গাবতী মনে মনে খুব খুশি হইলেন, কিন্তু বাহিরে সে ভাবটি প্রকাশ না করিয়া যথা সম্ভব মুখ গম্ভীর করিয়া উত্তর দিলেন—আমি কি ক'রতে পারি বাছা? না হয় পাঠালাম, কিন্তু—আন্‌বার সময়?

বিব্রত হইয়া শ্যামলাল উত্তর দিল, ও'টি পারবোনা মা। এই দিন কালে এক রাশ টাকা খরচ করার মত সঙ্গতি আমার নেই। বরং শ্বশুর মশাইকে লিখে দাও নিয়ে যেতে, মাস ছয়েক পরে আবার যেন ঘুরিয়ে দিয়ে যান।

বিস্ময়ের সুরে দুর্গাবতী বলিলেন, ওমা, একথা কখনো লিখ্‌তে পারা যায়! বেয়াই ছা-পোষা মানুষ, নিজের মেয়ে ব'লে একবার না হয় নিয়ে গেলেন, তা' বলে আন্‌তে যাবার সময় তুই যাবি না? সক্ষম জামাই তুই, তোরই তো কর্ত্তব্য বছরে একবার ক'রে ওঁদের মেয়ে ওঁদের দেখিয়ে আনা। এ'ছাড়া তোকে দেখতেও তো ওঁদের ইচ্ছে হয়। মানুষ সৎ পাত্রে মেয়ে দেয় এই জন্যেই। শুনিতো, বউমার বড় বোন আর ভগ্নীপোত সেই দিল্লী থেকে আসে ওঁদের দেখ্‌তে। তারপর আমারও কি বউ সস্তা যে ছ'মাস ফেলে রাখবো বাপের বাড়ীতে।

গম্ভীর হইয়া শ্যামলাল জবাব দিল, দিল্লীর সব বড়লোক, ওদের কথা বাদ দাও। আমি এই জন্যেই বাড়ী আস্‌তে চাই না, এলেই তোমাদের পাঁচশো ফর্দ্দ। বিকাল থেকে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল। কি যে মনে কর বুঝতে পারছি না। তোমাদের ধারণা আমার যেন টাকার গাছ আছে।

ক্ষুব্ধ হইয়া দুর্গাবতী বলিলেন, আমার নিজের জন্যে কোন ফর্দ্দই তোমায় কোন দিন দিইনি। তোমার বউএর জন্যেই বলা। চোখের

সামনে দিন দিন শুখিয়ে যাচ্ছে, তাই। তা' না হ'লে আমার কি এমন দায় ঠেকেছে যে, তোমায় বিরক্ত ক'রে তোমার সঙ্গে অশান্তি করি। আমার এমন কোন ঝঞ্ঝাট নেই যে, তা'র জন্যে তোমার মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাক্‌তে হবে আর আমায় ফর্দ্দ ক'রতে হবে।

শ্যামলাল জবাব দিল, এত সুখেও যদি দিন দিন শুখিয়ে যায় তা' হলে আর উপায় কি। যদি খরচ করার সামর্থ্য না থাকে আমার, তা হ'লে চুরি করা তো নিয়ম নয়।

ভারতীর সাড়া পাইয়া মাতা পুত্র দু'জনেই থামিয়া গেল। দু'জনের কারুরই খেয়াল ছিল না যে ভারতী ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া পান সাজিতেছিল। দুর্গাবতী কি একটা অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। শ্যামলালও অপ্রস্তুত ভাবে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। তাহার রাগ হইল মায়ের উপর—যেখানে সেখানে যখন তখন এসব কথা আলোচনা করাই বা কেন? যাহা হউক, ভারতীকে আবার বুঝাইতে হইবে।

রাত্রে শ্যামলাল বিছানায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া একাগ্রমনে কি দেখিতেছিল,—নিঃশব্দে ভারতী পানের ডিবা হাতে ঘরে ঢুকিল।

শ্যামলাল এত মগ্ন ছিল যে সে ভারতীর আগমন প্রথমে জানিতে পারে নাই, পরে তাহার চুড়ির আওয়াজ পাইয়া সচকিত হইয়া উঠিল। ব্যস্তভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া শ্যামলাল প্রথমেই ভারতীকে খুশি করিবার অভিপ্রায়ে সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "শুনছো?" নির্ব্বিকার চিত্তে ভারতী উত্তর দিল, "কি বল?"

শ্যামলাল ব্যাঙ্কের সুদ সমেত নগদ সাড়ে সাত হাজারের পাস-বই খানি ভারতীর হাতে দিল হিসাব দেখিতে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, এ কি ?

শ্যামলাল বলিল, দেখনা কি।

ভারতী খাতাখানি দেখিয়া বলিল, এ তো পাস-বই, এ দিয়ে কি হবে ?

শ্যামলাল গর্ব্বের সহিত বলিল, তোমায় কত ভালবাসি দেখ। কষ্ট ক'রে থাকি, একটি পয়সা বাজে খরচ করি না, তাই এর মধ্যে এতগুলো টাকা জমিয়ে ফেলেছি। রিটায়ার করবার সময় এই ধর—ইনসিওর ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা পাবো। শুধু তুমি যদি একটু সাহায্য কর.—এই বলিয়া শ্যামলাল ভারতীর মুখের পানে চাহিল।

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ভারতী গম্ভীর ভাবে বলিল, কি হবে অত টাকা দিয়ে ?

শ্যামলাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তার মানে ?

ভারতী বিমনা হইয়া জবাব দিল, মানে কিছুই না।

শ্যামলাল বিস্ফারিত নেত্রে বলিল, অবাক করলে, তোমাদের কি মতিভ্রম হ'ল ?

ম্লান হাসি হাসিয়া ভারতী জবাব দিল, তোমার মত সব মানুষ যদি দিন রাত টাকার ধ্যান না করতে পারে, তাহ'লে তোমার মতে হয় সে 'পাগল' নয় তার 'মতিভ্রম', কেমন—এই তো ?

শ্যামলাল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, হ্যাঁ তাইতো।

ভারতী বলিল, তোমার যেমন একটা আকর্ষণ আছে, তেমনি অপরেরও অন্য কিছুর ওপর আগ্রহ বেশী থাকতে পারে ! এটা মনে করা তোমার উচিত। তা'ছাড়া গরিব লোকের মেয়ে আমি, কি হবে আমার অত টাকায়। এই নাও তোমার পাস-বই, তুমি এর যা' মূল্য

বুঝবে—আমার তা' ধারণাতেও আস্‌বে না। তাই বলছি, তুমি তোমার জিনিস যত্ন করে রেখে দাও। শুধু একটা অনুরোধ আমার। তোমার সঙ্গে দেখা মাসে আমার দু'দিন। এই আটচল্লিশ ঘণ্টা অন্ততঃ, আমার কাছে তুমি ও প্রসঙ্গ আর তুলো না। আমার বড় ভয় হয়—শেষ পর্য্যন্ত তোমার মত আমাকেও যেন ওই নেশায় পেয়ে না বসে। আর বেশী সে কিছু বলিতে পারিল না, কণ্ঠ যেন তাহার আপনা হইতেই রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অপলক্ নেত্রে কিছুক্ষণ ভারতীর পানে চাহিয়া শ্যামলাল বলিল, তোমাদের কাছে কি যে 'সার' তা' তো বুঝছিনা। মুহূর্তেই মনের ভাব সামলাইয়া সহাস্যে বলিল, সার জিনিস তোমার কাছে এই তো, কেমন? বালিশের তলা হইতে একখানি খাতা বাহির করিয়া ভারতীর সামনে ধরিল। কেমন এই তো 'সার', এই উপলক্ষ করেই তো মনের ভাবান্তর।

ভারতী চট্ করিয়া খাতাখানি লইতে গেল।

শ্যামলাল বলিল, আমার কাছে থাক্ এর জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। কবিতা লিখছো তো তা লেখ ভালই, ওতে আমার আপত্তি নেই। ওর কিন্তু উপকার এই যে, ওতে সময়ের অপব্যয় আর মনকে রাঙিয়ে কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যাওয়া। আর বল্‌লে হয়ত রাগ করবে, খানিকটা কাগজেরও অপব্যয়। আমরা হ'লাম বাস্তব-বাদী, রঙিন্ ফানুসে উঠে মেঘলোক দেখা আমাদের কর্ম্ম নয়। এখানে শুধু পয়সাটাই বড়, বুঝেছ পাগ্‌লী? রাত হয়েছে অনেক, বাজে কথায় মনকে উদ্‌ব্যস্ত করা বোকামি। এস শোওয়া যাক্। খাতাখানা আমার কাছে থাক্, মেসে একটি ছোকরা আছে, সে এ সব বেশ বোঝে ভাল।

ভারতী বাধা দিয়া 'না' বলিবার আগেই শ্যামলালের বাহুর মধ্যে আবদ্ধ হইল।

শ্যামলাল বাড়ী আসিল এবং চলিয়া গেল, কিন্তু ভারতী খুব সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে শুনিয়া আসিয়াছে বান্ধবীদের কাছ হইতে কত কথা। পরিপূর্ণ প্রেমে তাহারা হইয়া উঠে বিভোর। কত গল্প, প্রেম, সোহাগ, মান, অভিমান, সাধ্য-সাধনায় কোথা দিয়া রাত যে অতিবাহিত হইয়া যায় তাহারা জানিতেও পারে না। বাজে কথায় মূল্যবান্ সময় তাহারা এতটুকুও নষ্ট করে না।

কিন্তু ভারতীর ওসব কোন ঝঞ্ঝাটই নাই।

শ্যামলাল চাহে না বেশী কিছু, শুধু বাস্তব জীবনে যেটুকু প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত কোন কিছুই তাহার কাম্য নয়। মনের কারবারী সে নয় তাই অপরের মনের ভাঙা-গড়ার হিসাব তাহার খাতার পাতায় কোনদিনই স্থান পায় না।

রাগও সে করে না। জানে, রাগ করিলে আবার ঝঞ্ঝাটও আছে। দু'দিনের জন্য বাড়ী আসে, রাগ করিয়া নিজের সুখ, সুবিধাটুকুর অভাব ঘটাইয়া লাভ কি? মিথ্যা হাঙ্গামায় পড়িয়া অশান্তিকে ডাকিয়া আনিবার কোন প্রয়োজন সে বোধ করে না। মা, বউ বলিতেছে, বলুক্। মেয়েমানুষের বুদ্ধি শুনিলে ফকীর হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। তাহার মতে কোন ভাল কাজই পরের বুদ্ধি শুনিলে হয় না।

ভারতী শ্যামলালের ব্যবহারে ব্যথিত হয় কিন্তু তীব্র বাদপ্রতিবাদ করিয়া সামান্য কয়েক দিনের জন্য কোন তিক্ততার সৃষ্টি করিতে চাহে

না। শ্যামলাল যে তাহাকে ভালবাসে না এমনও নয় কিন্তু সে ভালবাসার রূপ তাহার কল্পনা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত।

ঠাকুমার কথা মনে পড়িয়া যায়—স্বামী মহাগুরু, স্বামীসেবাই নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

ছোটবেলায় বৈশাখ মাসে তুলসী বেদীমূলে ভারতী ও তাহার দিদি যখন মাটির শিব গড়িয়া পূজা করিত, ঠাকুমা ঠাট্টা করিয়া বলিত,—ওলো, 'বর' চেয়ে নে শিবের কাছে; 'তোমার মত যেন বর হয় ঠাকুর।'

দিদি হাসিয়া বলিত, ও বরে কাজ নেই ঠাকুমা, না দেবে শাড়ি গহনা, না বল্‌বে দু'টো প্রেমের গল্প, না শুনবে দু'টো সুখ-দুঃখের কথা; ভোঁম্‌ হ'য়ে বসে শুধু সিদ্ধিই ঘুঁটবে।

স্বামী—সে হবে বন্ধু, তার কাছে আবার নাকি কিছু বল্‌তে হয়? তাকে ধরেই মেয়েমানুষের যখন চলতে হয়, সে হ'বে ছায়া; দুঃখের সমভাগী।

ওমা, অবাক্ কাণ্ড! তুই কি বল্‌তে চাস্ না শিব তা হ'লে সতীর ব্যথা বুঝতো না?

দিদি উত্তর দিয়াছিল, দুঃখ বুঝে আর হ'ল কি? বেচারীকে শেষ পর্য্যন্ত জীবনটাই দিতে হ'ল।

ঠাকুমা বলেছিলেন, কালে কালে হ'ল কি? আমরা এক গলা ঘোম্‌টা দিয়ে স্বামীর সেবাই করে গেছি—কই পিত্তোশ তো কিছু করিনি। জান্‌তামও না ছাই এত কথা।

পুরান দিনের এই সব কত কি এলোমেলো স্মৃতি ভারতীর মনে দোলা দিয়া গেল। তাহ'লে তাহাকেও কি ওইভাবে জীবন কাটাইতে হইবে? ঠাকুমার হয়তো কিছু আশা ছিল না, কিন্তু ভারতীর যে অনেক

আকাঙ্ক্ষা। ভারতী মনকে কি করিয়া সংযত করিয়া স্বামী সেবা করিয়া যাইবে!

শ্যামলাল যাইবার সময় ভারতী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—আবার কবে আসবে?

শ্যামলাল উত্তর দিযাছিল, আসতে তো রোজই ইচ্ছে করে, তোমায় ছেড়ে থাকতেও কষ্ট হয়, সবই বুঝি; কিন্তু এলেই অনেকগুলো পয়সা বেরিয়ে যায় কিনা—অথচ বেশীদিন থাকবারও উপায় নেই।

ভারতী আর কিছু বলে নাই, কিই বা বলিবে। এ কথার উত্তর দিতে ভারতীর প্রবৃত্তি হয় নাই। বরং ভারতীর দুঃখই হইয়াছিল মানুষটির প্রতি। যৌবনের সব আশা, আকাঙ্ক্ষা বাদ দিয়া যাহাকে নীরস জীবন-ভার বহিয়া মরিতে হয় তাহার দুর্ভাগ্য দেখিয়া। ও যদি পয়সা লইয়া সুখী হয় হোক। ভারতী আর বাধা হইয়া শ্যামলালের পথে দাঁড়াইবে না।

ভারতী প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে পয়সাকে কখনো বড় করিয়া দেখিবে না। যে পয়সা তাহার জীবনে কুগ্রহ হইয়া তাহার সকল সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে—ভারতীর কাছে সে শুধু অভিশাপ, আর কিছুই না।

শুধু পয়সার সদ্ব্যবহার যতটুকু না করিলে নয় ভারতী মাত্র সেইটুকুই গ্রহণ করিবে। প্রয়োজন অনুসারে সামান্য অন্নবস্ত্র জুটিয়া গেলেই ভারতীর পক্ষে যথেষ্ট।

স্বামীকে সে কোন অভিযোগ করিবে না, এমন কি আসিতেও আর বলিবে না। শ্যামলাল কি তাহাকে উপেক্ষা করে? উপেক্ষা না করিলেও ভয় করে, খরচের ভয় আছে ভারতীর সঙ্গে মিশলে।

* * * *

ভারতী বসিয়া মাকে চিঠি লিখিতেছিল।

ঘরের জানালা দিয়া শীতের মিষ্টি রোদ কেমন আল্‌গোছে মৃত্তিকার লুটাইয়া আছে। উঠানের চারা কদম গাছের উপর একটা দোয়েল শিস্ দিতেছিল।

ভারতীর মনটা কেমন আনমনা হইয়া গেল, লেখায় আর মন বসিল না। প্যাড্‌টা একপাশে সরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে মাটির বুকে নখ দিয়া খুঁটিতে লাগিল। হঠাৎ দুয়ারের নিকট পায়ের শব্দে সচকিত হইয়া উঠিল। চোখ ফিরাইতেই নজর পড়িল—রমা ও রমার স্বামী অনুপমকে। কাপড় আল্‌গোছে মাথায় টানিয়া ভারতী অভ্যর্থনা করিল, 'আসুন অনুপমবাবু।'

রমা বলিল, জানিস্ ভারতী ও আস্‌তে চাচ্ছিল না। বলে, লজ্জা করে। আমি জোর করে' ধরে' আন্‌লাম।

ভারতী বলিল, তুই বড্ড দুষ্টু রমা; সব জায়গাতেই তোর দুষ্টুমি। উনি তো কতবার এসেছেন। নতুন তো নয় যে লজ্জা হবে, তোর কেবল বাড়িয়ে বলা।

বলুন তো বউদি সত্যি কথা। ওই বরং আমায় আন্‌তে চায় না। ও বলে, আপনি শুধু ওরই বউদি।

কৃত্রিম গম্ভীর সুরে রমা বলিল, আমি ওকথা মোটেই বলি না, ভারতী তা জানে। আমার শুধু 'ভারতী', বউদি তোমাদের। তুমি আস্‌তে চাও না, আমি জোর করি না। যার জন্যে এসেছ, কই ভারতীকে তা' বলো?

অনুপম বলিল, তুমিই বলো না।

রমা বলিল, আমার দায় পড়েছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভারতী, রমা ও অনুপমের মুখপানে চাহিল। দেখিতে পাইল, রমার চোখে মুখে কৌতুকের ছাপ, আর অনুপম বেচারা লজ্জায় লাল হইয়া গিয়াছে।

ছ'জনকে দেখিয়া ভারতী না হাসিয়া পারিল না। অনুপমের অবস্থা বুঝিয়া রমাকে বলিল, রমা তুই বল কি ব্যাপার ?

রমা বলিল, কেন ? ওর বলে লজ্জা নেই, আমি বাড়িয়ে বলি, তুই পর্য্যন্ত ওর হয়ে সাক্ষী দিলি, এখন আবার আমি কেন ?

অনুপম ধীরকণ্ঠে বলিল, না, লজ্জা কিছুই না। কাল রমার জন্মদিন। কাল সকালবেলাই আপনার যাওয়া চাই বউদি। আপনি গেলে আমি আর রমা খুব খুশি হবো।

আর আমি বলছি বউদি, কালকে আপনি যাবেন আমার তরফ থেকে। কাল কিন্তু আপনি রমার পক্ষে থাক্‌তে পার্‌বেন না। ও কি রকম আমায় লজ্জায় ফেলে আপনি জানেন তো। হয়তো কাল আমাকে ও জব্দ ক'রবার তালেই থাকবে। ওর উৎসাহ, আনন্দ আমাকে ঠকাতে পারলেই। আমি তো আনাড়ী মানুষ, আমার কোন জ্ঞান নেই। আর আপনিই আমাকে বলে দেবেন আমার কি করা কর্ত্তব্য ; পরামর্শ কিন্তু আপনারি চাই। রমা বলছিল—আমি না এলে আপনি যাবেন না। আমি বল্‌লাম, আমার বলা বউদিকে বাহুল্য। তোমার জন্ম-উৎসব, বউদি কখনো না এসে থাক্‌তে পারেন !

আপনি ঠিকই বলেছেন অনুপমবাবু। রমার জন্মদিন কাল, আমি যাব ঠিকই। তবে আপনি মাকে একবার বলুন।

নিশ্চয় বলবো, আমি নিজে জ্যেঠিমাকে বল্‌বো। উনি ঘরে নেই দেখে এলাম।

কালকের প্রোগ্রাম আমার বিশেষ কিছু নেই বউদি, আমার প্রোগ্রাম পরশু দিন। আমি মনে করছি দু'খানা নৌকা করে' আমাদের বাড়ীর সকলে মিলে এবং মা, জ্যেঠাইমা পর্য্যন্ত গঙ্গার উপর 'পিক্‌নিক্' করবো। কেমন বউদি এ যুক্তি মন্দ কি ?

ভারতী উৎফুল্ল হইয়া বলিল, বাঃ, ভারি চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন তো ; আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা করেছেন আপনি, আবার আমায় জিজ্ঞাসা করছেন সাহায্য করতে।

অনুপম বলিল, আমার বন্ধু বিনোদ আজ বিকালের ট্রেনে আসবে। ফুলের দু'সেট গহনা সেই নিয়ে আসবে, সাজিয়ে দেবেন আপনি। জন্মের শুভক্ষণ যেখানে জন্মতিথি, তখন আমার মনে হয় সেদিন শুধু ফুলই ভাল। ফুলের মত নির্ম্মল পবিত্র জিনিস দুনিয়ায় আর কি আছে বলুন।

রমা বলিল, কই তুমি তো আমায় বলোনি বিনোদবাবু আসবেন ?

অনুপম সপ্রেম দৃষ্টিতে রমার পানে চাহিল। বলিল, না বলিনি। যে দুষ্টু তুমি, বললে শুধু ঠাট্টাই করতে।

রমা জিজ্ঞাসা করিল, ভারতী, জ্যেঠিমা কোথায় রে ?

ভারতী বলিল, বিন্দু পিসিমার কাছে মহাভারত শুন্‌তে গিয়েছেন, এই এলেন বলে।

রমা যেন অন্য কথা ফেলিতে চায় ভারতীর কাছে। অনুপমকে ইচ্ছা করিয়াই আনে না।

সরল প্রেমিক স্বামী তাহার, রমা ছাড়া তাহার জীবনে আর কিছুই নাই। সারা অন্তর বাহির—রমা। রমার কথা বলিতে সে হইয়া উঠে শতমুখ। রমাকে সাজাইতে বাজে পয়সা কত যে নষ্ট করে। রমা কিছু বলিতে গেলে রমার মুখে হাত চাপা দেয়।

প্রতি মাসের প্রথম তারিখে অনুপম নিউ মার্কেট হইতে খুব দামী একটা একটা ফুলের তোড়া রমাকে প্রেজেন্ট করে। তারায় ভরা আকাশ—খোলা বাতায়ন দিয়া দেখা যায়। নিস্তব্ধ রাতে ফুলের তোড়া সামনে রাখিয়া এক শিশি গোলাপ জল রমার মাথায় ঢালিয়া দেয়। তারপর গভীর প্রেমে দুইজনে হইয়া উঠে মুখর। কোথা দিয়া যে রাত্রি কাটিয়া যায় জানিতেও পারে না।

কোনদিন রমা ভারতীর কাছে এই সব কথা বলে নাই। ব্যথায় রমা যেন মুষড়িয়া পড়ে ভারতীর দুঃখে।

জানিস্ ভারতী তোদের বাড়ীর ওই 'বুড়ি' আমগাছটাকে দেখলেই ছোটবেলার লুকোচুরি খেলার কথা মনে পড়ে। খেল্‌বি ভাই ভারতী?

কি জানি এত আনন্দের মধ্যেও ভারতী যেন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। অতি প্রিয় রমার কাছেও সে শুধু মৌখিক কথা বজায় রাখিয়া চলিতেছে। মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। জোর করিয়া মুখের উপর এক ঝিলিক হাসি আনিয়া রমার পিঠের উপর মৃদু আঘাত করিয়া ভারতী বলিল—বড্ড ছেলেমানুষ হচ্ছিস্ তুই রমা।

রমা বলিল, তা হয়তো হবো।

ভারতী চোখ ফিরাইয়া অনুপমকে কি বলিতে গেল। লক্ষ্য করিল অনুপম একাগ্র দৃষ্টিতে রমার পানে চাহিয়া আছে। ভারতীর সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই অনুপম লজ্জিত হইল।

রমাকে বলিল, আজকের মত থাক্। বরং বউদিকে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেওয়া যাক্, সামনের সপ্তাহে একদিন আমরা লুকোচুরি খেল্‌বো। বিনোদের আসবার সময় হ'য়ে এল, এখন আমাকে ষ্টেশনে যেতে হবে।

তুমি যাবার সময় বউদিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেও, আমি সন্ধ্যাবেলা এসে জ্যোঠিমার সঙ্গে দেখা করবো।

দুর্গাবতী কোন আপত্তিই করেন নাই, বরং সন্তুষ্ট হইয়া রমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর নিজে যাইয়া ভারতীকে আনিবেন, তাহাও জানাইয়া দিলেন।

খুব সমারোহের সহিত রমার জন্মদিনের উৎসব সমাধা হইল। ভারতী রমাকে খুব মনোমত করিয়া সাজাইল।

বিনোদ দু'সেট ফুলের গহনা আনিয়াছিল। টুকটুকে একখানি লাল শাড়ি, নকল হীরা বসানো বড় লকেটের একটি হারও প্রেজেন্ট করিয়াছিল বিনোদ।

জয়া দেবী চুড় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বাহিরের জানালা দিয়া মুক্ত আকাশ পানে ভারতী চাহিয়াছিল। হয়তো বা কোনদিন ভারতীর অন্তর এমনি একটি আশাকে কেন্দ্র করিয়া কত সুখের সৌধই না রচনা করিত। কল্পনা শুধু কল্পনাতেই রহিয়া গেল। একটু হাসি ভারতীর মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল, ত্বরিতে মনে পড়িয়া গেল শ্যামলালকে। তাহার স্বামী যদি দেখিত এই সব কাণ্ড, তাহা হইলে বলিত, নিছক্ কতকগুলি পয়সা ফুলের পেছনে খরচ, শুধু অকারণ অপব্যয়। কেহ বা মালা গাঁথে আশা লয়ে, আর কেহ বা সাংসারিক চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। ভারতীর বড় ভাল লাগে—এই দম্পতিকে দেখিয়া। এরা যেন সর্ব্বসুখী হয়।

অনুপমের বন্ধু বিনোদ ভদ্রলোকটি সত্যই ভাল; মুহূর্তের দেখায় সে যেন ভারতীর কত পরিচিত। সংকোচ নাই, দ্বিধা নাই—ভারতীদি বলিয়া যেন নিজের দাবি করিয়া লইল।

রমার কি আগ্রহ কি ব্যস্ততা, ভারতী যদি একটু আনন্দে থাকে। দরদী বন্ধুর অন্তস্থলে যে ক্ষত আছে, তাহা তো রমার অজানা নাই। ভারতী কোহিনুর, তাহার সন্ধান শ্যামলাল কোনদিন পাইল না।

—ভারতী!

—কে রে রমা, আয়।

কি করছিস্ ভাই এখানে একাটি বসে? আমি ওদিকে তোকে খুঁজে মরছি—বলিয়া অভিমানভরে রমা বলিল, কই—তুই তো আমায় আশীর্ব্বাদ করলি না ভারতী? তোর আশীর্ব্বাদ যে প্রয়োজন আমার সবার আগে।

ভারতী সস্নেহে রমাকে বাহু-বেষ্টনে জড়াইয়া বলিল—আমার আশীর্ব্বাদ লোকের সামনে তো নয় ভাই......অন্তরে অন্তরে। আমি যে তোর মধ্যেই পূর্ণ হয়ে আছি, তোর মধ্যেই যে আমার আকাঙ্ক্ষার যত তৃপ্তি তাকি তুই জানিস্ না রমা?

অনুপমবাবু কোথায় রমা?

রমা বলিল, ওই তো তোমায় খুঁজছিল, শত মুখে তোমার প্রশংসা। আমার ভয় হচ্ছে শেষকালে আবার আমায় ভুলে না যায় তো ভাল।

দূর পোড়ারমুখী, বউদি বলে ডাকে—সে আমার ছোট ভাই; তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই।

দুইদিন বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। নৌকা করিয়া যখন গঙ্গার উপর তাহারা বেড়াইতেছিল, ভারতী অবাক্ হইয়া গঙ্গার সেই ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। কে বলিবে দুই মাস পূর্ব্বে প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি এই গঙ্গাই ধারণ করিয়াছিল। দুই দিকে পাড়ের ধ্বংসাবশেষের কি অপূর্ব্ব ভাঙ্গা-গড়া খেলা! শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ খানিকটা বোধ হয় ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়াছিল। জলের সঙ্গে আকাশ যেন একত্র হইয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে। যৌবনের উন্মাদনায় কিছুদিন পূর্ব্বেও যে গঙ্গা প্লাবনে দুকূল ছাপাইয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল, পাড়ের উপর কতকগুলি বাটীর ভগ্নস্তূপ তাহার সেই উন্মত্ত খেলার সাক্ষী হইয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে।

আজও যেন প্রেমের সেই পরিপূর্ণতা কিছু সারা অঙ্গে মাখিয়া টলমল করিতেছে। চাঁদের আলো পাইয়া দুষ্টু মেয়ে হাসিতে হাসিতে নাচিয়া চলিয়াছে কোন এক অসীমের পানে।

হারমোনিয়াম ছিল নৌকাতে, বিনোদ ভাল গাহিতে পারে ; সেই জন্যেই বিশেষ করিয়া আনা। বিনোদের কি চমৎকার গলা, কি মিষ্টি সুর।

গানের দু'কলি ভারতীর বড় ভাল লাগিতেছিল. তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল···

"বনের পাখীরে বাঁধিয়া রেখনা আর,
যদি প্রাণের পরশ নাহি দিতে পার
খুলে দিও তব দ্বার।
এর চেয়ে ভাল অসীম আকাশ,
বিদায় নিলেম তাই।"

রমা এবং অন্যান্য সকলের অনুরোধ, ভারতীকে একখানা গান গাহিবার জন্য ;

দুর্গাবতী বলিলেন, তা' গাওনা বাছা, সকলেই যেখানে বলছেন। লজ্জা কি? আজকাল সব বউঝিই গান গায়।

ভারতী আর 'না' করিতে পারিল না।

"ঝরা চামেলী বনে
কেন আসিলে তুমি,
বুঝি মোরে পড়িল মনে
ওগো, বিদায় ক্ষণে।"

নৌকাসুদ্ধ লোক মুগ্ধ হইয়া গেল। ভারতী যে এমন দরদী কণ্ঠে গান গাহিতে পারে এ ধারণা কাহারও ছিল না।

বিনোদের নিজের উপর ধারণা ছিল খুব ভাল, কিন্তু সেও মনে মনে লজ্জিত না হইয়া পারিল না।

গ্রামেরই বুড়ো মাঝি, সেও স্বভাবসুলভ গদগদ কণ্ঠে প্রকাশ করিল, —মা সাক্ষিৎ ভগবতী, নইলে এমন গান যে সে নোকের মুখ দিয়ে বার হয় না। দুর্গাবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মাঠান্, বউ বটে তোমার—উপে গুণে জোড়া মিলবে না।

শুধু গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রমা চোখ ফিরাইল জলের দিকে। বিধাতার কি উদ্দেশ্য ছিল অনাদৃত কুসুমের এত সৌরভে? যাহার প্রয়োজন শুধু গৃহকোণে, অনাদরে অবহেলায় হয়তো অকালেই একদিন ঝরিয়া পড়িবে মাটির বুকে—তাহার কি প্রয়োজন জীবনের এত আয়োজনে?

সেদিন অনেক রাতে যখন ভারতী বাড়ী আসিল, ঘরে ঢুকিতেই নজর পড়িল, খোলা জানালা দিয়া পিওন একখানা খামে লেখা চিঠি

ফেলিয়া গিয়াছে। ভারতী সাগ্রহে তুলিয়া লইল, আশা করিয়াছিল মায়ের চিঠি। খামখানি উল্টাইতে লক্ষ্য পড়িল ডাকঘরের ছাপ ; অবাক্ না হইয়া পারিল না,—শ্যামলালের চিঠি !

পড়িতে পড়িতে ভারতী অন্যমনস্ক হইয়া গেল। শ্যামলাল চারি পৃষ্ঠা ভরিয়া চিঠি লিখিয়াছে—অনেক কিছু।—ভারতীর জন্য মন খুব খারাপ করে এবং তাহাকেই ধ্যান করিয়া দিন গুজরান করে—ইত্যাদি। মাহিনা পাইলে নিশ্চয় বাড়ী আসিবে। পরে লিখিয়াছে—এখানে একটি ছোকরা থাকে, নাম ভণ্টু। তোমার কবিতা পড়িয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছে। যদি সে সুবিধা করিতে পারে আমার সঙ্গে যাইবে, তোমার সহিত আলাপ করিতে।

ভারতী চিঠিখানি সমাপ্ত করিল না, শুধু শুধু মিথ্যার অভিনয় ভাল লাগে না। ভারতীর হয়ত কাঙ্গালপনা আছে বলিয়াই শ্যামলাল নিঃশব্দে ফাঁকি দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

* * * *

ভণ্টু আসিয়া শ্যামলালকে জিজ্ঞাসা করিল, কি করি বলতো শ্যামদা, চাকরিটার ?

শ্যামলালকে কে যেন ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল ভণ্টুর পানে।

ভণ্টু হাসি চাপিয়া প্রশ্ন করিল, অমন করে তাকিয়ে কি দেখছো ? বল, কি করবো ?

শ্যামলাল উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিল, কি বলি বল, তোমরা বাপু অবাক্ ক'রলে।

ভন্টু বলিল, কেন? অবাকের কি দেখ্‌লে?

শ্যামলাল জবাব দিল, জলজ্যান্ত গোটা মানুষের হঠাৎ যদি মতিচ্ছন্ন হয়, তা' হ'লে অবাক্ না হয়ে' উপায় কি বল।

ভন্টু হাসিয়া বলিল, জ্যান্ত মানুষেরি তো মতিচ্ছন্ন হয়, তা' অবাক্ হচ্ছ কেন?

তোমাদের সঙ্গে মাইরি তর্কে পারবোনা, তোমরা হ'লে যা'কে বলে সর্ব্বত্যাগী বিবেকানন্দ।

প্রণাম হই শ্যামদা, সকাল বেলায় বেশ কথা বল্‌লে, শুনেও খুব খুশি হ'লাম। সাষ্টাঙ্গে ভন্টু শ্যামলালের পা স্পর্শ করিল।

শ্যামলাল বাধা দিয়া বলিল, যা—কি করিস্।

ভন্টু হাসিয়া উত্তর দিল, তুমি যেখানে দাদা হও সেখানে একটু পায়ের ধূলো নেওয়া অন্যায় হয় না। তা' ছাড়া চাকরিটার কি করবো বল?

শ্যামলাল গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, সে তোমার ইচ্ছা। তবে আমি বাপু আর টাকা ধার দিতে পারবো না। বরং এমাসে আমার কিছু দিতে হবে। কারণ, এমাসে আমাকে 'প্রিমিয়াম' দিতে হবে অনেক।

ভন্টু মনে মনে হাসিতেছিল, সংযত হইয়া উত্তর দিল, তা' হ'লে কি বলছ চাকরিটা নেবো?

শ্যামলাল বলিল বা রে, তা' আমি কি করে বলবো? তোমার যদি চাকরি না করলে চলে তবে মিছেমিছি কেন কষ্ট ক'রবে—আর দরকারই বা কি?

পরিহাস ত্যাগ করিয়া ভন্টু সহজ স্বরে বলিল, তুমিতো জানো শ্যামদা আমার অবস্থা, তবে কেন ওকথা বলছ? আমি শুধু

জিজ্ঞাসা করছি, পরামর্শ দাও কি করা উচিত। মেয়েটার কথা শুনলে তো ?

মোলায়েম সুরে শ্যামলাল বলিল, আহা, ওসব কথায় তোর দরকার কি ? তুই যাচ্ছিস্ চাকরি করতে, তোকে মনোনীত করেছে। তোর নিজের কাজ ক'রে যাবি, ব্যাস্ ফুরিয়ে গেল। এই দেখ, চাকরি চাকরিই, তা' সে যে চাকরিই হো'ক না কেন, বিদেশ বিদেশই, পর পরই, সর্ব্বদা একথা মনে রাখ্‌বি। পরের কথায় কি দরকার বল্ ? নিজের কাজ গোছানই হ'ল বড় কাজ। বড় লোকদের অমন ঘরোয়া ঝঞ্ঝাট অনেক থাকে। ও হ'ল বড় লোকদের বড়লোকি খেয়াল।

শেষ পর্য্যন্ত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভণ্টু চাকরি লওয়াই স্থির করিল। শ্যামলাল ঠিকই বলিয়াছে, যেখানে পয়সার প্রয়োজন বড় সেখানে তুচ্ছ চিন্তার ভান করিয়া লাভ কি ?

নির্দ্দিষ্ট দিনে ভণ্টু শ্যামবাজারে চাকরিতে বাহাল হইল। অরূপ সহাস্যে ভণ্টুকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে লইয়া গেল। এই ঘরখানি তাহার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাকে জানাইয়া দিল।

'বেল' টিপিতেই একটি নেপালি ছোকরা আসিয়া দাঁড়াইল। অরূপ নেপালি ছোকরাটিকে বুঝাইয়া দিল—এই মাষ্টার বাবু, এঁর কাজ তোমায় করতে হবে।

ভণ্টুকেও বুঝাইয়া দিল—এই আপনার 'বয়'। আপনার পাশের ঘরেই থাকবে, যখনি দরকার 'বেল' টিপ্‌বেন। আপনার অসুবিধা যা' হবে তক্ষুণি আপনি এই বাহাদুর মারফৎ আমাকে জানাবেন।

আর বাহাদুর, তুমি লক্ষ্য রাখ্‌বে মাষ্টার বাবুর য'াতে কোন অসুবিধা না হয়।

আজ আপনি সম্পূর্ণ বিশ্রাম করুন, কাল সকালে আপনার কাছে আমি আসবো বই নিয়ে।

বাহাদুর, তুমি মাষ্টার বাবুকে বাথ-রুম দেখিয়ে দেবে। তারপর চা আন্‌তে বল। পুনরায় ভণ্টুর দিকে ফিরিয়া অরূপ বলিল, অসুবিধা হ'লে কিন্তু জানাতে কিছুমাত্র সংকোচ ক'রবেন না। মা বলে দিয়েছেন বিশেষ করে আপনার যা'তে কোন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখ্‌তে।

মহীয়সী মহিলাটিকে স্মরণ করিয়া ভণ্টু পুনরায় শ্রদ্ধায় মাথা নত করিয়া অরূপকে বলিল, তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।

অরূপ চলিয়া গেলে ভণ্টু বিস্ময়ে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। সম্মুখে তাহার সৌভাগ্য আসিতেছে, না কোন ছলনায় প্রলোভিত করিয়া দুর্ভাগ্য আসিয়া বাধা স্বরূপ জীবন পথে দেখা দিল। এক ঘণ্টা পূর্ব্বেও তাহার সম্বল ছিল একটা মাদুর, ছিন্ন তোশক ও জীর্ণ বালিশ। কোথায় বহু পুরানো ফাটল্ ধরা শ্রীহীন মেসের একটি খুপরি ঘরের মধ্যে একটি 'সিট্'—আর এক ঘণ্টা পরে দাঁড়াইয়া সে রাজ-বাড়ীর সুসজ্জিত একটি বিশাল কক্ষে। কক্ষটি তাহারি জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে আবার তাহারি জন্য নেপালি 'বয়' ও নিযুক্ত।

ভাল ঘর দেখিবার সৌভাগ্য ভণ্টুর কোনদিনও হয় নাই। কুঁড়ে ঘরে তাহার জন্ম। চারিদিক ভাল করিয়া ভণ্টু দেখিয়া লইল। এক পাশে চক্‌চকে পালিশের একখানি ছোট খাট, তার উপর নিভাঁজ ধব্‌ধবে বিছানা দেখিয়া ভণ্টু আর লোভ সামলাইতে পারিল না। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই বিছানা! আস্তে আস্তে দেহ এলাইয়া দিয়া তৃপ্তিতে চোখ বন্ধ করিল। সুখের আতিশয্যে কি জানি আবার কোন বিভ্রাট চুপিসারে না আসিয়া দেখা দেয়।

চিন্তাসূত্রে বাধা পড়িল। বাহাদুর ডাক দিল; বাবুজি উঠিয়ে।

দু'হাত দিয়া আলগোছে চোখ মুছিয়া ভণ্টু উঠিয়া বসিল। চোখ ফিরাইতে ভণ্টুর লক্ষ্য পড়িল, ছোট মার্ব্বেল-মোড়া টেবিলের উপর তাহার আহার্য ও ছোট কেত্‌লিতে চা প্রস্তুত। ট্রের এক পাশে ধব্‌ধবে একখানি তোয়ালে রহিয়াছে।

তাহারি ঘর-সংলগ্ন বাথরুম বাহাদুর দেখাইয়া দিল।

গোলগাল বাহাদুর, রং যেন আপেলের মত; নতুন খাকী প্যাণ্ট ও হাফ-সার্ট পরনে। চক্‌চকে চওড়া তবক দেওয়া বেল্ট প্যাণ্টের উপর আঁটা। বয়স আঠারো কি কুড়ি হইবে। বেশ ছেলেটি—কেমন শান্ত ভাব।

ভণ্টু একটু হাসিয়া বলিল, বাহাদুর তোমার তো সবি ভাল, কিন্তু বাবা ওই হিন্দী বাত তো বলতে বা বুঝতে পারবো না। বাঙলা দেশে এসেছ বাঙলা জানো না?

সব দেশের একটা নিয়ম আছে, কিন্তু যত অনাসৃষ্টি এই বাঙলা দেশের লোকের। বিলেত যাও, তাদের ভাষা বলতে হবে। পশ্চিমে যাও, সেখানেও তাদের ভাষা বলতে হবে। তাদেরও সম্মান জ্ঞান আছে। আর আমাদের মরণ, নিজের দেশে বসে পরের ভাষা বলতে হবে।

জানো বাহাদুর, আমি তোমায় বাঙলা শিখিয়ে দেবো। আমি তোমার ওই হিলিবিলির মধ্যে যেতে রাজী নই। বুঝেছ বাহাদুর?

ভণ্টুর ডাকে বাহাদুর সাড়া দিল, 'জী'।

ভণ্টু বলিল, বাঙলা শিখবে তো?

বাহাদুর বেশ সহজ বাঙলায় জবাব দিল, বেশ বাবুজী।

ভণ্টু তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, যাক্ তবু একজন সঙ্গী জুটিল।

বিকালে ভণ্টুকে পথ দেখাইয়া বাহাদুর চলিল বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে। খোলা জায়গা দিয়া খানিকটা গিয়া ভণ্টু দেখিতে পাইল ছোট্ট একটি পুকুর—কলিকাতার বুকে সহজে যাহা নজরে পড়ে না। পুকুরের এক কোণে ছোট্ট একখানি নৌকা রহিয়াছে।

বাহাদুর পুকুরের কাছে দাঁড়াইয়া শিস্ দিতে লাগিল ও পকেট হইতে ছোলা বাহির করিয়া জলের নিকটে একটু অপেক্ষা করিল।

ভণ্টু অবাক হইয়া গেল, বড় বড় মাছ—আঁশগুলো লাল হইয়া গিয়াছে—হেলিতে দুলিতে আসিয়া পরম নিশ্চিন্তে রাণায় বসিয়া আহার সমাপন করিয়া জলের তলায় চলিয়া গেল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ভণ্টু চাহিয়া রহিল জলের পানে। মানুষ যে এত হিংস্র, সেই মানুষের কাছেই একান্ত বিশ্বাসের সহিত তাহারা ছুটিয়া আসে,—কিছুমাত্র দ্বিধা নাই, ভয় নাই।

ভণ্টু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাহাদুরের পানে চাহিল। বাহাদুরও বুঝিতে পারিয়াছিল তাহার মনোভাব। তাই বলিল, দিদিসাহেবা এই মাছগুলিকে খুব যত্ন করেন। উনি রোজ সকালে আর বিকালে নিজে এসে মাছগুলিকে খাওয়ান। এখনতো মাত্র তিনটে মাছ দেখলেন, ওমনি পঁচিশটে মাছ আছে।

ভণ্টু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যাক্ শুক্লাদেবীও তাহ'লে ভাল কাজ করিতে জানে।

সকালবেলা ভণ্টু গা হাত ধুইয়া বেশ পরিষ্কার খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়া অরূপের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

খানিক পরেই অরূপ ও বছর দশ কি বারো হইবে একটি মেয়েকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। মেয়েটি কি সুন্দর দেখিতে—ভণ্টু মুগ্ধ নেত্রে দেখিতে লাগিল। থোকা থোকা ফাঁপানো চুল 'বব' করিয়া ছাঁটা, একটি টুকটুকে লাল চওড়া ফিতার ফাঁস—দূর হইতে যেন মনে হয় আগুনের ফুল। গায়ে ধবধবে সাদা অর্গাণ্ডির ফাঁপানো কুঁচি দেওয়া ফ্রক্। গহনার বালাই নাই, শুধু গলায় একটা সরু চেনে বাঁধা লকেটের দামী হীরাখানি জ্যোতিতে রাজার কন্যার পরিচয় দিতেছে।

অরূপেরও সাধারণ বেশ, মিহি খদ্দরের সার্ট ও তাঁতের ধুতি পরনে। অরূপের কি দীর্ঘ ললাট—মুখের ভাব কমনীয়তায় পরিপূর্ণ। ভণ্টু যেন অবাক হইয়া দেখে।

অভিবাদনের পর অরূপ মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ঊর্ম্মি, ইনি তোমার ও আমার মাষ্টার মশাই। এঁর কাছেই আমাদের পড়তে হবে। তুমি এঁকে প্রণাম কর।

ঊর্ম্মি হাত তুলিয়া নমস্কার করিতেই বাধা দিল অরূপ, বলিল—পায়ে হাত দিয়ে মাষ্টার মশাইকে প্রণাম করতে হয় ঊর্ম্মি।

জানেন মাষ্টার মশাই, এই হ'ল আমার ছোট বোন ঊর্ম্মি। ভারি দুষ্টু, ওর নাকি পড়তে একটুও ভাল লাগে না, শুধু খেলা করতে ভাল লাগে।

ভণ্টু হাসিয়া বলিল, তাই নাকি খুকুমণি?

ঊর্ম্মি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল,—হাঁ, আমার পড়তে একটুও ভাল লাগে না। গম্ভীর হইয়া বলিল, আমার নাম খুকু নয়, শুধু ঊর্ম্মি। খুকু হচ্ছে পিসিমণির ছোট মেয়ে বেবীর নাম।

বলার ভঙ্গী দেখিয়া ভণ্টু ও অরূপ হাসিয়া ফেলিল। বাহাদুরও হাসিতেছিল।

ভণ্টু হাসি চাপিয়া বলিল, কিন্তু তোমায় যে পড়তে হবে।

উর্ম্মি উত্তর দিল, তা' হ'লে বেশীক্ষণ পড়তে পারবো না—দুপুরে স্কুল যেতে হবে, রাতের বেলা মেম দিদিমণি পড়াতে আসেন। আবার গান শিখতে হবে দু'দিন কি তিনদিন সপ্তাহে! তা' হ'লে আমার খেলার সময় একটুও থাকে না যে।

দাদাভাই, আমার খেলার জন্যে বরং তুমি মাষ্টার মশাইকে বলে দাও —যেন ছুটি দেন।

অরূপ বলিল, উর্ম্মিকে সকালে পড়াবেন। আর আমি পড়বো সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত। আপনার অসুবিধা হবে না তো?

বাধা দিয়া ভণ্টু বলিল, অসুবিধা কি? তোমার যখন সুবিধা হবে।

অরূপ বলিল, আপনি উর্ম্মিকে শুধু বাঙলা পড়াবেন, বাঙলা পড়া ওর মোটেই হয় না। ও লরেটায় পড়ে, সেখানে বাঙলা কমই পড়ানো হয়। মা বড্ড ভয় পাচ্ছেন, শেষকালে কি ও বাঙলা ভুলে যাবে—বাঙালীর মেয়ে হ'য়ে।

ভণ্টু নীরবে শুনিয়া গেল। তারপর বলিল—তোমারও বোধ হয় খুব ভাল লাগে, না—বিলাতী কায়দা?

অরূপ হাসিয়া উত্তর দিল, আমি কতটুকু বুঝি বলুন? তবে আমার ধারণা এই যে, আমরা যেখানে বাঙালী সেখানে আমাদের চালচলন দেশী হওয়াই প্রয়োজন। অপরের কৃত্রিমতাকে লক্ষ্য ক'রে চলা আমাদের কি দরকার? নিজেদের সৎসাহস নেই বলেই আমাদের পরাধীনতা স্বীকার ক'রতে হচ্ছে।

যে দেশ আমাদের সুখ-সুবিধা সবটুকু হরণ ক'রে নিয়ে নিরন্তর আমাদের উপেক্ষা করেই চলেছে, তার অধিবাসীদের অনুকরণ করার

মানেই হচ্ছে এই—যে আমাদের আত্মমর্য্যাদার সমস্তটাই নিঃশেষে বিক্রি ক'রে দেওয়া।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর অরূপ আবার বলিল, সুভাষ-চন্দ্র বসু দেশের জন্য কি অপরিমেয় ত্যাগ স্বীকার করলেন। অত বড় ত্যাগের কথা ইতিহাসে বোধ হয় দু'টি নেই। নিজের জীবন বিপন্ন করে' কি দরকার ছিল বিপৎসংকুল পথকে বরণ করা। শুধু আমাদের ভারতবর্ষের বন্ধন মুক্ত করার জন্যেই তো? আর আমরা যদি তাঁর সম্মানার্থে বিলাতী-বর্জ্জনটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করতে না পারি, তা' হ'লে সে অন্যায়ের কি শেষ আছে; আপনিই বলুন?

অপলক নেত্রে স্থির হইয়া ভণ্টু শুনিতেছিল অরূপের কথা। যেন কোন ঋষি বালক স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহারি প্রাণের কথা কয়টি তাহাকে শুনাইয়া পবিত্র করিয়া দিয়া গেল।

ভণ্টু বলিল, আমি খুব খুশি হ'লাম অরূপ, তোমার মনোভাব জেনে। একটা কথা, তোমার কি ইচ্ছা হয় না ইউরোপ ঘুরে' আসতে?

গদগদ কণ্ঠে অরূপ বলিল, খুব হয় মাষ্টার মশাই। আমি যেন রোজ রাতে স্বপ্নও দেখি, এ্যাট্‌লান্টিক সাগরের উপর জাহাজে চড়ে' চলেছি।

আচ্ছা মাষ্টার মশাই, বিদ্যা অর্জ্জন করতে বিদেশে যেতে তো দোষ নেই? বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এসব শিখে এসে আমাদের দেশের যা'তে কল্যাণ হয় সেইদিকে লক্ষ্য দেওয়া কি উচিত নয়? তবে মিছেমিছি হুজুগ করে' অনুকরণের জন্যে যারা যায়, তাদের আমার ভাল লাগে না মোটেই।

ভণ্টু বলিল, তোমার মত ছাত্র পেয়ে সত্যি বল্‌তে কি, আমি গর্ব্ব অনুভব করছি। তোমার অরূপ নাম সার্থক।

উর্ম্মির দিকে চাহিয়া ভণ্টু বলিল, এস উর্ম্মি, দেখি তোমার বুই।

অরূপ আড় নয়নে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইল সেক্রেটারী দাঁড়াইয়া আছে।

বিব্রত হইয়া অরূপ বলিল, আপনি কতক্ষণ এসেছেন? দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

উর্ম্মি বলিল, বা রে, তুমি যে দাঁড়িয়ে আছো!

অরূপ লজ্জিত হইয়া বলিল, এ কিন্তু ভারি অন্যায়। আমি আপনার থেকে কত ছোট।

উর্ম্মি, তুমি মাষ্টার মশাইয়ের কাছে ততক্ষণ পড়—আমি অফিস-রুমে যাচ্ছি। আসুন,—বলিয়া সেক্রেটারীকে ডাকিয়া লইয়া গেল অরূপ।

ভণ্টু সস্নেহে উর্ম্মির রুক্ষ ফাঁপানো সোনালি চুলের মধ্যে হাত দিয়া বলিল, বেশ নাম তোমার,—উর্ম্মি।

উর্ম্মি সপ্রতিভভাবে জবাব দিল, হাঁ আমার নাম তো ভালই, সকলেই তো বলে সে কথা। কেবল দিদি ভাইএর পছন্দ হয় না, এই যা। স্কুলে মেম দিদিমণি আর দিদিভাই আবার 'ডোরা' বলেও ডাকে।

মা ডাকেন 'রাধারাণী' বলে।

ভণ্টু বলিল, বা, তোমার তো ভারি সুন্দর সুন্দর নাম।

গর্ব্বের সহিত উর্ম্মি সায় দিল, হাঁ, আমার অনেক নাম। আপনার বুঝি শুধু একটাই নাম—'মাষ্টার মশাই'?

ভণ্টু হাসিয়া জবাব দিল, আমার একটাই—'মাষ্টার মশাই।'

কই তুমি বই বার কর, উর্ম্মি।

উর্ম্মি বলিল, আপনার বুঝি পড়াতে খুব ভাল লাগে? ইচ্ছার বিরুদ্ধে উর্ম্মি বই ক'খানি খুলিয়া বাহির করিল। একখানি বিবেকানন্দ-চরিত ও অপরখানি গান্ধীজীর জীবনী।

উর্ম্মি বলিল, মা বলে' দিয়েছেন আপনি একটু একটু করে' এই বই দু'খানা আমাকে বুঝিয়ে দেবেন। আমার পড়তে একটুও ভাল লাগে না। মা বলেছেন, এই বই দু'খানাতে নাকি মহাপুরুষদের কথা লেখা আছে। সেইজন্যে আমি পড়বো।

আচ্ছা উর্ম্মি, আমি তোমায় খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবো। জানো উর্ম্মি, তোমাকে আমি রাধারাণী ব'লে ডাকবো, কেমন ?

ভীত হইয়া উর্ম্মি বলিল, না—না তাহ'লে দিদিভাই রাগ করবে। ভীষণ রাগ করবে।

বিস্মিত হইয়া ভণ্টু বলিল, দিদি রাগ ক'রবেন কেন ? অমন সুন্দর নাম—মা যেখানে রেখেছেন। আমার তো খুব ভাল লাগছে।

উর্ম্মি বলিল, আমারও তো ও নামটা খুব ভাল লাগে। ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, কি জানি দিদিভাইয়ের কেন ও নামটা ভাল লাগে না। আমি যে আপনাকে নামটার কথা বলেছি দিদিভাইকে যেন বলে দেবেন না ? দিদিভাই তা' হ'লে বকবে, বলবে—কেন বিশ্রী নামটার কথা সকলকে বলিস্। আপনার সঙ্গে দিদিভাইয়ের ভাব নেই তো ?

ভণ্টু ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না।

উর্ম্মি আশ্বস্ত হইয়া বলিল, বাবা বাঁচলাম।

ভণ্টু মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল, আচ্ছা—তোমাকে আমি রাধারাণী বলবো না। তোমার দিদিকে বুঝি তুমি খুব ভয় কর উর্ম্মি ?

উর্ম্মি মুখটিকে কোঁচকাইয়া বলিল, বা রে শুধু আমি কেন ভয় করবো সকলেই যে ভয় করে। দিদি তো আমাকে বরং ভালইবাসে। আর সকলকে যা বকে !

কাল আমাদের উড়ে বামুনটাকে দিদি খুব বকেছিল—বেচারী ভয়ে

এত মাছের ঝোলসুদ্ধ গামলা একেবারে দিদিভাইয়ের পাতের ওপর উল্‌টে ফেলে দিয়েছিল ; কি মজা, না মাষ্টারমশাই ?

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উর্ম্মি যেন কত পরিচিত করিয়া লইল ভণ্টুর নিকট। ইহাদের কি সুন্দর অমায়িক ভাব, যেন কত আপনার! দুই দিন পূর্ব্বে যে কোন পরিচয় ছিল না, কে বলিবে।

সুখী পরিবার। শুধু মনে পড়িয়া যায় গর্ব্বিতা আত্মমর্য্যাদার সম্মান লইয়া রাজবাড়ীর অহঙ্কার পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়া চলে রাজকুমারী শুক্লাদেবী।

উর্ম্মি বসিয়া গান্ধীজীর ছবিগুলি দেখিতেছিল। হঠাৎ গাড়ির হর্ণ শুনিয়া সচকিত হইয়া উঠিল। কেবল একটু বিব্রতভাবে বলিল, মাষ্টার মশাই আজ আমাকে ছুটি দিন। আমাকে যিনি বেহালা শেখান, সেই মেম দিদিমণি এসেছেন! দেরি হ'লে দিদিভাই খুব বকবে।

কথার অপেক্ষা না করিয়া উর্ম্মি চলিয়া গেল। হঠাৎ আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মাষ্টার মশাই, আপনি যেন রাগ করবেন না। কাল কিন্তু অনেকক্ষণ বসে পড়ব। কেমন, বেশ মাষ্টার মশাই ?

ভণ্টু একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, আজ যাচ্ছ যাও, কিন্তু এটাও তো তোমার পড়বার সময়। এমন একটা সময় করে নেবে যাতে তোমার সকালবেলার পড়ার অসুবিধা না হয়। আজকের মত ছুটি দিলাম, তুমি যাও।

অনুমতি পাইয়া উর্ম্মি প্রজাপতির মত ডানার পালক উড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বেশ মেয়েটি কেমন সহজ সরল, বাহিরের লোকের কাছে কোন সঙ্কুচিত ভাব নাই।

কিছু পরেই অরূপ আসিল। তার সঙ্গে ঘণ্টা দুই পড়ার বিষয়ে আলোচনা করিয়া ভণ্টুর মন তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল।

বাহাদুর আসিয়া যথাসময়ে স্মরণ করাইয়া দিল, বাবুজী উঠুন, আপনার চানের সময় হ'য়ে এল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাহাদুর স্নানের যোগাড় করিয়া এক শিশি তেল ভাঙ্গিয়া ভণ্টুর মাথায় ঘষিতে লাগিল। ভণ্টু বাধা দিবে মনে করিল, ক্লান্তিতে যেন শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; ইচ্ছা করিয়া মানা আর করিল না। দীর্ঘ একটানা দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া একটু পরিশ্রমের সঙ্গেই যেন ক্লান্তি আসিয়া দেখা দিয়াছে।

আহারের বিরাট আয়োজন দেখিয়া ভণ্টু না হাসিয়া পারিল না। তাহার জন্যেও তা হ'লে আয়োজনের প্রয়োজন আছে?

আহার ও একটু বিশ্রাম সমাপ্তে ভণ্টু মাকে চিঠি লিখিতে বসিল। এত যত্নে আছে শুনিলে মা কত খুশি হইবেন।

কাল একবার শ্যামলালের সহিত দেখা করিতে হইবে। লোকটি আর যাহাই হউক, তাহাকে সত্যই অন্তর দিয়া ভালবাসে।

এ বাড়ীর সকলেই ভাল, শুধু একজনকে মনে পড়িলে ভণ্টুর গায়ের শিরাগুলি খাড়া হইয়া উঠে। এ বাড়ীর সব সুখ-সুবিধা ত্যাগ করিয়া মনে হয় এখনি এ বাড়ীর ত্রিসীমানা পরিত্যাগ করিয়া এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যায়। কিন্তু উপায় যে তাহার নাই, চিন্তা সূত্র এলোমেলো হইয়া যায়।

... ...

সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত অরূপকে পড়াইয়া ভণ্টু আপনার ঘরে ঢুকিল। খোলা জানালা দিয়া নজর পড়িতেই ভণ্টুর লক্ষ্য পড়িল

আকাশ পানে। আকাশের গায়ে কালো ধোঁয়ার মত একরাশ মেঘ আসিয়া ফুটন্ত তারাগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। খুব জোরে এক ঝাপট বৃষ্টি আসিবে তাহারি পূর্ব্বাভাষ।

বেশীক্ষণ ভাবিবার সময় না দিয়া জোরে এক ঝাপট বৃষ্টি আসিয়া ধরিত্রীকে সিক্ত করিয়া দিল। কাঁচের সার্সিটা ভেজাইয়া দিয়া উদাস দৃষ্টিতে ভণ্টু যেন বৃষ্টির ধারাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া চলিল।

হঠাৎ ভণ্টুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—হর্ণ বাজাইয়া বিরাট একখানা 'কার' আসিয়া কালো মার্ব্বেল-মোড়া বারাণ্ডার সামনে দাঁড়াইল। এই দুর্য্যোগের মধ্যে কাহার আবার বেড়াইবার সখ হইল! বেশীক্ষণ ভণ্টুকে ভাবিতে হইল না।

গাড়ি হইতে নামিল, সেদিনকার সেই শুক্লাদেবী, তাহারই সঙ্গে আর একটি সাহেবী পোশাক পরিহিত যুবক। উভয়েই বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া গিয়াছে।

ভণ্টু দেখিল, দু'জনেই খুশিতে পরিপূর্ণ। বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহাদের অভিযান যে নতুনভাবে সম্পূর্ণ হইল, এই বোধ হয় মনোভাব।

অবিরাম ধারায় বৃষ্টি—মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। যুবকটি শিস্ দিতে দিতে এক রকম জোর করিয়া শুক্লাদেবীর বাহু ধরিয়া চারিটা সিঁড়ি টপকাইয়া উপরের বারাণ্ডায় উঠাইয়া দিল।

ভণ্টু দেখিল, শুক্লাদেবী একটু বিরক্ত হইল এবং প্রতিবাদের সুরে বলিল, এ কিন্তু ভারি অন্যায়। আমি পছন্দ করিনা আমার গায়ে হাত দেওয়া।

যুবকটি সপ্রতিভ ভাবে বলিল, 'ও মাই গড', আমার স্মরণ ছিল না। এজন্যে আমি বিশেষ দুঃখিত।

'কলিং বেল' টিপিতেই বেয়ারা আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

—বেশ আছ, বলিয়া ভণ্টু জানালা হইতে সরিয়া আসিল। ঘরের লাইট জ্বালা ছিল না, নচেৎ তাহার চৌর্য্যবৃত্তি শুক্লাদেবী ধরিয়া ফেলিত।

পরদিন সকালে উর্ম্মিকে পড়াইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ভণ্টু যাইল শ্যামলালের কাছে।

শ্যামলাল ভণ্টুকে দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইল। ভণ্টুর পিঠে হাত দিয়া সস্নেহে শ্যামলাল প্রশ্ন করিল, তারপর কি রকম?

ভণ্টু গম্ভী ভাবে একে একে তার যত্নের কথা বিশেষ করিয়া খাদ্য-তালিকার, শয়নের, বিছানার ও চাকর বাহাদুরের কথা পর্য্যন্ত বেশ রং ফলাইয়া শ্যামলালকে শোনাইল।

গভীর বিস্ময়ে শ্যামলাল যেন হতবাক্। সোল্লাসে শ্যামলাল বলিল, বলিস্ কি—এ যে মাইরি জামাই আদর। আমারি তো মনে হচ্ছে—এ শালার চাকরি ছেড়ে তোর সঙ্গে চলে যাই।

ভণ্টু হাসি চাপিয়া উত্তর দিল, আর যাই বল শ্যামদা, জামাই আদর বলো না। ও বাড়ীর জামাই হওয়া চিন্তা করার থেকে আমি বরং যম-রাজকে ধ্যান করতে রাজী আছি।

শ্যামলাল হাসিয়া বলিল,—বলা-কথা বললি শুনে গেলাম ভণ্টে, ওটা কিন্তু প্রাণের কথা নয়। আচ্ছা থাক্, তখুনি বলিনি—সুখে থাক্‌বি?

ভণ্টুর মুখখানা নিমেষে কাল হইয়া গেল। সে ভাবটা সামলাইয়া মুখের উপর এক ঝিলিক্ হাসি আনিয়া বলিল—"তা' বই কি!"

শ্যামলাল বলিল, এই সামনের শনিবারে কিন্তু তোমার যেতে হবে আমার দেশে। তোর বউদিকে লিখে দিয়েছি। বেশ সুন্দর তোর

বউদি, বুঝলি ভণ্টু। সুন্দর মানে……রূপের দিক দিয়ে বলছি না, তবে এ…ই সব দিক দিয়েই ভাল। সেদিন কবিতা পড়লি, দেখলি তো? এক একবার মনে করি একটা বাসা দেখি, কিন্তু বড্ড খরচ। তুই কি বলিস্ ভণ্টু?

ভণ্টু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—পাগল হয়েছ! বাসা করা চাট্টি কথা! যা দু'পয়সা জমিয়েছ—একেবারে মূলে হাভাত।

সন্তুষ্টচিত্তে শ্যামলাল বলিল, এই জন্যেই তোকে আমার খুব ভাল লাগে, তুই বুঝিস ভাল।

ভণ্টু জানে, শ্যামলাল বউএর কথা পাড়িলে সহজে থামিতে চায় না। ভণ্টুকে আবার যাইতে হইবে, একটু বিব্রত হইয়া উঠিল। মেসের চাকরকে ডাকিয়া ভণ্টু কথার মোড় ঘুরাইয়া দিল।

শ্যামদা, কি খাবে বল, কিছু খাবার আনতে পাঠাই।

না, খাবার কেন, এর মধ্যেই হাত ঝাড়তে আরম্ভ করে দিয়েছিস তো?

ভণ্টু দুই টাকার খাবার আনিতে পাঠাইয়া মেসের অন্য কয়েকজন বন্ধুকে ডাকিতে চলিয়া গেল। ঠাকুরকে ডাকিয়া এক কেত্‌লি চায়ের ফরমাশও দিল।

ভণ্টুর বিদায় কালে শ্যামলাল পুনরায় বলিল, এ শনিবারে যাওয়া চাই কিন্তু আমার সঙ্গে।

ভণ্টু বলিল, এ সপ্তাহে টাকা পাবো কোথায়? তা' ছাড়া এখন কিছুদিন কোথাও যাওয়া ঠিক কি—তুমিই বল না?

শ্যামলাল বলিল, আহা, টাকা আমি তোমায় কবে দিই না বল। এবার কিন্তু মাহিনা পেলে কিছু দিস্।

শ্যামলাল ভণ্টুকে সত্যই খুব স্নেহ করিত আর সেইজন্যই সব সময়ে এক সম্বোধনে কথা বলিতে পারিত না -কখনও তুই, কখনও তুমি বলিত।

ভণ্টুও জানিত শ্যামলাল তাহাকে যথার্থই স্নেহ করে। তবে কৃপণ মানুষ, বেচারার যেন পয়সার দিক দিয়া শান্তিভঙ্গ না হয়।

... ...

কয়েকমাস বেশ কাটিয়া গেল ভণ্টুর। উর্ম্মি যেন নতুন একটি সঙ্গী হইয়াছে। তাহাকে লইয়া ভণ্টুর বেশ খানিকটা সময় কাটিয়া যায়।

দুইদিন ধরিয়া ভণ্টু লক্ষ্য করিতেছিল, বাড়ীতে কি একটা উৎসব আছে, বাড়ীর সকলেই খুব ব্যস্ত।

খুব সকালে উঠিয়া ভণ্টু 'লনের' মধ্যে পায়চারি করিতেছিল। ঝিরঝিরে হাওয়ার সঙ্গে বাসি ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। মালীরা তখনও উঠে নাই। ঘুমন্ত নগরী তখনও নিঝুম্। কে বলিবে, কিছুক্ষণ পরেই কোলাহলে হইয়া উঠিবে মুখরিত। রাত ও দিন যেন সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি।

হঠাৎ মাঝ পথে বাধা পড়িল। সামনেই শুক্লা ও উর্ম্মি পুকুরের ওই দিক দিয়া আসিয়া একেবারে ভণ্টুর সামনাসামনি। ভণ্টু বিশেষ লক্ষ্য করে নাই, উর্ম্মি চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, মাষ্টার মশাই!

শুক্লাকে বোধ হয় লক্ষ্য না করিয়াই উর্ম্মি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। মাষ্টারমশায়কে ডাকিয়া হঠাৎ দিদির মুখের পানে চোখ পড়িতেই উর্ম্মি যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

শুক্লা শুধু উপেক্ষার দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের জন্য ভণ্টুর পানে চাহিয়া উর্ম্মির হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া হন্ হন্ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

লজ্জিত হইয়া উর্ম্মি সেদিন আর পড়িতে আসিল না।

সেদিন অরূপ আসিয়া জানাইল, মা আপনাকে সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুর ঘরে যেতে বলেছেন। আজ মা অনেক কাঙ্গালী খাওয়াবেন। আজকে মায়ের গোপালজীর জন্মতিথি কিনা। এই তিথিতে গোপালজী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—তাই আজ বাড়ীতে উৎসব!

আগ্রহ সহকারে ভণ্টু বলিল, নিশ্চয় যাবো। ভারি আনন্দ হচ্ছে, এর থেকে ভাল কাজ আর কি হতে পারে? মা কিনা—তাই মায়ের কাজই ক'রছেন। ভণ্টু সন্তুষ্ট হইয়া চাহিল অরূপের পানে,—ও তাই যেন বাড়ীতে ধূমধাম, আনন্দের সাড়া পড়েছে।

অরূপ বলিল, ধূমধাম জন্মতিথি উপলক্ষেও বটে এবং যদি দিন পাওয়া যায় ও সুবিধা হয় তা'হলে হয়তো সামনের সোমবারে আমার দিদির 'পাকা দেখা' হবে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভণ্টু বলিল—ও তাই নাকি, ভাল কথা।

কথার স্রোতে ভণ্টু লক্ষ্য করে নাই অরূপের দিকে। শুক্লার বিয়ে মানেই ভণ্টুর সৌভাগ্যের বিষয়—তাই মাত্রা ছাড়িয়া ভণ্টু একটু বেশীর দিকে গিয়াছিল। বুদ্ধিমান ভণ্টু অরূপের কথা ও ভাবভঙ্গিতে বুঝিয়া ফেলিল— বিয়েতে অরূপের বিশেষ মত নাই।

... ...

দুই দিনের ছুটি লইয়া ভণ্টু শ্যামলালের সহিত তাহার দেশে গিয়াছিল। ক'দিন হইতে অরূপের শরীর ভাল ছিল না—সেইজন্য আরও যেন ভণ্টুর মন টিকিল না। বিশেষতঃ ঊর্ম্মি, স্কুলের থিয়েটার লইয়া ব্যস্ত ছিল।

আগে হইতেই শ্যামলালের বাড়ীতে চিঠি দেওয়া হইয়াছিল। দুর্গাবতী সাদরে গ্রহণ করিলেন ভণ্টুকে এবং ভণ্টুও নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

—এস বাবা, এস। শ্যাম প্রত্যেকবারই তোমার নাম করে। এতদিনে বুঝি বুড়ো মাকে মনে পড়ল!

ভন্টু মনে মনে লজ্জিত হইল। শ্যামলালকে দেখিয়া তাহার বাড়ী সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছিল তাহার সহিত কোনটাই মিলিল না।

—ও বউমা এস, দেখ, তোমার দেওর এসেছে। বাছা আমার দুঃখ করে যে, ননদ—দেওর কেউ নেই।

ভারতীও আসিয়া বেশ সহজ, সরল ভাবেই মেলামেশা ও কথাবার্ত্তা করিল। ভন্টু সত্যই খুব সন্তুষ্ট হইল দুর্গাবতী এবং ভারতীর অকপট ব্যবহারে।

দুর্গাবতী নিজে হইতেই ভন্টুকে বলিলেন, তুমি বাছা আমাকে মাসীমা ব'লো। তারপর ভন্টুর গ্রামের এবং যাবতীয় পরিচয় জানিয়া লইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, ওমা, তুই তা'হ'লে আমার গঙ্গাজলের ছেলে!

একে একে শৈশবের কত খুঁটিনাটি ঘটনা সবই দুর্গাবতী বলিয়া গেলেন। জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কত কিছু ঘটিয়া যায়; শুধু স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকে। আজ প্রায় বিশ বৎসর পরে গঙ্গাজলের ছেলেকে দেখিয়া দুর্গাবতীর বহুদিনের পুরানো কথা মনে পড়িল। ভন্টুর মায়ের নাম বিমলা।

ভারতীও মন খুলিয়া খানিক গল্প করিবার লোক পাইয়া বাঁচিল। ভন্টুর ছাত্রের কথা, ছাত্রীর কথা এবং শুক্লাদিদির কথা আগ্রহ সহকারে ভারতী শুনিতে লাগিল।

তারপর একে একে ভারতীর কবিতাগুলিও ভন্টু না দেখিয়া ছাড়িল না। ভন্টু ভারতীর যত প্রশংসা করে—দুর্গাবতী আনন্দের সহিত ততই সমর্থন করেন।

ভন্টু বলিল, আমার মাসীমা ভালো বলেই বউদি এত ভালো।

কি যে বলিস বাবা, নিজের মা মাসীকে ছেলেদের কবে খারাপ লাগে! হ্যাঁরে ভণ্টু, মার কাছে যাবিনে? কতদিন যাসনি বল্‌ছিলি?

ভণ্টু বলিল, যাবো এইবার। ছাত্রের দিদির বিয়ে। ওদের পড়ার ঝঞ্ঝাট থাকবে না, সেই সময় যাবো

রমা ছুটিয়া আসিতেছিল,—জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠাইমা। সাম্‌নে অপরিচিত লোককে দেখিয়া জড়সড় হইয়া একপাশে দাঁড়াইল।

—কে রে রমা, আয়। ওকে আবার লজ্জা কেন? ও আমার গঙ্গাজলের ছেলে, শ্যামলালের সঙ্গে এক মেসে থাকে।

বাবা আসছেন জ্যাঠাইমা—সাম্‌নের বুধবারে—আর মাত্র মাঝে পাঁচ দিন।

দুর্গাবতী বলিলেন, ওমা, তাই নাকি? বেশ বেশ।

রমা বলিল, ভারতী কোথায় জ্যাঠাইমা?

মাংস রাঁধছে—ভণ্টু এল, দু'দিন কিছুই হলোনা; কালই চলে যাবে। এমন মুখপোড়া দেশ, ইচ্ছা হ'লেই কি কিছু মেলে!

দুর্গাবতীর সব কথাই ভারতীকে না বলিলে চলে না, তাই গলার স্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন—ও বউমা, রমার বাবা আসছে, শুনলে গা? চোখ ফিরাইয়া রমাকে কি বলিতে যাইবেন, দেখিলেন রমা নাই; হয়তো অন্য কোন বাড়ীতে নূতন সংবাদ দিতে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছে।

দুর্গাবতী আবার বলিলেন,—ভণ্টুকে একটু চা দাও বাছা। কতক্ষণ ধ'রে বলছি···

ভণ্টু বলিল, আবার চা কেন?

রান্নাঘরে কাঠের উনানের সহিত যুদ্ধ করিয়া মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তারপর দুর্গাবতীর বারংবার চীৎকার। কৃত্রিম রোষের সহিত ভারতী ভণ্টুকে আসিয়া বলিল, হ'য়েছে ভাল ঠাকুরপো—আপনি দেখছি মায়ের আদুরে দুলাল হ'লেন। বউ মরছে ধোঁয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, মা বলছেন—চা কর।

ভণ্টুও বেশ গাম্ভীর্যের ভান করিয়া উত্তর দিল, নিশ্চই। মাসীমা জানেন—ভণ্টু কত ভাগ্যের; কি বল মাসীমা? আপনি এখানে বসুন বউদি, আমি বরং দেখুন না, দু'মিনিটে দু'কাপ চা ক'রে আনছি।

তা' আন্ বাছা, দেখা বউমাকে আমার—ছেলের ক্ষমতা আছে কি না!

বেশ আনন্দ ও পরিহাসে দুই দিন কোথায় দিয়া কাটিয়া গেল—ভণ্টু, দুর্গাবতী ও ভারতী কেহ টেরও পাইল না। বিদায় কালে ভণ্টুর চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিয়াছিল, যেন নিজেরি গৃহ হইতে বিদায় লইতেছে। আবার আসিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়া ভণ্টু শ্যামলালের সহিত ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

আবার সেই কর্ম্ম-মুখর মহানগরী, যেখানে শুধু সময়মত বাঁধাধরা কাজ। ভণ্টুর যেন মনে হয় এখানকার লোকগুলিও যেন এক একটি কৃত্রিমতার ছবি—অন্তরের সহিত বাহিরের কোন মিল নাই।

ভণ্টুকে দেখিয়া উর্ম্মি ছুটিয়া আসিল। দু'দিন ছিলেন না, বড় মন খারাপ কর্‌ছিল—উর্ম্মি বলিল।

ভণ্টু সস্নেহে উর্ম্মির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, কেন উর্ম্মি, তোমার তো বরং ভালই হয়েছিল—পড়্‌তে হয়নি, কেমন?

উর্ম্মি খানিক বেশ ভারিক্কি চালে কি যেন চিন্তা করিল—তারপর বলিল, তা ঠিক ; তবে আপনি থাক্‌লে আরও ভাল লাগে। জানেন মাষ্টার মশাই, আপনাকে আমার মা খুব ভালবাসেন ; কত সুখ্যাতি করেন আপনার। দাদাভাই তো ভালবাসেই, আর আমিতো বাস্‌বই —কারণ আমার মাষ্টার মশাই।

ভণ্টু একটু চিন্তা করিয়া বলিল, আচ্ছা তোমার দিদির বিয়ে কবে আর কোথায় হচ্ছে উর্ম্মি ?

উর্ম্মি সরিয়া আসিল, তারপর ভণ্টুর কানের কাছে মুখ লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, জানেন মাষ্টার মশাই—কারুকে বল্‌বেন না কিন্তু। যে মেয়ে, শুনলে আর রক্ষে রাখ্‌বেনা—মেরে ফেল্‌বে। আ-হা বুঝতে পারছেন না ছাই, আমার দিদির কথা ? ওই যে সেদিন সকালে দেখ্‌লেন—ওই হ'ল আমার দিদি। ওঁরই নাম শুক্লা। ও ছিল বলেই তো সেদিন সকালে আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌লাম না। সাহেবী 'সুট্' ছাড়া যে অন্য কিছু পরে—উনি তাকে দেখ্‌তে পারেন না। ও আপনাকেও দেখ্‌তে পারে না। আপনাকে অসভ্য—আরো যা' তা' বলে।

দাদাভাই বলে দিয়েছে,—আমার সামনে আমার গুরুর নিন্দে করোনা —শুনলে পাপ হয়। তাই কি রাগ মেয়ের !

আমার মনে হয় কি জানেন, ওর সেই 'গভর্ণেস্' মিস্ এলিজাবেথ্ বুড়ি মেমটার আচ্ছা করে' নিন্দে করি। কিন্তু তা'হ'লে আর রক্ষে থাকবে না। ও—মাকে পর্য্যন্ত মানে না।

উর্ম্মি বলিল, প্রতুলকে চেনেন তো ? বেশ সুন্দর মত, 'সুট্' পরা লোক, রোজ আসে। মা'র মত নেই, অথচ ওঁর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে। এতদিন ও বিলেতেই ছিল—বছরখানেক হ'ল এসেছে। আমার রাকা কাকু

খবর নিয়ে জেনেছে—ও নাকি দু' দু'বার ব্যারিষ্টারি ফেল করে' এসেছে। এদিকে কি বড় বড় কথা! দিদির ধারণা, ওর মত মার্জ্জিত ও সভ্য লোক নেই। সেই জন্তেই তো বিয়ে হবে ওই প্রতুলের সঙ্গে। মা কি করবে? তা' না হ'লে মার ইচ্ছা ছিল—কোন রাজবাড়ীতে কি কোন ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়।

প্রতুলের তো আছে কচু। বাবা অনেক টাকা দিদিকে দিয়ে গ্যাছেন, সেই লোভেই দিদিকে বিয়ে করতে ওর বেশী জিদ্। মা এতো বোঝাচ্ছে, কিন্তু দিদি মোটেই বুঝবে না। আচ্ছা, এ অন্যায় না—আপনিই বলুন?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভণ্টু বলিল, অন্যায় বইকি। ঘরোয়া কথার মধ্যে থাকা উচিত নয় বুঝিয়া ভণ্টু বিব্রত হইয়া উঠিল।

উর্ম্মি বলিল, মাষ্টার মশাই—তিনবার সত্যি বলুন।

যন্ত্রচালিতের মত ভণ্টু তাহাই বলিল।

কারুকে বল্‌বেন না কিন্তু,—বললে পাপ হবে।

বিস্ময়ের ভান করিয়া ভণ্টু বলিল—সত্যি!

হ্যাঁ, বাহাদুরকেও বল্‌বেন না।

আচ্ছা।

তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া উর্ম্মি আস্তে আস্তে বলিল, দিদি বলে, 'বাহাদুর আপনার বন্ধু।'

... ...

মা চিঠি লিখিয়াছেন, ভণ্টুকে বিশেষ করিয়া যাইবার জন্ত।

ভণ্টুও কতদিন মাকে দেখেনি। তাহার মা লিখিয়াছেন,—গৌরী মাস দুই হইল আসিয়াছে—শীঘ্র চলিয়া যাইবে। গৌরী ভণ্টুর বড় দিদি। দিদিকে ভণ্টু অনেকদিন দেখে নাই—সেইজন্ত ভণ্টুর যাওয়া আরও

দরকার। টাকাকড়ি ভণ্টুকে পাঠাইতে হইবে না—বিদেশ-বিভুঁই জায়গা--বিশেষতঃ একা থাকে। শুধু একবার যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া মা জানাইয়াছেন চিঠিতে।

আরও অনেক খুঁটিনাটি খবর আছে চিঠিতে,—রান্নাঘরখানি পড়িয়া গিয়াছে। এবার বর্ষায় বড় ঘরখানিও থাকিবে না। 'ম্যাচা' কাটিয়া কিছু টাকা পাওয়া গিয়াছে- গৌরীর ইচ্ছা ঘরখানি সারানো। কিছু আউশ ধানও পাওয়া গিয়াছে। মাস দুই চলিবে। জামাইও অনেক জিনিস পাঠান—সেইজন্যে উপস্থিত কোন অসুবিধা নাই।

সর্ব্বশেষে মা লিখিয়াছেন, 'তোমার বুধি গাইএর একটা সুন্দর বকনা বাছুর হইয়াছে—সের তিনেক দুধ হয় ঘরে।' গৌরীর মেয়ে মিনু, বকনাটির নাম রাখিয়াছে 'চাঁদ-কপালি'। চিঠির কোণে পুনরায় লেখা আছে—শশীর মেয়ে পারুলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জামাই কলিকাতায় আহিরীটোলায় থাকে—নাম পাঁচু। ভণ্টুর যদি সুবিধা হয়, একবার যেন পাঁচুর সঙ্গে দেখা করে।

চিঠিখানি পড়িয়া ভণ্টু একবার উদাস দৃষ্টি মেলিয়া আকাশ পানে চাহিল। দেখিল, তুলার টুকরার মত মেঘগুলি চাকা চাকা হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

ভারতীকে মনে পড়িয়া যায়। কি সুন্দর মেয়েটি! গভীর দুঃখকে চাপিয়া হাসিমুখে কেমন চলে। ভণ্টু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভারতীর অন্তরের কথা সব বুঝিতে পারে। মাসীমাও কি চমৎকার! জগতে লোক বোধ হয় কেহই খারাপ হয় না। কিজানি কেন, সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না শুধু আজকালকার জমকালো বেশধারী মেয়েগুলোকে!

উপরের ঘর হইতে হো হো শব্দে উচ্ছৃঙ্খল হাসির আওয়াজ আসিয়া ভণ্টুর কানে তালা লাগাইয়া দেয়। প্রতুলবাবু হইবে হয়তো,—উদ্দি

যাহার কথা বলিয়া গেল। শুক্লার মিষ্টি গলার স্বরে বোঝা গেল—উর্ম্মিও আছে। এবং উর্ম্মিকে লইয়াই হাসিবার কিছু কারণ হয়তো!

আর না হয়তো, অসভ্য জানোয়ারবেশী তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই হাসির উচ্ছ্বাস। উহাদের কাছে ভণ্টু জানোয়ার ছাড়া আর কি! ভণ্টু একটু না হাসিয়া পারিল না।

বাহাদুর আসিয়া বলিল, উঠুন—হাত মুখ ধো'ন, খাবার সময় হয়ে' এল।

বাহাদুরের জিম্বায় থাকিয়া ভণ্টু যেন কলের পুতুল হইয়া গিয়াছে। বাহাদুরই যেন ভণ্টুর অভিভাবক। ভণ্টুর যাহাতে এতটুকু অসুবিধা না হয়, সেদিকে বাহাদুরের সতর্ক দৃষ্টি।

ভণ্টু সময় সময় বলে, আচ্ছা বাহাদুর আমাকে এত যে যত্ন করিস্ আর এমনভাবে আমাকে পরাধীন করে' তুললি, আমিতো এদের বাড়ীর সামান্য একজন টিউটর। আজ আছি কাল নেই। তারপর আমার কি হবে? ক'রে-খাওয়ার পথও বন্ধ করে' দিলি? শেষ পর্য্যন্ত কুঁড়ের বেহদ্দ হ'যে গেলাম।

বাহাদুর উত্তর না দিয়া নীরবে হাসে। সে স্বভাবতঃ কথাই খুব কম বলে—বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া। শুধু রাত্তে বসিয়া ভণ্টুকে শোনায় তাহার বাড়ীর কথা।

তাহার দেশের বাড়ীতে এক সৎমা আছে, ভারি মন্দ। ভাল করিয়া খাইতে পর্য্যন্ত দেয়না। তাহার নিজের একটা ছোট বোন আছে—নাম কাঞ্চী। সৎমা একদিন কাঞ্চীর পিঠে একটা লোহার হাতা পোড়াইয়া ছেঁকা দিয়াছিল। তাহার বাবা দার্জ্জিলিংএ এক সাহেব বাড়ীর বেয়ারা।

বোনকে মারিবার জন্য বাহাদুরের খুব রাগ হইয়াছিল।

তিন ক্রোশ দূরে এক গ্রামে তাহাদের এক দেবতার মন্দির আছে। সেখানে প্রত্যেক শনি মঙ্গলবার রাতে ভূত পেত্‌নী নাচে। বাহাদুর বলিয়া চলে—সেই রাতে যদি কেউ একাকী গিয়া দুইটা মুরগীর ডিম মন্দিরের বেদীর উপর ভাঙ্গিয়া 'মানস' করে—তাহার সে ইচ্ছা নিশ্চিত পূর্ণ হয়।

সেদিন মঙ্গলবার ছিল। বাহাদুর সেই রাতে একা গিয়া ডিম ভাঙ্গিয়া মানস করিয়াছিল—তাহার সৎমা যেন যন্ত্রণাদায়ক অসুখে কষ্ট পায়—যেমন কাঞ্চী যন্ত্রণা পাইল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল বাহাদুর, তাহার সৎমা যন্ত্রণায় অস্থির—মর মর। তখন বাহাদুর এক গুণী লামাকে ডাকিয়া আনে।

লামা (ওঝা) আসিয়া বলিল, পেটের মধ্যে অপদেবতা আশ্রয় করিয়াছে।

বাহাদুর শিখাইয়া দেয় ওঝাকে যে, তাহার সৎমাকে দিয়া স্বীকার করাইয়া লইতে হইবে যে ভবিষ্যতে—সৎমেয়ে ও সৎছেলেকে খুব ভালবাসিবে—কোনদিন কষ্ট দিবেনা। যদি স্বীকার করে তবেই অপদেবতা প্রসন্ন হইয়া ছাড়িয়া দিবে—নতুবা নয়।

বাহাদুরের কথামত ওঝা তাহাই করিল—অগত্যা সৎমাকে রাজী হইয়া নাকে কানে খৎ দিতে হইল। তাহার পর হইতেই সে নাকি খুব ভাল ব্যবহার করিতে থাকে। বাহাদুরের মতে, লামার কথা অগ্রাহ্য করিলে বুদ্ধের কোপে পড়িতে হয়।

বাহাদুরের গল্প ভণ্টু খুব আগ্রহ সহকারে শুনিতে থাকে এবং বাহাদুর মাষ্টার বাবুর মত এমন এক শ্রোতা পাইয়া এত খুশি হয় যে তাহার জন্য সে বোধ হয় নিজের জান কবুল করিয়া দিতে পারে।

... ...

দুর্গাবতীর সত্যই এবার মন খারাপ হইয়া গিয়াছে। ভণ্টু ছেলেটি কি ভাল, পরের ছেলে দু'দিনের জন্য আসিয়া কি মায়ায় ফেলিয়া গেল! সব সময়ে ভণ্টুকে মনে পড়ে। কে বলিবে মাত্র দু'দিনের পরিচয়।

ঘাটে যাইবার জন্য তেল ও গামছা লইয়া বাহির হইতেছিলেন এমন সময় ভারতীর ভাই কানু আসিয়া উপস্থিত।

কি ব্যাপার, তুমি হঠাৎ, বাড়ীর সব খবর ভাল তো?—ও বউমা কানু এসেছে—দুর্গাবতী ডাকিলেন।

ভারতী ডা'ল সম্বরা দিতেছিল, 'কানু' নাম শুনিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল. তারপর আনন্দে হাত মুছিতে মুছিতে ছুটিয়া আসিল।—ওমা কানু! কিরে সব খবর ভাল?

উদ্বিগ্ন হইয়া কানু বলিয়া উঠিল—মাযুইমা, শানুর বড় অসুখ; মেজদিকে দেখ্বার জন্য কাঁদছে—বোধ হয় বাঁচবে না। তাই বাবা পাঠিয়ে দিলেন—মেজদিকে নিয়ে যাবার জন্যে।

আপনার যদি অসুবিধা না হয়, আজ রাতের ট্রেনেই দিদিকে নিয়ে গেলে ভাল হয়। দিল্লী থেকে বড়দি ও জামাইবাবু এসেছেন পরশু রাত একটায়।

দুর্গাবতী সহানুভূতির সুরে বলিলেন, না বাবা, আমার কিছুমাত্র অমত নেই। শ্যামের একটু মতের দরকার ছিল বটে, কিন্তু তারও দরকার নেই। ভাইএর যেখানে এত অসুখ—এখন কি পাঁচ কথার সময়?

ভাই বোন দু'জনেই কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দুর্গাবতীর পানে চাহিল। শানুর অসুখ শুনিয়া ভারতীর চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল।

দুর্গাবতী বলিলেন—না, চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করোনা।

আমি চট্ করে' ডুব দিয়ে আসি। তুমি বউমা বরং একটু হালুয়া করো। দেখতো, কুলুঙ্গিতে বোধ হয় দু'আনা পয়সা আছে—দাও।

ফিরবার পথে হরি ময়রার দোকান থেকে রসগোল্লা আনবো। যদিও গুড়ের, মরুকগে—তবুতো কুটুমের ছেলেকে দেওয়া হবে।

তারপর কানুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যাও বাবা, হাত মুখ ধোও গে। দিদি চা করুক।

কানু নম্রকণ্ঠে বলিল—আমি চা খাইনে।

খুশি হইয়া দুর্গাবতী বলিলেন, লক্ষ্মী ছেলে। নেশা ভারি পাজি জিনিস—ও ছাই না খাওয়াই ভাল। তোমার মেজদির কিন্তু ও না হ'লে চল্‌বে না। ভাত বাদ দিযে বরং চারদিন রাখা যায়, কিন্তু ওটি বাদ দিলেই সর্ব্বনাশ।

ও বউমা দাঁড়িয়ে থেকোনা বাছা—কানুর জন্যে একটু হালুয়া করগে, আমি এলাম বলে।

দুর্গাবতী চলিয়া গেলে কানু বলিল, দিদি—তোর শাশুড়ী লোক খুব ভালো, না?

হ্যাঁ, উনি খুব ভালো।

সেই দিন রাত আট্‌টার ট্রেনে কানুর সহিত ভারতীকে দুর্গাবতী নিজে উদ্যোগী হইয়া পাঠাইয়া দিলেন।

... ...

পরদিন দুর্গাবতী সকালে বসিয়া উনান লেপিতেছিলেন—ভারতীর পোষা বিড়ালটা তন্ন তন্ন করিয়া বোধ হয় ভারতীকে খুঁজিতেছিল।

আজ একাদশী, পরম নিশ্চিন্ত, খাওয়ার ঝঞ্ঝাট নাই। দুর্গাবতী আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিড়ালটার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—সে তার মায়ের কাছে গিয়েছে,—যাবেনা? কতদিন এসেছে ছেলেমানুষ।

রমার মা আসিয়া ডাকিল—দিদি।

কে রে জয়া—আয় !

জয়া জিজ্ঞাসা করিল—বউমা কোথায় ?

দুর্গাবতী বলিলেন, বাপের বাড়ী গেল, ভাই এসে নিয়ে গেল। বউমার ছোট ভাই শান্তর খুব অসুখ।

জয়া বলিল, ও—তাই বাড়ী কেমন খাঁ খাঁ ক'রছে !

যা বলেছিস জয়া—বউটাকে উপলক্ষ করেই তো থাকা। আজ যেন বাড়ীতে আর টিক্‌তে পারছিনা। এমন মায়া, সর্ব্বদা যেন ছায়াব মত আগ্‌লে রাখে ! কোন কাজে হাত দিতে দেযনা।

তারপর জয়ার মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কোন দরকারে এসেছিস ?

জয়া বলিল—উনি তো কাল আসছেন, শুনেছ বোধ হয়। রমা ষেটের কুড়িতে পড়ল—ছেলেপুলে হলো না। তাই ভাবছি, বউমার জন্তে আর রমার জন্তে বুড়ো বটতলায় ঢেলা বেঁধে আসি। উনি এলে তো আর হবে না—নাস্তিক মানুষ। তা'তো—বউমা নেই !

দুর্গাবতী বলিলেন—সে পরে হবে'খন। তা, তোর মেয়ে রাজী তো যেতে ?

জয়া উত্তর দিল,—রাজী কি আর সহজে হয়, অনেক বলা কওয়ার পর তবে ··।

দুর্গাবতী কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—হাঁট্‌তে পারবি ? অনেক পথ কিন্তু।

জয়া বলিল, না দিদি—হাঁটতে পারবো না ; গাড়ি বলেছি। তবে তুমি নাও দিদি—তাড়াতাড়ি কর।

দুর্গাবতী বলিলেন, আমায় আবার তাড়াতাড়ি কি বোন, হয়েই

আছে। তালাটা লাগিয়েই তোর সঙ্গে যাই চল। বেহুলার মাকে বরং বলে যাই—বাড়ীটা মধ্যে মধ্যে দেখবে।

মাসখানেক পরের কথা। শ্যামলাল এর মধ্যে আর বাড়ী আসে নাই—মাত্র কাল সে বাড়ী আসিয়াছে।

মাধব রায়ও ফিরিয়াছেন—একেবারে দেশী মানুষ। বাড়ীতে এই মাসখানেক ধরিয়া আনন্দের বান বহিয়া যাইতেছে।

রমা ও অনুপম বাবার আসা উপলক্ষ করিয়া ছোটখাট একটা ভোজের আয়োজন করিয়াছে। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী হইতে একটি করিয়া লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

মাধব রায় ও জয়া দেবী অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু রমার জেদ বড় বেশী—তা' ছাড়া আনন্দকে নিরুৎসাহ করা—। তবে ভারতী না থাকায় রমা যেন মনমরা হইয়া আছে।

গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে অনুপম যাইয়া বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছে। আর শ্যামলালতো বলিতে গেলে নিজের বাড়ীর লোকই। সকাল হইতে দুর্গাবতী রমাদের ওখানেই আছেন। দু'জন বামুন আসিয়াছে—রাঁধিবার জন্য। তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভারই দুর্গাবতীর উপর।

সত্যনারায়ণ দেওয়া হইবে, সেই যোগাড়ে জয়া দেবী আছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছায় মাধব রায়—গরদের পান ও চাদর পরিতে ও একটি শুভ্র পৈতা লইতেও বাধ্য হইয়াছেন। মেয়ের জন্য নূতন গ্রামোফোন আনাইয়াছেন—রমা তাহা লইয়াই ব্যস্ত।

গ্রামের নিয়ম অনুসারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ডাকিবার প্রথা। অনুপম যথা সময়ে যাইয়া গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইল।

সকলেরই কেমন একটু বিব্রত ভাব। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে অনুপম লক্ষ্য করিল,—ব্যাপার কি!

অবশেষে গ্রামের যিনি মাতব্বর, তিনি জানাইলেন—তোমার শ্বশুর বিলেত গিয়েছিলেন, তাঁর বাড়ীতে খাওয়া কি চলে বাপু! বলাটা হয়ত অপ্রিয়, তবু বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি—মাধবের এখন জাতই হয়ত নেই।

কি বল তোমরা সব?

অপরাপর সকলেই তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া কথাটা সমর্থন করিল।

শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মান্‌তে হ'লে তোমার শ্বশুরের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। তা'হ'লে আমাদের আর কিছু বল্‌বার থাকে না।

অনুপম রাগে তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে—তবু সংযত ভাবেই বলিল—কাল আপনারা বল্‌লেন না কেন?

দেখিতে দেখিতে প্রায় বিশ কি পঁচিশ জন লোক সেখানে আসিয়া সমবেত হইল।

অনুপম বুঝিল, ইহাদের সহিত বাক্‌-বিতণ্ডা ভুল। তাহাতে নিজের মান থাকিবে না। যথাসাধ্য অনুপম সকলকেই বোঝাইল, কিন্তু সকলেরি—সেই এক কথা। রাগ হইল নিজের উপর। রমার ছেলেমানুষিতে মাতিয়া আজ ইচ্ছা করিয়া কি বিভ্রাটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

বিলম্ব দেখিয়া মাধব রায় ও বিনোদ আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল।

মাধব রায়কে দেখিয়া মাতব্বর বিশ্বেশ্বর রায় সোল্লাসে বলিলেন, এই যে ভায়া, শোন। আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ—আমি এবং আমরা সকলেই অনুরোধ করছি—তুমি একটা প্রায়শ্চিত্ত কর। বিশেষ কোন হাঙ্গাম্‌ নেই। তা'হ'লে তোমার বাড়ীতে খাওয়ার আমাদের কোন বাধা থাকেনা। ওহে রামরতন, গেলে কোথায়?

রামরতন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুঁথিপত্র এমনকি ফর্দ্দ একগ্রন্থ পর্য্যন্ত লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন,—তিনি বিধি এবং বিধেয় একে একে বর্ণনা করিয়া গেলেন। সর্ব্বোপরি তিনি শুনাইলেন, সমুদ্র-যাত্রা আর ম্লেচ্ছ দেশে যাতায়াতের মত গর্হিত কাজ পুঁথিতে আর লেখা নাই। তবে গোটাকতক ফুল ফেলিয়া মন্ত্র উচ্চারণ ও গোটা পঁচিশ টাকা দিয়া যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব 'ভশ্চাজ মশাই' মাধব রায়ের পাপ খণ্ডন করাইতে সাহায্য করিতে পারেন।

সমস্ত কথা শুনিয়া জলদ গম্ভীর স্বরে মাধব রায় বলিলেন, আরতো আপনাদের কিছু বলবার নেই? এইবার আমি তা'হ'লে গোটাকতক কথা বল্‌তে পারি? আমি আপনাদের কোন কথাই সমর্থন করলাম না। এবং অন্যায় যেখানে আমি করিনি, সেখানে প্রায়শ্চিত্ত করার আমার কোন প্রয়োজন নেই।

সমস্বরে সকলে বলিয়া উঠিল,—তা'হ'লে তোমার বাড়ীতে খাওয়ার আমাদেরও কোন প্রয়োজন নেই।

মাধব রায় কঠিন সুরে উত্তর দিলেন, সে আপনাদের অভিরুচি। কাল নেমন্তন্ন গ্রহণ করেছিলেন—সেই দাবিতে ডাকতে আসা।

চলে এস হে বিনোদ, অনুপম। মিথ্যে বাক্যব্যয় করার মত যথেষ্ট পরিমাণে সময়ের আমার অভাব।

বিশ্বেশ্বর ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন, জানো—আজ থেকে তুমি এক ঘরে হলে?

মাধব রায় বলিলেন, স্বচ্ছন্দে। আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে আপনাদের সমাজে বাস করায় আমার প্রবৃত্তিও নেই। আমাকে হঠাৎ বিপদে ফেলে ভয় দেখানো—মনে করেছেন, উপায় না থাকায় আমি নীরবে সমর্থন করবো আপনাদের যথেচ্ছ বিধি? যদি আপনারা কাল

আমায় এ সম্বন্ধে কিছু বলতেন, তবে হয়তো আমি চিন্তা করতাম। আজ আমি ভয় পেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবো—এতখানি দুর্ব্বলত এখনো আমার উপস্থিত হয়নি।

দলের মধ্য হইতে একজন অনুপমের নিকটে আসিয়া বলিল, বাবাজী—শ্বশুরকে একটু বুঝিয়ে বল—কাজটা ভাল হচ্চেনা। হাজার হ'ক, তুমি পণ্ডিত মানুষ; তবু বলছি, সমাজে বাস করতে গেলে নিজেকে সব সময়ে বড় ক'রে দেখলে চলে না। সামাজিক লোকাচার তো মানতে হবে বাপু!

অনুপম সহজ গলায় উত্তর দিল, উনি তো অন্যায় কিছু বলছেন না। সত্যি তো, প্রায়শ্চিত্ত উনি কেন করবেন? উনি বলতে গেলে দেশের গৌরব! সম্মানের সঙ্গে পদস্থ কর্ম্মচারী হ'য়ে ফিরেছেন। আপনাদের যদি প্রবৃত্তি না হয় জোর করে অনর্থক কথা বাড়ানোয় লাভ কি!

জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিলেন, মাধব—মনে রেখ পরিণামটা।

উপেক্ষার হাসি হাসিয়া মাধব রায় বলিলেন, না বিশুদা, তুমি ছাড়বে না দেখছি সত্যি কথা না শুনে। দাদা ব'লে ডেকে এসেছি ছোট থেকে। জামাই বা ছেলে ছোকরাদের সামনে বলতে লজ্জাও হচ্ছে—কিন্তু উপায় নেই। তোমার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে। আমি বিলেত গিয়েছিলাম নিজের জ্ঞান অর্জ্জন ক'রতে দেশ দেখ্‌তে—এ ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে সুনামের সঙ্গেই ফিরে এসেছি। তোমাদের মতে আমার মত গর্হিত কাজ এর পূর্ব্বে আর কেউ করেনি। তুমি সমাজপতি! তোমার ইঙ্গিত পেয়ে তোমার চেলা-চামুণ্ডারাও সায় না দিয়ে পারছে না। কিন্তু বাপু, এত বোঝ, সামান্য কথাটা বোঝ না যে, ওপর দিকে থুথু ফেল্‌লে নিজের

মুখেই পড়ে। সবারি জাত সম্বন্ধে তোমার যে এত আগ্রহ—উৎসুক হ'য়ে লোকের ছুতো খুঁজে বেড়াও, আমি জিজ্ঞাসা করছি বিশুদা—তোমার জাত ঠিক আছে তো ? গুণী ডোমের বউ না হ'লে—তোমার একদিনও চল্‌তো কি ?

সপাং করিয়া কে যেন বিশ্বেশ্বরের মুখের উপর চাবুক মারিল। অতি সত্যি কথা, গ্রামের ছেলে বুড়ো কাহারও অজানা নহে। ভয়ে ভক্তিতে মুখ হইতে গর্হিত কথাটা আজও কাহারও বাহির হয় নাই—শুধু সাহসের অভাবে।

আর কথা না বলিয়া হন্ হন্ করিয়া মাধব রায় চলিয়া গেলেন। নিঃশব্দে অনুপম ও বিনোদ তাঁহার অনুসরণ করিল।

সভাসুদ্ধ যেন চুপ। সকলেরি যেন বাক-শক্তি রহিত।

বিশ্বেশ্বর যে এইরূপ অপ্রিয় শুনিবে, ইহার জন্য সে তো প্রস্তুত ছিল না! ভ্যাবাচাকা খাইয়া বিশ্বেশ্বর চুপ হইয়া গিয়াছে—শুধু চোখ দুইটি দিয়া যেন আগুনের ফুল্‌কি বাহির হইতেছিল।

একটি ছেলে দৌড়াইয়া আসিয়া জনতার নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল—কল্‌কাতা থেকে এইমাত্র রায়েদের বাড়ীতে দই, সন্দেশ ও রাবড়ী এলো!

উৎসুক হইয়া জনতা হইতে একটি লোক আগাইয়া গিয়া বলিল, আর কি কি রান্না হচ্ছে রে ?

ছেলেটি বলিল, কল্‌কাতা থেকে দু'টো বামুন এসেছে। পোলাও, মাংস, চপ্, চিংড়ির মালাই—অনেক কিছু।

হতাশায় লোকগুলি নির্ব্বাক হইয়া ঠোঁট চাটিতে লাগিল।

একজন বলিল, কথায় বলে—পাতে পড়লেও জোটে না—আমাদের ভাগ্যও সেই রকম। গ্রামের লোকগুলি মনে মনে বিরক্ত না হইয়া পারিল না। এমন যোগাড়যন্ত্র বড় একটা কানেও শোনা যায় না।

বিশ্বেশ্বর আশা করে নাই যে, তাহাকে দস্তুরমত অপমান সহিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। লজ্জায়, অপমানে ও নিষ্ফল আক্রোশে বিশ্বেশ্বর যেন মণি-হারা ফণীর মত গজরাইতে লাগিল।

জয়া স্বামীকে অনুযোগ করিল— ওঁদের কথা অনুযায়ী স্বীকার হ'লেই পারতে। এখন উপায়! ব্রাহ্মণদের মুখের আহার এত সব কি হবে?

মাধব রায় একেই মনে মনে উত্তপ্ত হইয়া ছিলেন, স্ত্রীর কথা শুনিয়া আরো যেন জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—যা বোঝনা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে এসো না। দু'টি হাত পিঠের উপর মুড়িয়া গম্ভীরভাবে বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। একটু ভাবিয়া বলিলেন দুর্গাবতীকে, আচ্ছা বৌদি, আপনি কি বলেন,—কাজটা কি আমার অন্যায় হ'ল?

দৃপ্তকণ্ঠে দুর্গাবতী বলিলেন, না ভাই, আমার ধারণা—তুমি বুদ্ধিমানের কাজই করেছ। যা'রা মানুষকে বিপদে ফেলে নিজেদের দাবি স্বীকার করিয়ে নিতে চায়, তা'দের খাইয়ে লাভ কি? দেশের দুর্দ্দিন, কত গরিব-দুঃখী অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাদের বাদ দিয়ে, সক্ষম লোকগুলোকে খাওয়ানোর কোন মানে হয় না। মানুষতো বোঝে না, সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে শুধু—তেলা মাথায় তেল মাখিয়ে।

বাগ্‌দীপাড়া, ডোমপাড়া একেবারে শেষ হ'য়ে যাবার জো হ'ল। অনুপম, তুমি যাও বাবা। বাগ্‌দীপাড়া, ডোমপাড়া ও মালোপাড়ায় যত লোক আছে—সব ডেকে আন।

আমি বলছি ঠাকুরপো, ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন! আপনার এক রমা একশো হোক। ভগবান্ আজ নিরন্ন লোকগুলোর অন্ন মাপিয়েছেন আপনার কাছে। এর থেকে সৌভাগ্য আর কি হ'তে পরে।

মাধব রায় নীরবে দুর্গাবতীর পায়ের ধুলা মাথায় লইলেন।

দুর্গাবতী একটু হাসিয়া বলিলেন, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ঠাকুরপো—নেমন্তন্ন এত সহজে সবাই ত্যাগ করবে কি?

দুর্গাবতীর অনুমানই ঠিক হইল। খিড়কির দুয়ার দিয়া অনেকে আসিল এবং মাধব রায়কে বোঝাইল—আপনি উচিত কথাই বলেছেন। শুনে আমরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তবে কি করবো বলুন, আমরা নিরুপায়! খাজনাপত্র পাবে, তা'ছাড়া ওই হলো 'ফুড-কমিটির' সেক্রেটারী। যথাসময়ে সকলেই আহার সমাপন করিল—তবে যাইবার সময় সকলেই প্রায় বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া গেল—ব্যাপারটা যেন প্রকাশ না হয়।

অনুপমের কিন্তু আঘাতটা বড় বেশী করিয়া লাগিল। শিক্ষার অভাবে লোকগুলি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে। বিনোদ শুধু হাসিল লোকগুলির অভিনয় দেখিয়া!

অনুপম বলিল, হাসিস্ না বিনোদ। শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে ওদের নিজেদের বিচার-শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পেতে বসেছে। ওদের তো বোঝবার শক্তি নেই—তাই ওদের যত ব্যথা, লজ্জা, অপমান যেন আমি অনুভব

করছি আমার নিজের অন্তর দিয়ে। যত নষ্টের গোড়া হ'ল ওই বিশ্বেশ্বর—ওই হ'ল চাবিকাঠি।

দুর্গাবতী বারংবার উৎসুক নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিতেছিলেন—শ্যামলালের এখনও না আসিবার কারণ কি। অনেকক্ষণ বলিয়া আসিয়াছেন তাহাকে আসিবার জন্য। সে মাত্র কাল বাড়ী আসিয়াছে। তা'ছাড়া এ-বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ একটু বেশী রকমেরি, শ্যামলালের তো অজানা নহে। অথচ না আসিবার হেতুই বা কি? তাহা হইলে শ্যামলালও কি এই বিভ্রাটে যোগ দিয়াছে নাকি? ছেলের কথা মনে করিয়া দুর্গাবতী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। দুর্গাবতী অনেক আশাই করিয়াছিলেন, শ্যামলাল আসিয়া দস্তুরমত এ-বাড়ীর উৎসবে সাহায্য করিবে।

অনুপম ও বিনোদ দু'বার যাইয়া খোঁজ লইয়া আসিল—শ্যামলাল বাড়ী নাই। বেলা তিন প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বিনোদ আবার গেল শ্যামলালকে ডাকিবার জন্য। বাহিরের দুয়ার ভেজানো ছিল। বিনোদ ডাকিল—শ্যামদা।

শ্যামলাল ঘর হইতে সাড়া দিল, কে—এস এস। তুমি বুঝি অনুপমের বন্ধু? দালান দিয়ে সোজা ঘরে চ'লে এস।

ঘরের সম্মুখে আসিয়া বিনোদের যাহা চোখে পড়িল—এতখানি আশা বিনোদ করে নাই। চিঁড়ে, গুড় ও তেঁতুল সংযোগে 'ফলার' করিবার উদ্দেশ্যে বড় একখানা পাথরের বাটি লইয়া শ্যামলাল তখন আহারে বসিয়াছে।

বিনোদকে বসিবার জন্য আঙ্গুল দিয়া শ্যামলাল নিকটের জলচৌকিখানি দেখাইয়া দিল। বেশ সপ্রতিভ ভাবে দুইবার পেটে হাত বুলাইয়া শ্যামলাল বলিল, ভায়া, হঠাৎ পেটটায় গোলমাল মত হ'ল।

দু'বার বমিও ক'রলাম বুঝেছ কিনা—সেইজন্যে ভরসা ক'রলাম না তোমাদের ওখানে যাবার। কাল সকালেই আবার যেতে হবে; আজকের দিনটা একটু সাবধানে থাকাই ভাল—কি বল? তা'ছাড়া আমি হ'লাম ঘরের লোক। আজ না যাই, কাল গিয়ে চেয়ে খেয়ে আসবো।

বিনোদ বলিল, আচ্ছা, তা'হলে আসি।

দুর্গাবতী সব শুনিয়া গুম্ হইয়া থাকিলেন। শ্যাম এই অপমান তাঁহাকেই করিয়াছে। এ কথা লইয়া কেহই উচ্চবাচ্য করিল না—কারণ দুর্গাবতীকে ব্যথা দেওয়া ছাড়া আর কি।

জয়া বারংবার বলিল, শরীর যেখানে খারাপ হয়েছে, না এসে ভালই করেছে। রমা কিন্তু মুখখানাকে কালো করিয়া ফেলিল।

দুর্গাবতী মন হইতে সব চিন্তা দূরে সরাইয়া দিলেন। আঘাতের পর আঘাত পড়িয়া ক্ষতস্থান যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে।

যাহাদের খাইবার কথা, ডোমপাড়া, বাগ্দীপাড়ার লোক আসিয়া তৃপ্তিসহকারে খাইয়া দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

প্রশস্ত হল-ঘরের মধ্যে রমা খাইবার জায়গা করিল—মাধববাবু, অনুপম ও বিনোদের। দুর্গাবতী নিজে হাতে পরিবেশন করিতেছিলেন, রমা লেবুর টুকরা ও নুন দিতেছিল।

হঠাৎ খিড়কির দুয়ারে আবার ঠেলা পড়িল। বিনোদ বিরক্ত হইয়া উঠিল, আচ্ছা ঝঞ্ঝাট যাহোক! খাবার ইচ্ছা ষোলো আনা, শুধু সৎ সাহসের অভাব।

অনুপম উঠিয়া দুয়ার খুলিতে গেল।

দুর্গাবতী বলিলেন, যাহোক জামাই পেয়েছিলেন বটে! তপস্যা ছিল আপনার।

মাধববাবু বলিলেন, হ্যাঁ তা' সত্যি, রমা যদি ওর বাবাকে ভুলে যায়, তা' অনু ভুলবে না। এই বলিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া তির্য্যক্ দৃষ্টিতে রমার পানে চাহিলেন।

রমা সে কথা শুনিয়া কৃত্রিম অভিমানভরে থালাখানা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মাধববাবু ডাকিলেন—শোন্ শোন্ পাগলী কোথাকার।

বিনোদ হাসিয়া বলিল, রমা দেবীর রাগ কিন্তু অন্যায় নয়; বরং হওয়াই স্বাভাবিক। এই তো আমারই রাগ হয়েছে। শুধু সুখ্যাতিটা যদি এক তরফের হয়—তাহ'লে আমরা কি দোষ ক'রলাম।

বিনোদের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

দুর্গাবতী বলিলেন, হীরের আংটির আবার সুখ্যাতির কি দরকার বাবা! সে যে নিজের জ্যোতিতে নিজেই সমুজ্জ্বল।

সকলের মুখের কথা থামিয়া গেল—অনুপম যাহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল তাহাকে দেখিয়া। স্বয়ং মাধব রায়ও বুঝিতে পারিলেন না—কি ব্যাপার! আবার কোন ঝঞ্ঝাট লইয়া উপস্থিত হইল নাকি?

বিশ্বেশ্বর নিজেই প্রথমে কথা বলিলেন, মাধব রায়কে লক্ষ্য করিয়া। তুমি তো দাদাকে ছেড়ে দিলে কিন্তু আমি পারলাম কই? হাজার হ'লেও তোমরা অনেক ছোট, তোমাদের সব কিছুই সাজে। তোমরা সব কিছু করতে পারো এবং বলতেও পারো। কিন্তু, আমি যেখানে বড় সেখানে আমার তো একটা কর্ত্তব্য আছে।

মাধব রায় বলিলেন, আমি তো সর্ব্বপ্রথমে আপনার কাছেই যাই। আপনাদের ছাড়তে কি আমার ইচ্ছা। কিন্তু আপনারা যদি আমায় ত্যাগ করেন, তাহ'লে কি ক'রতে পারি বলুন?

বাধা দিয়া বিশ্বেশ্বর বলিলেন, রামচন্দ্র! কি যে বল, ঠিক নেই। কথায় বলে ভা'য়ের মত বন্ধু নেই। তোমার বাবা জ্যোতিশ কাকা আর আমার বাবা একেবারে অভিন্ন-হৃদয় ছিলেন। আর আমরাও পর ভাবিনে। আজ তোমার মনের দৃঢ়তা দেখে প্রশংসা না করে' পারছি না। প্রায়শ্চিত্ত কেন করবে! হাত দু'খানি উল্টাইয়া আবার বলিলেন, আমি আর কি করি বল। পাঁচজনের ব্যাপার, ওদের মতেই সায় দিতে হয়। ভগবানের অনুগ্রহে বড় যেখানে হয়েছি সেখানে বাধ্য হয়েই ঝড় ঝাপট্ সইতে হবে বৈকি। সমাজে বাস করতে গেলে একটু নিয়ম মান্‌তে হয়। তবে আমি কি আর ন্যায় অন্যায় বুঝিনে। বার মাস থাকতে হয় ওদের নিয়ে, ওদের মত অনুযায়ী চলাটা আমার কর্ত্তব্য।

হঠাৎ দুর্গাবতীকে দেখিয়া বিশ্বেশ্বর আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। কাহারো দৃষ্টি এড়াইল না।

মাধব রায় বলিলেন, উনি হলেন বউদি, শ্যামের মা। শ্যাম অবশ্য আপনাদের দলভুক্ত, কিন্তু শ্যামের মা আমাকে ত্যাগ ক'রতে পারলেন না। উনিও আমার জাত মেনে নিলেন: আজকের অনুষ্ঠানে যাবতীয় কাজকর্ম্ম সবই শ্যামের মা করেছেন। বউদি আমাদের স্বয়ং অন্নপূর্ণা। বউদি যদি না থাক্‌তেন তা'হ'লে গ্রামের মায়া আমি আজই ত্যাগ করতাম। বউদিকে দেখে আমার মাকে মনে পড়লো।

দুর্গাবতী ফিস্ ফিস্ করিয়া অনুপমকে দিয়া বলাইলেন, 'জ্যাঠাইমা বলছেন, আপনি যদি একটু মিষ্টি মুখ করেন।' তারপর একটু উচ্চকণ্ঠে দুর্গাবতী নিজেই বলিলেন, ভরা দুপুরে ব্রাহ্মণ জল না খেয়ে গেলে গেরস্তর অকল্যাণ হয়! যদি অমত না করেন ঠাকুর ঘরে জায়গা ক'রে—ভাল মিষ্টি যা' তোলা আছে আমার জন্যে—তাই না হয় আপনাকে একটু দিই।

কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিলেন, না না, রামচন্দ্র!—

দুপুরবেলায় না খেয়ে ফিরব তাই বা কে বল্‌লে? ভায়া যেখানে এত আয়োজন করেছে—না খেলে কি চলে? দাও মা রমা আমার একখান্ ঠাঁই করে। আসুন বৌঠান্, কিন্তু অল্পে ছাড়বো না। বুঝলে বাবাজী, আমি বস্‌লে সহজে উঠতে চাই না। মিষ্টিও ছাপ্পানোর কমে যাই না। আমার বদনাম আছে—এই বলিয়া নিজেই হাসিয়া উঠিলেন।

মাধববাবু বলিলেন, বেশ তো, সে আমার সৌভাগ্য! যোগাড় তো আপনাদের জন্যেই করা।

চপ্, কাটলেট ইত্যাদির পর—দই, মিষ্টি লইয়া বিশ্বেশ্বরের কি আনন্দ! স্পঞ্জ রসোগোল্লা—টপাটপ্ করিয়া গিলিয়া খাইলেন। বকুনির মুখে ঠাণ্ডা আইস্‌ক্রিম সন্দেশগুলোও লাগিল অমৃতের মত। রাবড়ীও এক ভাঁড় খাইয়া ফেলিলেন। সাত রকমের মিষ্টি প্রায় চৌদ্দ গণ্ডা খাইয়া পেটে হাত বুলাইয়া আহার সমাপ্ত করিলেন। বেশ বেশ, তোমাদের আয় উন্নতি হোক, দেখেই তৃপ্তি। যাইবার সময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, আমি তো খুব খেলাম বাপু। বীণির ছোট মেয়ে আন্নাটা বড় লোভীষ্টে হয়েছে। কই গো মা রমা,—দুটো ওই ঠাণ্ডা মিষ্টি।

অনুপম বলিল, আপনি দাঁড়ান—আমি আনছি। মাটির জায়গা করিয়া এক হাঁড়ি সন্দেশ লইয়া অনুপম বিশ্বেশ্বরের হাতে দিল।

এতগুলি মিষ্টির মায়া ত্যাগ করাও কঠিন, অথচ লইয়া যাওয়াও বিপদ। উভয় সঙ্কটে পড়িয়া বিশ্বেশ্বর হতাশার চাহনিতে শুধু এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন, আর এক একবার লোলুপ দৃষ্টিতে হাঁড়ির পানে চাহিতে লাগিলেন।

বিনোদ পিছন ফিরিয়া হাসিতে লাগিল। এ সব দেখা তার এই প্রথম। মাধব রায়ও কাজের অছিলায় বাহির হইয়া গেলেন।

শুধু অনুপম কিন্তু গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া একখানা চাদর আনিয়া দিল। এটা গায়ে দিয়ে হাঁড়িটা ঢেকে নিয়ে যান। বাগানের পথ দিয়ে চলে যাবেন, কেউ দেখতে পাবে না। তা'ছাড়া আপনিই তো গ্রামের হর্তাকর্তা। চলুন, খিড়কির দুয়ার খুলে দিইগে, ঝি-চাকর ওদিকে এখন কেউ নেই।

কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে বিশ্বেশ্বর চাহিলেন অনুপমের মুখের দিকে! তারপর চারিদিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, কিন্তু শ্যামলালের মা?

একটু হাসিয়া অনুপম বলিল, না, ওঁকে কোন ভয় নেই। আপনার নিজের থেকে ওঁর উপরে বিশ্বাস আপনি নির্ভয়ে ক'রতে পারেন। আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি নিজে, এ-বাড়ী থেকে আপনার কোন ভয় নেই।

খিড়কির পথ দিয়া হাঁড়িটিকে বুকে লইয়া বিশ্বেশ্বর নীরবে কচার বেড়া ডিঙ্গাইয়া আপনার সীমানায় গিয়া পৌছাইলেন। শুধু একটি ছেলের দৃষ্টি এড়াইল না। ছেলেটি অবশ্য বিশ্বেশ্বরেরই দলস্থ একজনের। সেও বোধ হয় ওৎ পাতিয়াই বসিয়াছিল।

ছুটিয়া গিয়া হাবু পিতাকে বলিল। বলিতেই হাবুর মা বলিল, আমি আগেই জানি, বিট্‌লে বামুন কম নয়। বামুন নিজে গিলে এল, আবার ছেলেমেয়ের জন্য বেঁধে আন্‌ল। শুধু তোমাদের খেতে দিলে না। অয়ে সেবার তুমি কি রকম বরফ বরফ করেছিলে, লোক অভাবে আনাতে পারিনি। রমার বাবা নাকি বরফের সন্দেশ আনিয়েছে।

সবাই মিলিয়া হতাশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু অদৃষ্টের দোহাই দিল।

... ...

ইচ্ছা করিয়াই সেদিন অনেকখানি রাত করিয়া দুর্গাবতী বাড়ী ফিরিলেন। শ্যামলাল তখন আবার রাত্রের আহারের জন্য চিঁড়ের জল

দিতেছিল। চিঁড়ের হাঁড়িতে, জলের কলসীতে, গুড়ের ভাঁড়ে একাকার। দুর্গাবতীকে দেখিয়া শ্যামলাল দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

যাক, তা'হ'লে বাড়ী এলে—সময় তা'হ'লে হ'ল।

স্থিরকণ্ঠে দুর্গাবতী বলিলেন, বাড়ী না আসার তো কোন কারণ নেই, শুধু সময় হয়নি ব'লে আসতে পারিনি। কাজের বাড়ীতে গেলে সাধারণতঃ একটু দেরিই হয়—ঝঞ্ঝাট মিটল, চলে এলাম। তা' তোমার কি এবেলাও চিঁড়ে গুড় চল্‌বে নাকি?

শ্যামলাল বিরক্তির সহিত উত্তর দিল, তা' ছাড়া আর আমার অদৃষ্টে কি জুটতে পারে। এ ছাড়া আমি আশাই বা কি ক'রতে পারি, বল?

দুর্গাবতী বলিলেন, তুমি ওদের বাড়ী গেলে না কেন? কি কারণ ছিল—যার জন্যে তোমার সাধারণ ভদ্রতা পর্যান্ত লোপ পেল!

স্থিরকণ্ঠে শ্যামলাল বলিল, কেন যাইনি তা'তো তুমি জান।

দুর্গাবতী বলিলেন, তুমিও কি তা'হলে ওদের দলের মধ্যে নাকি?

স্বাভাবিক স্বরে শ্যামলাল বলিল, তা'ছাড়া আবার কি।

দুর্গাবতী বলিলেন, কিন্তু তোমার মা, বউয়ের ভরসাই হলো ওরা। যখন তোমার বউ ভীষণ কাহিল, কোথায় তখন ছিলে তুমি, আর তোমার প্রতিবাসীরা?

শ্যামলাল উত্তর দিল, সমাজে বাস ক'রে তো আর একঘরে হ'তে পারিনে।

দুর্গাবতী বলিলেন, তোমার তা'হলে সমাজই বড় হ'ল, কি বল?

শ্যামলাল বিস্ময়ে মায়ের পানে চাহিয়া বলিল, বড়—মানে? সমাজে বাস করে সমাজের বিধি মেনে চলবো না—এর মধ্যে আবার অন্যায় কি দেখলে।

দুর্গাবতী বলিলেন, কল্‌কাতার যে মেসে খাও তুমি, সে সব বোধ হয় ভাটপাড়ার বামুনবাড়ী—কি বল ?

শ্যামলাল উত্তর দিল, সে বিদেশ—সেখানকার কথা বাদ দাও।

দুর্গাবতী বলিলেন, তুমি তা'হ'লে আমার সম্মানটা বড় করে' দেখনা, কেমন ?

শ্যামলাল বলিল—কি আশ্চর্য্য ! অন্যায় জিনিস স্বীকার না ক'রলেই হবে তোমাদের অপমান ! তোমরা তো গিয়েছিলে, কই আমি তো কৈফোৎ চাচ্ছিনা। তুমি যা' যা' ভাল বুঝেছ ক'রেছ,—আমি যা' বুঝেছি ক'রেছি।

বেশী কথা বাড়াইতে আর দুর্গাবতীর প্রবৃত্তি হইল না। তা'ছাড়া বলিবারই বা কি আছে। নীরবে রান্নাঘরে যাইয়া উনান ধরাইলেন। রান্না সমাপ্ত হইলে পুত্রকে ডাকিয়া আহারে বসাইলেন। মাতা, পুত্র দু'জনেই নীরবে নিজের কর্ত্তব্য সারিলেন।

অনেক রাত্রিতে সারাদিনের ক্লান্তিতে দুর্গাবতীর শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। যখন বিছানায় গিয়া আশ্রয় লইলেন, আপনার অজ্ঞাতে চোখ দু'টি সজল হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে শ্যামলাল যখন কলিকাতায় যাইবে দুর্গাবতী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমাকে আনার কি হবে ?

শ্যামলাল উত্তর দিল, আমি কি জানি। আমার মত নিয়ে তো পাঠাওনি, আর তা'ছাড়া তাড়াতাড়িই বা কি। এইতো সবে গেল। মাস পাঁচ ছয় থাকুক্। এখানে এলেও তো আবার মন ভাল থাকে না—তখন তুমিও তো ব্যস্ত হও।

শ্যামলাল চলিয়া যাইবার পর সেদিন সারাদিনই দুর্গাবতীর মন ব্যথায় ভরিয়া থাকিল। শ্যামলাল যেন তাঁহার কাছ হইতে বহুদূরে। কত কষ্টের, কত দুঃখের শ্যামলাল, তাহার কাছ হইতে এই ব্যবহার, এ যেন সহ্যের বাহিরে।

বিনোদ ও রমা লোকগুলির কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া অস্থির। বিশেষ করিয়া বিশ্বেশ্বরের ব্যাপার মনে পড়িলে হাসি চাপিয়া রাখা দায়।

রমা বসিয়া গ্রামের সবিশেষ ঘটনাগুলি বিস্তারিত করিয়া ভারতীকে চিঠি লিখিতে বসিল। অবশ্য চিঠিতে শ্যামলালের কথা বাদ দিয়াই লিখিল। সব শেষে লিখিল, কবে তুই আস্‌বি। মা, বাবা, ভাইবোনদের পেয়ে আমাকে বোধ হয় ভুলেই গেছিস্‌।

বিনোদ বলিল, চলুন রমা দেবী, খোলা ছাদে গিয়ে একটু তাস খেলা যাক্‌। আপনি অনুকে ডেকে আনুন। আজ রাতে আর ঘুমুবোনা। রাত তিনটেয় ট্রেন। কাল্‌কের ট্রেনটা ফেল্‌ করে সত্যিই খুব ক্ষতি হ'ল।

চিঠি সমাপ্ত করিয়া রমা আসিল অনুপমের কাছে। চল ছাদে, বিনোদবাবু বলে' গেলেন। আচ্ছা, তুমি এত বিমর্ষ কেন? স্বামীর অবিন্যস্ত মাথার চুলগুলির মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে রমা প্রশ্ন করিল। এমন একটা হাসির কাণ্ড ঘটে' গেল, কোথায় হাস্‌বে, গল্প ক'রবে—তা' না। বিনোদবাবুই বা কি ভাব্‌ছেন।

রমাকে অতি সন্নিকটে পাইয়া রমার হাত দু'টি ধরিয়া অনুপম বলিল, না রমা—হেসনা, বরং বুঝ্‌তে চেষ্টা করো লোকগুলির পরিণতি দেখে!

রমা বলিল—এ কিন্তু তোমার অন্যায়। যারা ইচ্ছা করে' বদ মতলব তৈরী করে' মানুষকে ফ্যাসাদে ফেল্‌বার চেষ্টা করে, তাদের ওপরে আবার সহানুভূতি কি থাকতে পারে!

অনুপম বলিল, আমার কি ইচ্ছা হয় জানো রমা। যদি কোন দিন আমার অনেক টাকা হয় তা'হলে এ গ্রামে এমন একটা কিছু শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়্‌বো—যার ভার থাক্‌বে আমার নিজের হাতে। আমি বসে মেজে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌বো—এরা সত্যিই খারাপ, না এদের শিক্ষার অভাব। আর সেই কাজে বিনোদ থাক্‌বে আমার সহকারী হয়ে'।

স্বামীর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া রমা বলিল—আচ্ছা, সে তো পরের কথা, এখন চল—বিনোদবাবু বেচারা একা বসে' আছে—কি ভাব্‌বে।

… … … …

অরূপ রোজ সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা করিয়া ভণ্টুর কাছে পড়ে। সকালের দিকে উর্ম্মি পড়ে। বাহাদুরও সময়মত খানিক পড়ে। বাকী সময়টুকু ভণ্টু আপনার পড়ায় মন দেয়। উর্ম্মিকে ও অরূপকে আবার সময় মত একঘণ্টা করিয়া দেশ বিদেশের গল্পও বলিতে হয় ভণ্টুকে—বাহাদুর চুপ করিয়া শোনে।

আর্ট্‌স্কুলে ভণ্টু ঠিক সময় মত যায় ও একঘণ্টা শিখিয়া আসে। যদিও ভণ্টুর কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য সময় সময় ইচ্ছা হয়—কিন্তু একে তো সময়ের অভাব—তারপর পরের চাকুরি, কি জানি কোন মুহূর্ত্তে যদি কৈফিয়ৎ চায়! প্রয়োজন নাই দীনতা স্বীকার করিয়া পরের অনুগ্রহের পাত্র হইয়া কলেজে পড়ার। সে বরং নিজে স্বাধীন-ভাবে প্রাইভেটে এম্‌, এ, পরীক্ষা দিবে—যে ভাবে বি, এ, পাস করিয়াছিল।

সেদিন দুপুরে বসিয়া ভণ্টু রং লইয়া উর্ম্মির একখানা ছবি আঁকিতেছিল।—অতর্কিতে কাল বৈশাখীর কালো মেঘ আসিয়া শুভ্র আকাশকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। প্রচণ্ড ঝড় উন্মত্ত অবস্থায়

লুটাইয়া পড়িতেছে। ঝড়ের সেই ছিন্নভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া গাছগুলি পরস্পর পরস্পরে মাথা ঠোকাঠুকি করিতেছে, আর কতকগুলি পক্ষী-শাবক গাছের উঁচু ডালে তাদের বাসায়—ভীত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে বারংবার প্রকৃতির সেই তাণ্ডব-লীলা। অবিশ্রান্ত জল ধারায় দূর দিগন্ত শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর তাহারই মাঝে আকাশের বুক চিরিয়া এক একবার বিদ্যুতের তীব্র আলো দেখা যাইতেছে—। উর্ম্মি সেই জল ঝড়ের মধ্যে পথ হারাইয়া দিশেহারা হইয়া এদিক, ওদিক চাহিতেছে। ভয়ার্ত্ত মুখের উপর আশ্রয় সন্ধানী কালো চোখ দু'টিতে ব্যাকুলতার স্পষ্ট চিহ্ন।

ভণ্টু আপন মনে উর্ম্মির কল্পিত ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে। আর একটু খাটিলেই ছবিখানা সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।

নীচে বাহাদুর শুইয়া ঘুমাইতেছে। রাত্রে সিনেমায় না থিয়েটারে কোথায় যাইবে—অবশ্য ভণ্টুর মত লইয়াছে। তাই বোধ হয় একটু ঘুমাইয়া রাত্রির ক্লান্তি কিছু লাঘব করিয়া লইতে চায়।

ছবিখানা শেষ না করিয়া ভণ্টু আজ উঠিবে না। নীরবে কখন যে অরূপ আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে—ভণ্টুর তাহা লক্ষ্য পড়ে নাই। ধ্যান-মগ্ন ঋষির মত একাগ্র মনে ভণ্টু বসিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। সমস্ত গা বাহিয়া ঘামের ধারা নামিয়াছে।

অরূপ অবাক হইয়া দেখিতেছিল,—মাষ্টার মশাই যে এত সুন্দর ছবি আঁকিতে পারেন—অরূপ তো এতদিন জানিতো না। অরূপ ধীরে ধীরে যাইয়া পাখা খুলিয়া দিল। অসহ্য গরমের মধ্যে হঠাৎ হাওয়া গায়ে লাগিতেই ভণ্টু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—আ, বাঁচালি বাহাদুর। চোখ ফিরাইয়া কি বলিতে গিয়া নজর পড়িল অরূপকে।

ব্যস্ত হইয়া ভণ্টু উঠিতে গেল, অরূপ বাধা দিয়া বলিল, থাক, আমি কোন দরকারে আসি নি। আজ জন্মাষ্টমীর ছুটি, তাই···

এইবার অনুযোগের সুরে অরূপ বলিল, আপনি এমন সুন্দর ছবি আঁক্‌তে পারেন—কই, বলেন নি তো এতদিন!

ভণ্টু বলিল, একে কি ছবি আঁকা বলে! চুপ ক'রে বসে' থাকি, সময় কাটেনা—তাই ছেলেখেলা করি আর কি!

বাহাদুর নিশ্চিন্ত মনে একটা বড় রকমের হাই তুলিয়া ঘুম হইতে উঠিয়া বসিল। ইদানীং অরূপকে দেখিয়া বাহাদুর আগের মত বিব্রত হয় না।

ভণ্টু হাসিয়া বলিল, কি বাবা—ঘুম ভাঙ্‌লো?

বাহাদুর শুধু একটু হাসিয়া নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

অরূপ বলিল, বাহাদুর বরফ দিয়ে দু'গ্লাস সরবৎ নিয়ে আয়তো? তোর কাছে সিরাপ আছে তো—না, ভেতরে যেতে হবে?

বাহাদুর বলিল, না—কালকেই দু'টো সিরাপের বোতল এনেছি।

অরূপ জিজ্ঞাসা করিল—কিসের সিরাপ?

একটা গোলাপ আর একটা লেবুর।

অরূপ ডাকিল, মাষ্টার মশাই—কোন্‌টার সরবৎ ক'রবে?

ভণ্টু বলিল, তোমার যা' ভালো লাগে ক'রতে দাও।

অরূপ বলিল বাহাদুরকে, তাহ'লে লেবুরটাই করে' আন্‌। অরূপ ছবিখানি আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, মাষ্টার মশাই—আপনার যদি অমত না থাকে তাহ'লে আমি একবার মাকে ছবিখানা দেখিয়ে আন্‌বো?

ভণ্টু বলিল, মা দেখ্‌বেন এতে আর অমতের কি থাক্‌তে পারে ভাই! তবে সামান্য জিনিস্‌—মাকে দেখানো ঠিক হবে কি?

অরূপ বলিল, সামান্ত কি বল্‌ছেন! আপনি ধারণা ক'রতে পারছেন না কি চমৎকার হয়েছে! এবার 'এক্স্‌মাসের এগ্‌জিবিসনে' আমি পাঠাবো। যদি এ' ছবি আপনার ফার্ষ্ট্‌ না হয় তাহ'লে বুঝ্‌বো আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অরূপ আবার বলিল, আপনার কিন্তু কাজ বাড়্‌লো মাষ্টার মশাই।

ভণ্টু গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল—তোমরা যদি ভালবাস আমার এই সামান্ত ছবিগুলোকে, তা' হ'লেই তো আমার শ্রম সার্থক হয় অরূপ।

অরূপ বলিল—অদ্ভুত আপনার তুলির হাত! উর্ম্মিকে এমন সুন্দর করে' এঁকেছেন—আশ্চর্য্য! উর্ম্মির চোখের নীচে ছোট একটা আঁচিল আছে, সেটা দিতেও ভোলেন নি! নিখুঁত সুন্দর হ'য়েছে।

বাহাদুর 'ট্রেতে' করিয়া দু'গ্লাস সরবৎ এবং সেই সঙ্গে ছোট পাথরের রেকাবিতে কিছু ফল আনিতেও ভোলে নাই।

ভণ্টু হাসিয়া বলিল, দেখ্‌লে তো অরূপ—তোমার ফরমাশ ছিলো শুধু সরবৎ—বাহাদুর কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট হয়নি—গরমের সময় সরবৎএর সঙ্গে রুচি-মাফিক ফলের টুকরোগুলোও আন্‌তে ভোলেনি। সরবৎ ও ফল খাওয়ার পর তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতেই—বাহাদুর মশলার ডিস্‌ লইয়া হাজির। ভণ্টু ও অরূপ না হাসিয়া পারিল না।

অরূপ বলিল, মাষ্টার মশাই, মা বল্‌লেন—'চিত্রায় একটা ভাল বই হচ্ছে।' সিনেমায় যেতে যদিও একটুও ভাল লাগে না কিন্তু মা বল্‌ছেন—'ভাল বই মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত।' তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—কি ক'রবো?

ভণ্টু বলিল, আমিও তো সিনেমা দেখি না, কিন্তু মা যেখানে বলেছেন সেখানে আর আমার মতামতের কি দরকার।

অরূপ ভণ্টুর মত পাইয়া বাহাদুরকে বলিল,—সরকার মশাইকে বলগে 'ফোন' ক'রতে একখানা বক্সের জন্যে।

ভণ্টু বলিল—উর্ম্মিকে নিয়ে গেলে হয় না?

অরূপ বলিল, আজ জন্মাষ্টমী, উর্ম্মি বসে' পাঁড়েজীর সঙ্গে লাল, নীল কাগজ দিয়ে ময়দার লেই ক'রে শেকল তৈরী ক'রছে।

ভণ্টু বলিল—আজ না হয় থাক তবে।

অরূপ বলিল—ন'টার মধ্যে এসে পড়বো'খন।

দিন এবং রাত বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। বাড়ীতে জন্মাষ্টমীর উৎসব বেশ আনন্দের সহিত সমাপন হইল। খড় সবুজ রঙে ছোপাইয়া ঘাস তৈরী করা হইয়াছিল—তাহারই পাশ দিয়া চিত্রিত যমুনা বহিয়া চলিয়াছে। আর তাহারই আশেপাশে পাথরের গরুগুলি সাজানো রহিয়াছে—যেন চরিতেছে। সর্ব্বোপরি স্প্রিংএর দোলনায় চড়িয়া গোপালজীর—দোল-খাওয়া রীতিমত চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হইয়াছে। আরো কত ভাবে সাজানো—ভণ্টুর মনে পড়ে না।

উর্ম্মিও ভারি সুন্দর ভাবে সাজিয়াছে। মাথায় বোধ হয় সাবান দিয়াছিল—চুলগুলি রুক্ষ হইয়া আরো যেন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। মাথায় রূপার পাতের মত চওড়া ফিতা বাঁধিয়াছে। কপালের উপর একটা ভাটিয়া টিপ্। প্রজাপতির ডানার মত ফ্রকের সাদা থাক দেওয়া জরি লাগানো ফ্রিল্‌গুলি যেন উর্ম্মিকে নাচাইয়া লইয়া চলিয়াছে। প্রজাপতির মত চঞ্চল হইয়া উর্ম্মি চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া ঘুরিতেছিল। ভণ্টুকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া ভণ্টুর হাতখানা চাপিয়া ধরিল—ঘরের এক কোণে পাতা কার্পেটের উপর লইয়া গিয়া বসাইল। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন। ভণ্টুর তো নাকালের একশেষ! গোপালজী

এবং গোপালজীর চোদ্দপুরুষের ইতিহাস ভণ্টুকে বলিতে হইল।— আচ্ছা মাষ্টারমশাই, গোপালজীও তো লেখাপড়া ক'রতেন না—কিন্তু ধরুন, তবু তো আমরা তাঁকে ভালবাসি—কেমন কিনা? আমারও আজকাল মোটেই পড়্‌তে ভালো লাগেনা—কেবল সকলে বকে, তাই। দিদিভাই লেখাপড়া ভালো করে বলে' সবাই কি সুখ্যাতি করে। আই, এ, পাস করেছে বলে'—মেয়ের আরো যেন গর্ব্ব ধরে না। পিসিমণি একটা ভাল হাত ঘড়ি দিয়েছেন দিদিভাইকে।

বাড়ীতে অনেক ভদ্রমহিলা আসিয়াছেন। প্রতুল ও শুক্লার সাজানোয় রুচি আছে—সকলেই তারিফ করিতেছিল। ঠাকুর ঘর এবং আসর শুক্লা নিজে সাজাইবার ভার লইয়াছিল এবং প্রতুলও রীতিমত সাহায্য করিয়াছিল।

শুক্লা সত্যিই সুন্দরী। যাহারা পূর্ব্বে দেখে নাই তাহাদের তো বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া মনেই হইবে না। খুব পাত্‌লা যোগিয়া রংএর শাড়ির চওড়া রূপালি আঁচ্‌লা ঘেরিয়া আছে সমস্ত দেহটিকে শুক্লার। গায়ের রংএর জৌলসে পাত্‌লা কাপড় ফুটিযা রং যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। কানে দু'টি মুক্তার টাব। গলায সাদা ডিমের আকারের দামী পাথরের মালা। শুভ্র, সুডৌল বাহুর মনিবন্ধে খুব সরু একগাছি করিয়া চুড়। ঠাকুর ঘরে জুতা পরা নিষেধ, সেইজন্যে পরিযাছে—জাপানী ঘাসের চটি। মাথার দুই দিকে দুইটি বেণী ঝুলিয়া পড়িয়াছে কাঁধের বেড়্‌ দিয়া বুকের উপর।

উর্ম্মি আস্তে আস্তে মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করিল—দিদি দেখ্‌তে বেশ সুন্দর, না?

ভণ্টু বলিল, তোমার থেকে নয়কো।

মনে মনে খুব খুশি হইয়া উর্ম্মি বলিল, দিদির রংটাই ফর্সা—আমার মুখখানা ভীষণ ভালো।

ভণ্টু একটু হাসিয়া বলিল—কে বল্‌লো ?

উর্ম্মি বিস্ময়ের সহিত বলিল, ওমা—বল্‌বে আবার কে না ? তা'ছাড়া আমি তো নিজেই জানি—কি সুন্দর আমার মুখখানা ! এত সুন্দর লাগে আমার মুখখানা—কি বল্‌বো মাষ্টার মশাই ! সকালে উঠেই আমার মুখখানা আয়নায় দেখি। আপনার কেমন লাগে মাষ্টার মশাই আমার মুখটাকে ?

ভণ্টু হাসিয়া উত্তর দিল, তুমি যেখানে আয়নায় দেখ—সেখানে তুমি তো আর সব সময়ে দেখ্‌তে পাওনা তোমার মুখখানাকে। আর আমি দেখি উর্ম্মিরাণীকে সব সময়ে। আমার যে কি ভালো লাগে এই মুখখানাকে তা' বলে' বোঝাতে পার্‌বো না। এমন সুন্দর মুখ আমি আর কক্ষণো দেখিনি।

একটু ভারিক্কের ভঙ্গিতে উর্ম্মি বলিল—এই জন্যেই আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি।

ভণ্টু বলিল, উর্ম্মিরাণীর সুন্দর মুখের কথা আমি আমার মা বউদিকে লিখেছি।

একটুখানি ভাবিয়া উর্ম্মি বলিল, কিন্তু সকলে বলে দিদি নাকি খুব সুন্দর। যাক্‌গে, আমার ভাললাগে আমাকে আর আপনারও লাগে, ফুরিয়ে গেল। পরের কথা আমরা শুনবো না, কি বলুন ? আচ্ছা, আপনার বউদি কোথায় মাষ্টার মশাই ? আমার কিন্তু বউদি নেই, আপনার বউদিকে আমি বউদি বলবো, বেশ।

সস্নেহে উর্ম্মির পিঠে হাত বুলাইয়া ভণ্টু বলিল, খুব ভাল কথা। লক্ষ্মী উর্ম্মিরাণীর সঙ্গে বউদি ভাব ক'রলে কত আনন্দ পাবেন।

আপনার বউদির কি নাম ?

ভারতী দেবী।

উচ্ছ্বসিত হইয়া উর্ম্মি বলিল, বা রে, কি সুন্দর নাম! উর্ম্মির কথায় বাধা পড়িল।

ডোরা—

ওইযে দিদিভাই ডাকছে। যদি বসে' আমায় একটু গল্প ক'রতে দেয়। আপনার সঙ্গে বসে' গল্প কর্‌ছি, মেয়ের অম্‌নি হিংসে হয়েছে।

ভণ্টু বলিল, গল্প তো অনেক হলো, এইবার যাও, ডাক্‌ছেন শোন গে।

উর্ম্মি বলিল, আহা, আপনি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, দিদিভাই ডাক্‌ছে গানের জন্যে।

যার জন্যেই ডাকুন, গুরুজন ডাক্‌লে সঙ্গে সঙ্গে যেতে হয়, না হ'লে পাপ হয়।

উর্ম্মি দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। পাপকে উর্ম্মির ভয় খুব।

অনেক রাতে ভণ্টু বিছানায় গিয়া শুইল। খোলা জানালা দিয়া একরাশ জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানার উপর পড়িয়াছে। দূরে কোথায় বোধ হয় যাত্রা হইতেছিল—রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কোলাহলের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। বাহাদুর তখনো আসে নাই। বাহাদুর আজকাল প্রায়ই ভণ্টুর ঘরের মেঝেয় শোয়।

হঠাৎ বাহাদুরের সাড়া পাওয়া গেল। বাহাদুর খুব আস্তে আস্তে ডাকিল—বাবু ঘুমুচ্ছেন ?

ভণ্টু উত্তর দিল, আস্‌বি বাহাদুর, দুয়োর খুলে দেব ?

আপনার অসুবিধা হবে না ?

ভণ্টু উঠিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তারপর বলিল, কি রে, যাত্রা দেখা হ'য়ে গেল ?

বাহাদুর একটু হাসিয়া বলিল, না। যাত্রা দেখ্‌তে যাইনি। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল, কাল সে দেশ থেকে এসেছে। তার বাসা ধর্ম্মতলায়—সেইখানে গিয়েছিলাম। সৎমা নাকি আবার আমার ছোট বোন কাঞ্চীকে কষ্ট দিচ্ছে। কাঞ্চীকে খেতে পর্য্যন্ত দিচ্ছে না। কাঞ্চী চারদিন শুধু 'ইস্‌কোসা' খেয়ে ছিল। আপনি যদি আমায় এক হপ্তার ছুটি দেন বাবু, তা'হলে রাণীমাকে বলে' আমি একবার দেশে যাই—কাঞ্চীর একটা ব্যবস্থা করে' আসি।

কথা কয়টি বলিতে বাহাদুরের গলা যেন কাঁপিয়া উঠিল। বোনের বেদনায় বাহাদুর যেন ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। ভণ্টুর বুঝিতে দেরি হইল না।

বাহাদুর আবার বলিল, সৎমার একটা মেয়ে হয়েছে কিনা, তাই আর কাঞ্চীকে দেখ্‌তে পারে না।

ভণ্টু বলিল, তবে যে তুই সেদিন বল্‌লি—লামার কথা না শুন্‌লে বুদ্ধের কোপে পড়্‌তে হয়।

বাহাদুর বিমর্ষ মুখে বলিল, সৎমা বোধ হয় পেত্‌নীকে পুজো দিয়ে দোষ কাটিয়ে নিয়েছে। পেত্‌নীকে যে বুদ্ধও ভয় করে। সেইজন্যে লামা আর কি ক'রবে।

ভণ্টু অবাক হইয়া বলিল, পেত্‌নীর আবার পুজো কিরে ? যা, কি সব বাজে বল্‌ছিস।

বাহাদুর কপালে হাত দিয়া বলিল, ওকথা বল্‌বেন না বাবু! সে ভারি সাহসের কাজ! অাম-বর্ষার রাত হওয়া চাই, শনি কি মঙ্গলবার হওয়ার দরকার। সারাদিন উপোস ক'রে, এলো চুলে দু'টো মুরগী

নিয়ে যেতে হবে সেই পেত্নী যেখানে নাচে—সেই তিন কোশ দূরে। মুরগীর মুখ চেপে ধরে' নিয়ে যেতে হবে। মুরগী ডাক্‌লে চল্‌বে না—তা'হলে আর যেতে নেই। সেখানে নিয়ে গিয়ে সেই বেদীর ওপর মুরগী দু'টো ছেড়ে দিতে হবে আর সেই সঙ্গেই একটা মাদল নিয়ে বাজাতে হবে। সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে যদি মুরগী দু'টো নাচে তা'হলে বুঝ্‌তে হবে পেত্নী সন্তুষ্ট হয়েছে। আর যদি মুরগী দু'টো না নাচে, তা'হ'লে বুঝতে হবে পেত্নী ও মুরগী নেবে না, আর মানসও সিদ্ধ হলোনা। যদি মুরগী নাচে তা'হলে মুরগী দু'টোকে কেটে বেদীর ওপর রক্ত ছিটুতে হবে—আর পেত্নীকে ডাক্‌বার জন্যে মন্তর পড়্‌তে হবে। রক্ত পড়া বন্ধ হ'লে কাটা মুরগীর চার টুক্‌রো নিয়ে বনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। দু'টো শেয়াল হ'য়ে পেত্নী এসে কাটা মুরগী নিয়ে যাবে।

ভণ্টু বলিল, কি সব বল্‌ছিস! এই কখনো সম্ভব!

বাহাদুর ভয়ে ভয়ে বলিল, না বাবু, ওকথা বল্‌বেন না।

সৎমা সেই কাজই করেছে। মুরগীই নাচিয়েছে।

আচ্ছা, এখন তাহ'লে ঘুমো বাহাদুর, কাল যা' হয় করা যাবে।

বাহাদুর কোন কথা না বলিয়া ভণ্টুর পা টিপিতে লাগিল।

ভণ্টু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল জানেও না, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহাদুরও ভণ্টুর পায়ের উপর হাত রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। খুব ভোরে দারোয়ানজী সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছিল।

সকালে ভণ্টু ঠিক করিল, বাহাদুর যখন সংকল্প করিয়াছে দেশে যাইবার তখন ঠিকই যাইবে—কারণ বাহাদুরের জেদ ভণ্টুর জানা

আছে ; অরূপ আসিলে তাহাকে বলিয়া বাহাদুরের যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। বোনের প্রতি প্রীতি দেখিয়া ভণ্টুর আনন্দও হইল।

প্রাতরাশের পর দৈনিক কাগজখানা লইয়া ভণ্টু পড়িতেছিল। উর্ম্মির আসিবার সময় হইয়া গিয়াছে। কাল অনেকখানি রাত জাগিয়া আজ বোধ হয় সকালে উঠিতে পারে নাই।

বাহাদুর আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম ভণ্টুর হাতে দিল। সই করিয়া রসিদখানি বাহাদুরের হাতে দিয়া কম্পিত হস্তে ভণ্টু খামখানি খুলিল। বাড়ী হইতে 'তার' আসিয়াছে, মায়ের খুব অসুখ—ভণ্টুর সত্বর বাড়ী যাওয়ার দরকার।

বাহাদুর যাইয়া অরূপকে ডাকিয়া আনিল। অরূপ আসিয়া টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া ভণ্টুকে বলিল—আপনার মায়ের যেখানে অসুখ, সেখানে আর কোন কথার দরকার নেই। আপনি 'টাইম-টেব্‌ল্‌ দেখে যত শীগ্‌গির বে'র হ'তে পারেন তাই করুন।

ভণ্টু বলিল, একবার রাণীমাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার।

অরূপ বলিল, আমার কথাই যদিও মায়ের কথা জানি, তবুও আমি এক্ষুণি গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌ছি। আপনি গুছিয়ে দিতে বলুন আপনার জিনিসপত্র বাহাদুরকে।

রাণীমা সঙ্গে সঙ্গেই মত দিয়া বিশেষ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যেন গিয়াই ভণ্টু 'তার' করিয়া দেয়—নিজের পৌছান সংবাদ এবং মায়ের সুস্থ সংবাদ।

ভণ্টুর যাইবার সময় সরকার মশাই আসিয়া ১০০৲ টাকার একখানা নোট ভণ্টুকে দিয়া বলিল, রাণীমা আপনাকে নিতে বলেছেন। মায়ের অসুখে যাচ্ছেন, দরকার হতে পারে—রেখে দিন।

ভণ্টু নীরবে হাত পাতিয়া টাকা গ্রহণ করিল। মহীয়সী রমণীর কথা স্মরণ করিয়াই ভণ্টুর মাথা শ্রদ্ধায় যেন আপনা হইতেই নুইয়া পড়িল। সত্যই হাতে টাকা বেশী ছিল না, ভণ্টু বড় চিন্তায় পড়িয়াছিল। ভগবানের প্রেরিত দান ভণ্টু বিনা দ্বিধায় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিল।

বাহাদুরও নিশ্চিন্ত মনে দিন কয়েকের ছুটি লইয়া আপনার দেশে গেল। কাঞ্চীর কথা বলিতেই শুক্লা সাগ্রহে বলিয়াছিল—তোর বোনটাকে আমায় এনে দিস্ বাহাদুর—আমি অনেক দিন থেকে মনে করেছি, একটা নেপালী-আয়া রাখবো। বাহাদুরও সানন্দে রাজী হইয়াছে। তাহারি চোখের সম্মুখে কাঞ্চী যদি রাজবাড়ীতে স্থান পায় সেতো সৌভাগ্যের বিষয়।

... ...

দুইদিন হইল শুক্লার ছোট পিসিমা আসিয়াছেন। রাজবাড়ীতে বিবাহ হইয়াছে। রাজবধূ, সহজে আসা সম্ভব হয় না। পিসিমার নাম নীলা দেবী। নীলার অতি আদরের শুক্লা!

শুক্লার কাকু রাকা বাবু, তিনিও আসিয়াছেন। শুক্লার বিবাহ সম্বন্ধে সকলেরি মতামতের প্রয়োজন। রাণীমা সকলকেই আমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছেন। ত্রিতলার প্রকাণ্ড 'হল্' ঘরে সকলে মিলিয়া বসিয়া শুক্লার বিবাহের আলোচনা করিতেছিলেন।

রাণীমা প্রতুলকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখেন না। ছেলেটির চালচলন কি রকম ঠেকে। সময় সময় আবার গুরুজনদের সম্মান রাখিতেও ভুলিয়া যায়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই যেন অতি পরিচিতের মত ভাব দেখায়। রাণীমা কথার আভাসে ননদ ও দেওরকে বোঝাইতেছিলেন।

রাকাবাবু বলিলেন, আমিও তো ভাল করে' খোঁজ নিয়ে জানলুম —ব্যারিষ্টারীতে দু' দু'বারই প্রতুল ফেল্ করেছে। অথচ ছেলেটি নিজে বল্‌ছে পাস করেছি এবং ওর ভায়েরাও ওই কথাই বল্‌ছে। কি জানি বাপু, বুঝে উঠতে পারছি না—কোন্‌টা ঠিক।

ঝঙ্কার দিয়া নীলা বলিয়া উঠিল—এ তোমাদের সকলেরি অন্যায়। অন্ততঃ আমি বলবো, গোপনে তোমরা 'স্পাই'এর কাজ করছো। শুক্লা বড় হয়েছে, ওর যেখানে প্রতুলকে পছন্দ, সেখানে আর পাঁচজনের মতের কি দরকার। তোমরা অবশ্য বলবে—তোমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু আমি বলি, শুক্লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার মানে ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে' দেওয়া। এ-তো আর শাড়ি গহনা নয় যে, যদি পছন্দ না হয় পালটে দিলে চল্‌বে।

'মডার্ণ ষ্টাইলের' ছেলেমেয়ে ওরা—এখন ওদের ভালমন্দ ওরাই ভাল বোঝে। আমার তো প্রতুলকে খুব ভাল লাগছে। রাজবাড়ীর উপযুক্ত সভা উজ্জ্বল করা জামাই হবে। আমি বল্‌ছি, শুক্লা সর্ব্বসুখী হবে।

রাকাবাবু বলিলেন, সবই বুঝছি। কিন্তু দাদা বেঁচে নেই, তাঁর গুরুভার যেখানে আমাদের বহন করতে হচ্ছে সেখানে খুব বেশী চিন্তার দরকার। তাঁর বড় আদরের শুক্লার পাছে কিছু ত্রুটি হয় এই আর কি। রাজবাড়ী থেকে সম্বন্ধ এসেছে—আমাদেরি পালটি ঘর; আমাদের ছোট পিসির এক ভাগ্নের সঙ্গে। ছেলেটির রাজ অভিষেক হয়ে গেছে এবং ছেলেটি উচ্চশিক্ষিত। তাই ভাবছি এমন সম্বন্ধ হাতছাড়া করা উচিত কি? একবার দেখলে দোষ কি?

রাণীমা উত্তর দিলেন, কেন মিথ্যেমিথ্যি ভদ্রলোকদের সঙ্গে বাজে কথা বল্‌বেন, ওর আমি পক্ষপাতী নই। আমি জানি, শুক্লার বিয়ে প্রতুলের সঙ্গেই হবে। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে একটা বড় কেলেঙ্কারির

মধ্যে পড়তে হবে। ও নিশ্চিত 'সুইসাইড' করবে। ও যেখানে নিজেই স্বয়ংবরা হয়ে গেছে সেখানে অনর্থক আমাদের মাথা-গলানো ওর ব্যাপার নিয়ে বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। আমি শুধু এইটুকু অনুরোধ করছি আপনার কাছে, আপনি এবং নীলা দু'জনে উপস্থিত থেকে যত শীগ্‌গির সম্ভব ওদের বিয়ের তারিখটা করে' ফেলুন। দেরি ক'রলে হয়তো আমাদের প্রয়োজন থাক্‌বে না। ওরা নিজেরাই ওদের ব্যবস্থা ক'রবে। শুধু সেইটুকুর সুযোগ যেন ওরা না পায় এই আমার বল্‌বার উদ্দেশ্য। ভাদ্র মাস যাচ্ছে, সামনের অগ্রাণের প্রথমে যে দিন আছে আপনি সেই তারিখেই ব্যবস্থা করুন।

নীলা কি বলিতে গেল, কিন্তু অশ্রুতে গলার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। একটু সামলাইয়া বলিল, আমি বুঝতে পারছি, মেয়েটাকে নিয়ে তোমাদের বড় অশান্তি হয়েছে। দাদা মারা যাওয়ার পর থেকে তোমরা শুক্লাকে দু'চক্ষে দেখতে পারো না। আজ যদি দাদা বেঁচে থাক্‌তেন, কারো ক্ষমতা হতো শুক্লাকে আঘাত দিয়ে কথা বলবার? আমাকে ও বলেছে—ওতো আর লুকোচ্ছে না; ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে ও 'সুইসাইড' করবেই তো! প্রতুল পাসই করুক আর ফেলই করুক 'প্র্যাকটিস' নাই বা করলো—শুক্লার ভাবনা কি! দাদা যা' শুক্লাকে দিয়ে গেছেন—যথেষ্ট। আর আমিও মেয়ে জামাইকে আমার সাধ্যানুযায়ী দেবো—দানপত্র করিয়ে রেখেছি, বিয়ের রাতে যৌতুক দেবো। আমি চাচ্ছি শুক্লার শান্তি। সব দিক দিয়ে কি সব জিনিস সমান পাওয়া যায়? আর প্রতুলরা তো জমিদার—শোভাবাজারের মস্ত বাড়ী, গাড়ি সবই আছে। এখন তোমাদের মেয়ে, তোমরা বোঝ। দাদার কত আদরের শুক্লা, সে যদি মন ভারি করে তবে ব্যথাটা সত্যিই আমার লাগবে।

উর্ম্মি ছুটিয়া আসিল, হাতে একখানা ছবি লইয়া। দেখ পিসিমণি আমার ছবি।

নীলা বলিল, বা রে—কে আঁক্‌লো রে? ভারি সুন্দর হয়েছে তো, খুব বড় কোন 'আর্টিষ্ট্' দিয়ে আঁকিয়েছ—না?

শুক্লাও বোধ হয় কাছে কোথাও ছিল ছুটিয়া আসিল। সকলেই উৎসুক হইয়া ছবি দেখিতে লাগিল। কে আঁক্‌লো—শুক্লাও প্রশ্ন করিল।

রাণীমা বলিলেন, উর্ম্মির মাষ্টারমশাই এঁকেছেন। যাও উর্ম্মি, ছবি ভালো করে' আলমারির মধ্যে তুলে রাখগে। না হ'লে দাদাভাই দাগটাগ লাগ্‌লে বকবে। অরূপ 'এগজিবিসনে' পাঠাবে ব'লে যত্ন করে' তুলে রেখেছে। তোমার চক্ষে কিছু যদি বাদ পড়ে, ভারি দুষ্টু হচ্ছ দিন দিন।

শুক্লা কোন কথা না বলিয়া মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি চলিয়া গেল।

নীলাও অপ্রসন্ন মুখে একটু জেরা করিয়া রাণীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, শুক্লা বলছিলো,—'কোন অসভ্য লোককে তুমি নাকি শুক্লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে--বিরুদ্ধে বললে ভুল হবে, দস্তুরমত ওকে অপমান করে', সেই লোকটাকেই বড় করে' ওদের ভাই বোনের জন্যে টিউটর রেখেছ?'

রাণীমা উত্তর দিলেন, নীলা, তোমার শুক্লার খুশিমত চলতে গেলে আমার সামনের যে পথ তা' থেকে আমায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হবে। তাহলেই আমার অরূপ পিছলে একেবারে নর্দ্দামায় গিয়ে পড়বে। যে ছেলেটি অরূপকে পড়ায়, তাকে আমি যতদূর জানি, সে অতি সৎ বংশের ভদ্র ছেলে। সে গরিব হ'তে পারে তা' বলে মনে করোনা সে

—আত্মসম্মানে কোন ধনী লোকের থেকে খাট। ছেলেটিকে আমি বিশ্বাস করি। আমার ধারণা অরূপের শিক্ষার ভার যোগ্য লোকের হাতেই পড়েছে। অরূপ মানুষ হবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। অরূপকে মানুষ করে' তোলার যে গুরু দায়িত্ব তোমার দাদা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন, কিছুদিন ধরে' আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি ছেলেটিকে পাওয়ার পর থেকে। বাইরের চাকচিক্য আমি বড় করে' কোনদিন দেখিনি আর দেখবো না। আমার দৃষ্টিশক্তি দিয়ে যতদূর দেখার দরকার আমি সেইটুকুই বিশেষ করে' দেখবো।

নীলা ভ্রূ কোঁচকাইয়া বলিল, তুমি নিজে যেখানে তার সম্বন্ধে অত ভাল ধারণা পোষণ কর, সেখানে আমার কিছু বল্‌তে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তবে শুক্লাও যেসে মেয়ে নয়—এ জ্ঞানটুকু তোমাদের হওয়া উচিত নয় কি? অরূপও যেমন ছেলে, শুক্লাও তেমনি তোমাদের প্রথম সন্তান। তার সম্মান সবার আগে। তুচ্ছ একজন মাষ্টার নিয়ে তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে মানুষের শুক্লাকে অপমান করা ঠিক হয়নি। ওযে এতে কতখানি দুঃখিত হয়েছে মুখে যদিও প্রকাশ করেনি তবু আমি বেশ বুঝতে পারছি। একজন বাইরের লোক নিয়ে ছেলেমেয়ের মধ্যে অশান্তি লাগিয়ে দেওয়া আমার চোখে কিন্তু একটুও ভাল লাগছে না। তোমার মত অত বুঝিনা বউদি, উপস্থিত দৃষ্টি-কটুতাই বড় অশোভন লাগে। যাক্‌গে, আমি দু'দিনের জন্যে এসেছি, আমার কি দরকার তোমাদের ঘরোয়া কথার মধ্যে থাকায়। নীলা আর কথার উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আষাঢ়ের মেঘের মত রাণীমার মুখের ভাব থমথমে হইয়া উঠিল। একটু সামলাইয়া উর্ম্মিকে বলিলেন, হ্যাঁরে রাধা, তোর মাষ্টারমশাই কবে আসবেন ?

উর্ম্মি বলিল, খুব শীগ্‌গির। জানো মা, মাষ্টারমশাইকে দিদিভাই, পিসিমণি কেউ ভালবাসে না।

রাণীমা বলিলেন, ওকথা বলতে নেই রাধা। যাও তুমি খেলগে।

শুক্লার পাকা দেখার দিন অগ্রাণের প্রথমে স্থির হইল। বিবাহের দিন অগ্রাণের শেষ সপ্তাহে। এই কয় মাসের মধ্যে পাকা দেখার ভাল দিন পাওয়া গেল না। প্রতুলের সঙ্গেই শুক্লার বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

রাণীমা বা রাকাবাবু আর বিশেষ আপত্তি করিলেন না। মেয়ে যেখানে স্বাধীন সেখানে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া অনুচিত, তা'ছাড়া নীলাকেও দুঃখিত করা। অদৃষ্ট ছাড়া পথ কি! আর প্রতুল জামাই হিসাবে মন্দই বা কিসে ? জমিদারের ছেলে, সুন্দর চেহারা—বিলাতে অতি অল্প বয়স হইতে মানুষ হইয়াছে। শিক্ষায়, দীক্ষায় যে শুক্লাকে মানুষ করা হইয়াছে, তাহারি উপযুক্ত প্রতুল। রাণীমা আর নিজের মতামত প্রকাশ না করিয়া যাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব শুক্লার বিবাহ দেওয়া যায়—তাহারি উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

শুক্লাকে বধূরূপে পাইতে অনেক সম্ভ্রান্ত যুবকই ইচ্ছা করিত। শুক্লার সঙ্গে যাহারা পরিচিত তাহারা অনেকেই শুক্লার পাণি-প্রার্থী হইয়াছিল—শুক্লা কিন্তু সসম্মানে বন্ধুত্বের দাবি জানাইয়া তাহাদের বিদায় দিয়াছিল।

... ...

পুকুর পাড়ে শুক্লা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মাছগুলিকে আহার দিবার জন্য। এখনও বেয়ারা এবং ঝি না আসায় শুক্লা মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল।

আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ। আকাশের গায়—মেঘের কোলে কে যেন শরতের সোনালী ছোপ লাগাইয়া দিয়াছে। মিষ্টি রোদও যেন হাসিয়া খেলিয়া লুটাইয়া আছে ধরণীর উপর। রৌদ্রের উচ্ছ্বসিত উত্তপ্ততা কোথায় চলিয়া গিয়াছে শরতের আহ্বানে। লজ্জানত বধূর মত রৌদ্র হাসিতে উপ্‌চাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু উচ্ছ্বাস নাই। শুক্লা প্রকৃতির নিয়মগুলি স্মরণ করিতেছিল। গ্রীষ্ম, বর্ষার পর শুভ্র শরৎ যেন আনিয়া দেয় নব জীবনের প্রাণের সজীবতা।

প্রতুল আর বেশী আসে না, বিবাহের দিন সন্নিকট হওয়ায়। হঠাৎ কাহার পদশব্দে শুক্লা সচকিত হইয়া উঠিল। শিস্‌ দিয়া কে যেন গান করিতেছিল, মুখ ফিরাইতে লক্ষ্য পড়িল প্রতুলকে! এস, অনেক দিন ' 'সনি তো প্রতুল। ভাল ছিলে তো?

সিগারেট দাঁতে চাপিয়া হাতের সরু ছড়িটা ঘোরাইতে ঘোরাইতে নিরাশার ভঙ্গিতে প্রতুল বলিল, দুঃখে।

শুক্লা হাসিয়া বলিল, তোমার আবার দুঃখটা কোনখানে।

প্রতুল একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল 'দুঃখ' এই যে আশ্বিনের পর অঘ্রাণ আসে, অঘ্রাণের পর আশ্বিন এলে কি ক্ষতিটা হ'ত। তোমার আমার মনের মিল হয়ে গেল কেবল বাধা হ'য়ে দাঁড়ালো মাস—এই আর কি!

শুক্লা হাসিয়া বলিল, বিরহ আর সহ্য ক'রতে পারছো না তাহ'লে!

প্রতুল যথাসম্ভব মুখটি ম্লান করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিল, ওঃ—যদি তুমি ঠিক আমারই মত feel করতে!

শুক্লা বিজয়িনীর গর্ব্বে যেন আনন্দে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

সহসা ঊর্ম্মি আসিয়া আলাপনে ব্যাঘাত জন্মাইল। উপরে রাণীমার কি প্রয়োজন হওয়াতে শুক্লার ডাক পড়িয়াছে। শুক্লা উঠিতে প্রতুলও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—আচ্ছা আমিও চলি আজ 'ডার্লিং'। বাই বাই!

বিবাহের মাঝে মাত্র দুই মাস আছে।

নীলা নিজে লইয়াছে বিবাহের যোগাড়যন্ত্রের ভার। নীলা এ বাড়ীর কাহাকেও ভরসা করে না। পাছে শুক্লার বিবাহের কোন ত্রুটি হইয়া যায়, তাহা হইলে মনে খেদ থাকিয়া যাইবে। রাণীমাকে নীলা খুব বিশ্বাস করে না। মেয়েটার সম্বন্ধে বউদি যেন কেমন উদাসীন। বউদির মনোভাব কেমন যেন দায়সারা গোছের।

নীলার স্বামী নীলাকে লইতে আসিয়াছিলেন, বিবাহের যেখানে দু'মাস দেরি এতদিন থাকার কি দরকার। নীলার ছোট মেয়ে বেবীটা আবার তাহার বাবাকে ছাড়া থাকিতে চায় না, তাহাকে লইয়াই মুস্কিল। নীলা স্বামীকে জানাইয়া দিল, শুক্লার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়।

অগত্যা নীলার স্বামী নীলাকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

ঊর্ম্মি বেশ আনন্দের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়, অধিকাংশ সময় বেবীটাকে টানিয়া বেড়ায়। মাষ্টারমশাই না থাকায় পড়ার যেমন ঝক্কি নাই, কিন্তু অসুবিধাও আরেক দিক দিয়া আছে। মনের কথা বলিবার কেহ নাই। মাষ্টারমশাই যেমন তাহার প্রত্যেক কথাটি শুনিত এবং সমর্থন করিত তেমন আর কেহই নাই।

বেচারী আর কাহারও নিকট অতখানি ভরসা পায় না। যাহার সহিত বসিয়া দু'টি কথা বলিবে বা শুনিবে এমন লোক কেহই নাই। তবু

বেবীটাকে উপলক্ষ করিয়া খানিকটা সময় কাটিয়া যায়। মনের যাবতীয় কথা বেবীকে বলে। দেড় বছরের বেবী হিলিবিলি করিয়া কখনো সায় দেয়, কখনো ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উর্ম্মির গল্পই মাটি করিয়া দেয়।

দুষ্টু বেবীটা আবার কাহারো কাছে যাইতে চায় না। শুধু উর্ম্মিকে চিনিয়াছে। নীলা আবার শুক্লাকে বেবীকে লইতে দেয় না, ছোট ছেলে লইলে নাকি শরীর খারাপ হইয়া যায়।

নীলার স্নেহের পরিমাণ দেখিয়া রাণীমা দূরে গিয়া হাসেন।

সকালে দাদাভাইএর নিকট মাষ্টারমশাই আসিবে শুনিয়া উর্ম্মির আজ খুব আনন্দ হইল।

যথাসময়ে ভণ্টু আসিলে উর্ম্মি ছুটিয়া গেল, বেবীটাকে হেঁচড়াইয়া লইয়া।

উর্ম্মি একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মা ভাল আছেন?

ভণ্টু উর্ম্মির কথা বলার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ উর্ম্মি, আমার মা ভাল আছেন। এ খুকু তোমার কে হয়?

এক গাল হাসিয়া উর্ম্মি উত্তর দিল, পিসিমণির মেয়ে! এর নামই তো খুকু, বেবী, আরো অনেক নাম আছে। আমাকে ভীষণ ভালবাসে আর কারুর কাছে যায় না।

ভণ্টু উত্তর দিল, তুমি যে খুব ভাল লক্ষ্মী মেয়ে কিনা, তাই খুকু তোমায় ভালবাসে।

উর্ম্মি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, ঠিক তাই।

ভণ্টু একটু ভাবিয়া বলিল, জানো উর্ম্মি, তোমার জন্যে আমার মা একটা জিনিস দিয়েছেন।

সাগ্রহে উর্ম্মি জিজ্ঞাসা করিল—কি মাষ্টারমশাই?

ভণ্টু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাহির করিল অনেক রকমের আচার এবং আমসত্ব।

একগাল হাসিয়া উর্ম্মি আচারের বোতল ক'টি হাত দিয়া দেখিয়া লইল, তারপর খুকুকে বসাইয়া খানিকটা আচার মুখের মধ্যে দিয়া জিবে টোকা দিয়া 'আঃ' করিয়া শব্দ করিল। আপনার মা করেছেন বুঝি, না মাষ্টারমশাই? খু-উ-ব ভাল হয়েছে। ভাগ্যি আপনার মায়ের অসুখ করেছিল।

উর্ম্মি মুখে আচার দিয়া ভণ্টুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল। খুকুকে লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ চোখ ফেরাইতে দেখে খুকুও হাতে খানিকটা আচার লইয়া সারা মুখে হাতে লাগাইয়াছে।

এমা ছিঃ, খুকু তুমি ভারি দুষ্টু মেয়ে, হ্যাংলা মেয়ে। মাষ্টারমশাই কি ভাব্‌বেন বল তো? শাসনের ভঙ্গিতে উর্ম্মি খুকুকে কথাগুলি বলিল।

ভণ্টুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মাষ্টারমশাই, খুকুটা ভারি হ্যাংলা মেয়ে। কিন্তু আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। ও ছোট কিনা, তাই হ্যাংলা। আমার মত যখন বড় হবে তখন আর হ্যাংলাপনা থাকবে না। আবার বলিল, আপনি যেন কিছু মনে করবেন না।

হাসিয়া ভণ্টু উত্তর দিল, তুমি যেখানে মানা করছ সেখানে না হয় আর কিছু মনে করবো না, কি বল?

উর্ম্মি ভারিক্কে গলায় বলিল, শুনলে তো খুকু, মাষ্টারমশাই কি বল্‌লেন! কক্ষণো আর না জিজ্ঞেস করে পরের জিনিসে হাত দিও না।

বাহাদুর নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহার বোন কাঞ্চীকে লইয়া উপস্থিত হইল।

কাঞ্চী মেয়েটি বেশ ধবধবে ফরসা, আঁটসাঁট চেপটা গড়ন। মুখখানি অনেক বড়, চোখ দু'টি দেহের অনুপাতে ছোট, নাকটি চেপ্‌টা।

বয়স ঠিক অনুমান করা যায় না, বোধ হয় ষোল হইতে আঠারোর মধ্যে। পরনে একখানি গঙ্গাজলী ডুরে কেমন ঘোরাইয়া পরিয়াছে। গলায় স্ফটীকের মালা, কানে দু'টি বড় পাথর, হাতে রূপোর চুড়ি। মাথায় একটা খুব বড় খোঁপা। গোটা কতক পাহাড়ী শুখনো ফুল মাথায় গোঁজা আছে।

উর্ম্মি আসিয়া কাঞ্চীর কথা ভণ্টুর কাছে বলিয়া যায়। কাঞ্চী নাকি বাংলা জানেনা। দিদিভাই ঠিক করেছে, বেবীর আয়া হবে কাঞ্চী।

ভণ্টু একটু ভণিতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেবী আবার কে?

উর্ম্মি গিন্নীর মত ভঙ্গি করিয়া বলিল, আঃ, আপনি বড্ড ভুলো, আপনার কিচ্ছু মনে থাকে না। এর মধ্যে খুকুকে ভুলে গেলেন! বড্ড মুস্কিল আপনাকে নিয়ে।

ভণ্টু উত্তর দিল, ও সেই হ্যাংলা খুকুটা বুঝি?

উর্ম্মি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—হ্যাঁ।

ভণ্টু বলিল, আমি ভাবছি, বেবী তো তুমি, তোমারি আয়া থাকবে কাঞ্চী।

বিরক্তির সুরে উর্ম্মি বলিল, কি যে বলেন আপনি তার ঠিক নেই। আমি নাকি বেবী, এত বড় মেয়ে কখনো বেবী হয়? এইবার মার্চ্চে আমি এগারোয় পড়বো। আমি নাকি বেবী! ভারি বোকা আপনি।

বেবী বলাতে উর্ম্মির আত্মসম্মানের লাঘব হইয়াছে। ভণ্টু মনে মনে খুশি হয়। উর্ম্মিকে উপলক্ষ করিয়াই এ বাড়ীতে থাকা। শুধু উর্ম্মির স্নেহেই আবদ্ধ হইয়া ভণ্টু রুগ্ন মাতাকে ফেলিয়াও চলিয়া আসিয়াছে।

শুধু উর্মির টানে। সকল ভাবনা, চিন্তা ও নিরানন্দের মধ্যে আনন্দের মন্দাকিনী উর্মি!

উর্মি আবার বলিল, জানেন মাষ্টার মশাই, সেদিন বেবী আমায় কামড়ে দিয়েছিল, কামড়ে দিয়ে কি হাসি। এমন সুন্দর মিষ্টি হাসি হাসে বেবীটা, কি বলবো আপনাকে!

ভণ্টু উর্মির কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠে। তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে দুইটি প্রিয় সঙ্গী—উর্মি ও বাহাদুরকে লইয়া দিব্য কাটিয়া যায়। ভিতরে উর্মির ডাক পড়ে, ততক্ষণে বাহাদুর আসিয়া মাষ্টারবাবুকে তাহার প্রাণের কথা বলিতে সুরু করে। ভণ্টুও অবিচলিতভাবে নিতান্ত আগ্রহের সহিত সব-কিছু শুনিয়া চলে। কত কথা। বাহাদুর খুব আনন্দেই আছে! বোনটাকে এ বাড়ীর সকলেই ভালবাসে। মেমদিদিমণি ইহারি মধ্যে চারটে রূপোর কাঁটা ও চওড়া লাল ফিতা দিয়াছে। একখানা ছাপা শাড়ি, একটা ব্লাউজ দিয়াছে। বাহাদুর যেন নিশ্চিন্ত হইয়া ভণ্টুর কাছে গল্প করিয়া যায়। পূজার সময় মেমদিদিমণি বলিয়াছে, কাঞ্চীকে একখানা বেগুনে রংএর নতুন ঢাকাই শাড়ি কিনিয়া দিবে।

পূজার ক'দিন বাকী আঙ্গুলের কর গুণিয়া বাহাদুর হিসাব করিয়া দেখে, এগারো দিন আছে। বেগুনে রংটা কেমন, সময় সময় বাহাদুর ভণ্টুকে জিজ্ঞাসা করে।

রাতে বসিয়া বাহাদুর ভণ্টুকে বলে, আমার এসব কাজ ভাল লাগেনা মাষ্টার বাবু। নেহাৎ আপনি আছেন তাই। কাঞ্চীটা এখানে থাকুক, খুব ভাল। আমার একটুও ভাল লাগেনা।

ভণ্টু বলিল, কেন, বেশ তো আছিস বাহাদুর রাজবাড়ীতে রাজার হালে। এর থেকে সুখের কাজ তোকে আবার কে দেবে?

বাহাদুর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, আমার সিনেমার কাজ ক'রতে খুব ভাল লাগে। ছবির মধ্যে দিয়ে কেমন সব হাসি, কান্না, গান। ওসব লোকগুলো যেন পরীর দেশের।

সে যদি স্টুডিও সংক্রান্ত কোন কাজ পায়, বিনা মাহিনার হইলেও তাহার আপত্তি নাই। কারণ কাঞ্চীর জন্য তো তাহাকে আর ভাবিতে হইবে না!

ভণ্টু হাসিয়া বলিল, বাহাদুর ও-সব মতলব করিস নে, এই বেশ আছিস্। পরীর দেশে যাওয়ার বিপদ কি জানিস্, তারা তোকেই কোনদিন হয়তো উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

বাহাদুর মাষ্টার বাবুর কথার তাৎপর্য ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে না—তবে বুঝিতে পারে কাজটা মাষ্টার বাবুর ঠিক মনঃপূত নয়।

দেখিতে দেখিতে দুর্গাপূজা আসিয়া গেল। রমারা সকলে দেওবর চলিয়া গেল। কিছুদিন হইতে অনুপমের শরীর ভাল নাই, সেইজন্যই জয়া দেবী আর দেরি করিলেন না, পূজার আগেই চলিয়া গেলেন।

দুর্গাবতী একেবারে একা পড়িলেন। ভারতীকে আনিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। শ্যামলাল রমাদের বাড়ীতে উৎসবের সময় সেই যে আসিয়াছিল—তারপর আর আসে নাই। দুর্গাবতী চিঠি লিখিলেও ভারতীর সম্বন্ধে শ্যামলাল কোন উচ্চবাচ্যই করে না। ভণ্টু মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিয়া খোঁজ খবর লয়। চিঠিতে বেশীর ভাগ বউদির কথাই থাকে, 'কবে আসিবেন, কেমন আছেন, আসিলে ভণ্টু নিশ্চয় আসিবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। পরের ছেলেরও মায়া আছে। চিঠিপত্র দিয়া যে খোঁজখবর লয় এই যথেষ্ট।

ভণ্টু আরও লিখিয়াছে—গঙ্গাজল নাকি দুর্গাবতীকে দেখিবার জন্ম খুব ব্যস্ত হইয়াছেন। আহা হইবে না; বাল্যের বন্ধুত্ব। হাসিয়া খেলিয়া অকপটে মনের কত কথাই না হইত। বার্দ্ধক্যের দ্বারে আসিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া আসা দিনগুলির পানে দুর্গাবতী চাহিয়া দেখিলেন, মনের স্মৃতি হইতে কিছুই বিলুপ্ত হয় নাই।

ভণ্টুকে যদি দুর্গাবতী একবার লেখেন ভারতীকে আনিয়া দিবার জন্ম, ভণ্টু সানন্দে ভারতীকে আনিয়া দেয়। কিন্তু গ্রামের মুখপোড়া লোকগুলোর জ্বালায় তা সম্ভব কি ?

রমা থাকিলেও দুর্গাবতীর কতকটা ভরসা থাকিত। পরামর্শ করিয়া স্থির করা যাইত, কি করা কর্ত্তব্য।

কয়দিন ধরিয়া দুর্গাবতীর শরীর ভাল নাই। বৈকালের দিকে রোজ জ্বর হয়। অনেক চিন্তা করিয়া দুর্গাবতী ভারতীর মাকে নিজের অসুস্থতা জ্ঞাপন করিয়া চিঠি দিলেন, যদি কানু আসিয়া বউমাকে দিয়া যায়, শ্যাম মোটেই ছুটি পায় না ইত্যাদি।

দুর্গাবতীর শরীর ও মন দিন দিনই খারাপ হইয়া যাইতেছে বিশেষতঃ আরও শ্যামের ব্যবহার দেখিয়া। বউ বাপের বাড়ীতে কতদিন পড়িয়া থাকিবে। লোকেই বা বলে কি! টাকাটাই কি দুনিয়ার সব চাইতে বড় ? শ্যাম সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। এই আশা করিয়া তো দুর্গাবতী সংসার বাঁধেন নাই। বউটার কি ভাগ্য, স্বামী একবার খোঁজও লয় না।

গয়লা বউ দুধ দিতে আসিলে দুর্গাবতী বলিলেন, বউ তুই যে সেদিন বলছিলি খড়ের কথা, নিবি নাকি ?

গয়লা বউ সানন্দে রাজী হইয়া গেল!

দুর্গাবতী বলিলেন, কিন্তু টাকাটা নগদ চাই।

ভারতীর মা চিঠি লিখিয়াছেন, ভারতীর শরীর বিশেষ ভাল নয়। ভারতীর ছেলেপুলে হইবার সম্ভাবনা আছে যদিও মাস চারেক দেরি আছে। কিন্তু এ অবস্থায় ট্রেনে পাঠাইয়া দেওয়া ঠিক হইবে কি? আবার তো আনিতে হইবে। পাড়াগাঁয়ে সে সময় থাকা কি ঠিক? সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন—আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করিব।

দুর্গাবতী এরপর আর কি লিখিবেন, ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না।

হঠাৎ একদিন কানু আসিয়া ভারতীকে দিয়া গেল।

মায়ের শত অনিচ্ছায়ও ভারতী জেদ ধরিল সে যাইবেই। পিতার যে অবস্থা তাহাতে তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে ভারতীর প্রবৃত্তি হইল না। সর্ব্বোপরি বন্ধুদের কাছে জবাব দিতে দিতে প্রাণান্ত।

রমার মত তাহার দুঃখে দুঃখী এ-জগতে আর কেহই হইবে না। তাহার জামাইবাবুর কথা ক'টিও ভারতীর অন্তরে ঘা দিয়াছিল।

পরিহাস ছলে সেদিন জামাইবাবু বলিয়াছিলেন,—আজ সকালে উঠে শালীর মুখ দেখ্‌লাম, কপালে আজ অন্ন নেই।

ভারতী এবং ভাইবোনেরা জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

জামাইবাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন, শ্যামভায়ার অর্দ্ধাঙ্গিনী তো, বুঝতেই পারছ। এত করে শ্যামকে লিখ্‌লাম আসার জন্যে, ভারতীর অসুখ কত কি, টাকার ভয়ে এ পথ মাড়ালো না। অনেক কৃপণ দেখেছি বাবা, কিন্তু শ্যামের জোড়া আর দেখ্‌লাম না। এমন রূপে গুণে ভরা শালী আমার, তা'র পানে ফিরেও চায় না। তালাক-নামা লিখে দাও ভারতী, আমি মাথায় করে রাখবো।

শাশুড়ীর অসুখ, তিনি নিজে লিখিয়াছেন ও টাকা পাঠাইয়াছেন। ভারতীর আর কি থাকা চলে।

মাতৃসমা শাশুড়ী বুক দিয়া আগলাইয়া রাখেন ভারতীকে। সকল ব্যথার ব্যথী হইয়া আপনার স্নেহের নীড়ে জড়াইয়া রাখেন। কোন ব্যথা যেন ভারতী একা না বহে। ভারতীরও শাশুড়ী ছাড়া আর কাহাকে ভালও লাগে না।

বিদায়কালে মায়ের অশ্রুভরা মুখখানি ভারতীকে বারংবার আঘাত দিয়াছিল।

মা বলিয়াছিলেন, সর্ব্বদাই মনমরা হ'য়ে থাকিস্ না ভারতী, আগে তো তুই এমন ছিলি না। অক্ষম মা আমি, কোন সাধ আহ্লাদ ক'রতে পারি না। জামাই কি কিছু বলেন? তারপর একটু চুপ করিয়া আবার বলিয়াছিলেন, কি করবি মা বল, গরিবের মেয়ে হয়ে যেখানে জন্মেছিস্, সহ্য করা ছাড়া উপায় কি বল? শরীর মন ভাল রাখ্‌তে হয় এ সময়, সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বি! যেমন করেই হ'ক আমি সুবিধা করে তোকে সে সময় আনবো। শানুর অসুখে আর তোকে আন্‌তে একগাছা চুড়ি বিক্রি করেছিলাম, আর একগাছা আছে। যতক্ষণ আমি আছি ভারতী, তোদের ভাবনা কি? তোদের জন্যেই যে আমার সংসার। মন খারাপ করো না মা আমার।

... ...

ভারতীকে দেখিয়া দুর্গাবতীর অনেক অসুখ সারিয়া গেল। কানুকে যাইবার সময় বিশেষ করিয়া দুর্গাবতী বলিয়া দিলেন, 'মাকে ভাব্‌তে মানা করে দিও, অসুবিধে বুঝলে সঙ্গে সঙ্গেই তোমার দিদিকে পাঠিয়ে দেবো তোমার মায়ের কাছে।'

ভারতীর শরীর আগের চাইতে অনেক খারাপ হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়। রংও যেন ফ্যাকাসে হইয়াছে। আহারে কিছু রুচি নাই, সর্ব্বদাই যেন ক্লান্ত ভাব।

মধ্যে দু'দিনের জন্য ভণ্টু একাই আসিয়াছিল ভারতীর সঙ্গে দেখা করিতে। ভারতীর শরীরের অবস্থা দেখিয়া ভণ্টুও চিন্তিত হইল।

শ্যামলালও দুই দিনের জন্য আসিয়াছিল—ভারতীর শরীরের অবস্থা দেখিয়া মাকে বলিল, আমি মানা করিনি, পাঠিও না। এখন ঠেলা ভোগ কর। যত ঝঞ্ঝাট ইচ্ছে করে যোগাড় কর। আর এখন আন্তেই বা গেলে কেন? তোমার নিজের শরীর খারাপ, ওর ওই অবস্থা, দেখাশোনা তোমাদের কে করবে?

সামনের ডিসেম্বরে আমার অপিস-সংক্রান্ত পরীক্ষা আছে, এ দু'মাস আমি মোটেও আস্তে পারবো না। একটু থামিয়া আবার বলিল, মা' বুঝছি, আমার কিছু হবে না দেখছি। সুবিধা করে মাসে অন্ততঃ একবারও আসার চেষ্টা করতে হবে, আর কি। আর উন্নতির পথ সব আগলে ধরে আছ, সাধ্য কি আমার ডিঙ্গিয়ে যাই!

ভারতীকেও বলিয়াছিল, শরীরটা একেবারে মাটি করে নিয়ে এলে তো অনর্থক কতকগুলো খরচপত্র ক'রে? শেষকালে লাভের মধ্যে হ'ল কি নিজের শরীরটা একেবারে নষ্ট হ'ল। এই সব বল্‌তে গেলেই তোমাদের কাছে আমি মানুষ খারাপ হ'য়ে যাই।

ভারতী আর কথার উত্তর দেয় নাই। নীরবে বাতায়ন দিয়া দূর অন্তরীক্ষে চাহিয়াছিল।

... ...

শুক্লার বিবাহ পরশু, বাড়ীতে ধূমধামের সীমা নাই। রাজবাড়ীর উপযুক্তই যোগাড়যন্ত্র হইয়াছে। লোকজন, আত্মীয় কুটুম্বে অত বড় বাড়ী যেন মস্‌গুল হইয়াছে। নহবৎ সাতদিন পূর্ব্বে হইতে বসিয়া গিয়াছে।

বড় বড় 'কার' সর্ব্বদাই আসা যাওয়া করিতেছে। বাহিরে আসা যাওয়া করিতে করিতে বাড়ীর লোকেরা বিশ্রাম ভুলিয়া গিয়াছে।

এ কয়দিন উর্ম্মির আনন্দই সব চাইতে বেশী, কারণ পড়িবার ঝঞ্ঝাট নাই, শাসনের ভয় নাই। রোদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পান খাইয়া মুখ লাল হইয়া গিয়াছে।

পানের রস জামায় মাথামাথি। কাঞ্চীও লাল রঙের সিল্কের শাড়ি পরিয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া ঘোরে।

ভণ্টুর ইচ্ছা ছিল এ কয়দিন বাড়ী হইতে ঘুরিয়া আসে।

রাণীমা স্বয়ং ভণ্টুকে ডাকিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এই কয়দিন কোথাও যাওয়া চলিবে না, তাহা হইলে রাণীমা বিশেষ দুঃখিত হইবেন।

ভণ্টু নিজের শত ইচ্ছা চাপিয়া নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া রাণীমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে।

ভণ্টু রাণীমার কথা অমান্য করিতে পারে না। সে নিজেকে ভুলিয়া যায়, মনে হয় কোন দেবী যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া ভণ্টুর সামনে দাঁড়াইয়াছেন। মায়ের মত স্নেহ মায়া দিয়া প্রথমদিন হইতেই ভণ্টুকে যেন তিনি বশীভূত করিয়াছেন।

অরূপ আসিয়া বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছে। যদিও আপনার অসুবিধা হবে, সম্পূর্ণ একাকী, তবুও বলছি আপনি থাকলে আমি, আমার মা খুব খুশি হবো।

আর উর্ম্মির কথা তো বলিবার নয়, সে যেন সংসারের গেজেট। যাবতীয় কথা ভণ্টুকে না বলিলে সে যেন শান্তি পায় না। অবাধ

স্বাধীনতায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর মুঠো ভরিয়া পানের খিলি আনিয়া ভণ্টুর কাছে গচ্ছিত করিতেছে। কারুকে কিন্তু বল্‌বেন না মাষ্টার মশাই পানের কথা। পান খেতে খুব মজা লাগে, না মাষ্টার মশাই ?

ভণ্টু হাসিয়া উত্তর দিল, না উর্ম্মি, বেশী পান খেয়ো না। শেষকালে দিদির বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে পারবে না, জিভ আড়ষ্ট হয়ে উঠবে। মুস্কিলে পড়ে যাবে যে।

তাহারি বয়সের ১০।১২টি মেয়ের হাত ধরিয়া উর্ম্মি চলিয়া গেল, নিজের মনে নিজেকে সাবধান করিতে করিতে। 'আর ভাই পান খাবো না, মাষ্টার মশাই মানা করেছেন।'

এত সমারোহের বিবাহ, আনন্দের তুফান বহিয়া চলিয়াছে কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন। বিবাহের দিন সকাল হইতে শুভ্র আকাশকে কালো মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সারাদিন আকাশ ঘোলাটে হইয়া থাকিল, কখনো বা দু'চার ফোঁটা পড়ে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা হইতে কে যেন আকাশকে ছিদ্র করিয়া দিল। ঝম্ ঝম্ শব্দে আকাশ হইতে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

বড়লোকের বাড়ী, কিন্তু তবুও অসুবিধা না হইয়া গেল না। অসময়ের বৃষ্টি, সেইজন্য কেহ প্রস্তুত ছিল না।

ঠাণ্ডা একটা হাওয়াও সমানে বহিয়া চলিয়াছে।

বিবাহের লগ্ন আটটা হইতে দশটা। লগ্নের একঘণ্টা পূর্ব্বে দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া বর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

শঙ্খ-ধ্বনি ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ভণ্টু তাহা কিছু পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছে। অরূপ আসিয়া ভণ্টুকে ডাকিয়া লইয়া গেল বিবাহের আসরে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভন্টু সাধারণ খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিয়া অরূপের সহিত সজ্জিত আসরের একপাশে গিয়া বসিল। ভন্টুকে বসাইয়া দিয়া অরূপ চলিয়া গেল। চারিদিকে বসনভূষণের চাকচিক্য, তাহার মাঝে তুচ্ছ বেশধারী ভন্টুকে সকলেই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি দিয়া দেখিল। ভন্টু গ্রাহ্যও করিল না।

জাঁকজমক করিয়া বর আসরের মাঝখানে বসিয়া। দামী 'সেণ্ট' এবং ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরিয়া রহিয়াছে। দু'জন বেয়ারা পিচকারি করিয়া গোলাপজল দিতেছিল।

বর সাহেবী 'স্যুট' পরিয়া বসিয়া আছে। সোনা রূপোর দান-সামিগ্রী, মেহগনির পালং, আলমারী ও অন্যান্য দামী দামী আসবাবপত্র এবং ফার্ণিচারে সভা যেন আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অতিথি অভ্যাগতেরা সকলেই সেইদিকে নজর দিয়াছে।

ইলেক্‌ট্রিকের সাহায্যে বাহিরের বড় ফটকে 'স্বাগতম্' আহ্বান জানান হইতেছে।

মটরে করিয়া স্ত্রীলোকেরা এক দিক দিয়া আর পুরুষরা অন্য দুয়ার দিয়া ঢুকিয়া—আসরে আসন গ্রহণ করিতেছে।

দু'জন বয় পান, সিগারেট ও দু'জন বয় চা লইয়া ঘুরিতেছে।

মেয়েদের 'রিসিভ' করিবার জন্য একজন মহিলা দাঁড়াইয়া আছেন; আর একজন পুরুষমানুষ 'রিসিভ' করিতেছেন ভদ্রলোকদের। দুইদিকেই লোক আছে।

হঠাৎ ভিড় ঠেলিয়া একটি ইংরাজ মহিলা ও বছর পাঁচ ছয়ের একটি ছেলে এবং একটি প্রৌঢ় সাহেব একবারে আসরের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত!

বর তখন বন্ধুদের সহিত কি একটা কথা লইয়া হাসিতেছিল।

সাহেবটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ বাড়ীর মালিক কে ?

একজন যাইয়া রাকাবাবুকে ডাকিয়া আনিল। ভণ্টু দেখিল, হঠাৎ প্রতুল এইদিক পানে নজর ফেলিয়াই কেমন পাংশু হইয়া গেল, যেন মরা মানুষ।

সাহেবটি রাকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মেয়ের বিয়ে ?

রাকাবাবু বলিলেন, আমার ভাইঝির বিয়ে। আপনার সঙ্গে কথা যদি একটু পরে বলি, তাহ'লে হয় ?

সাহেবটি বলিল, না, দরকার আমার এখুনি। মেয়ের বাবার সঙ্গে আমার বিশেষ দু'চারটে কথা আছে।

নীলার স্বামী আসিয়াও উপস্থিত হইল। ব্যাপার কি! লগ্নের সময় উপস্থিত, এখানে দাঁড়িয়ে কেন, চলুন ?

বরপক্ষের লোকেরাও উপস্থিত হইল, বিবাহ বসিবার সময় হইয়াছে —আর কেন ?

রাকাবাবু সাহেবকে বলিলেন, তাহ'লে আপনি একটু বসুন। আমি কিছু পরে এসে আপনার বক্তব্য শুনবো। আমার ভাই অর্থাৎ মেয়ের বাপ স্বর্গগত, উপস্থিত আমিই গার্জ্জেন। আপনার দরকারী কথা আমাকেই বলবেন। দয়া করে আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমাদের হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম যে, শুভ লগ্নে মেয়েকে পাত্রস্থ করা। সেই শুভ লগ্নের সময় উপস্থিত, কাজেই বিলম্ব করা চলে না।

সাহেবটি গম্ভীরভাবে বলিল, আমি সবই জানি। আর জেনেশুনেই আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে এসেছি। আপনি দয়া করে পাঁচ মিনিট আমাকে নিয়ে চলুন মেয়ের মায়ের কাছে। তারপর আপনারা মেয়েকে পাত্রস্থ করবেন। আপনাদের ভালর জন্যেই আমার আসা। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি, চলুন।

নীলার স্বামীর অসোয়াস্তি হইল, কেমন যেন বাঁকা কথা বোধ হইল। রাকাবাবুকে বলিলেন, শোনাই যাক এঁর কথা, আসুন আমার সঙ্গে। মেয়ের মা বড্ড ব্যস্ত আছেন, দেখা পাওয়া মুস্কিল।

সাহেবটি দৃঢ়তার সহিত বলিল, দেখা আমায় করতেই হবে।

রাণীমা ড্রইংরুমে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সব লোককে সরাইয়া দেওয়া হইল সাহেবটির অনুরোধে।

অভিবাদনের পর রাণীমা বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় সাহেবটিকে প্রশ্ন করিলেন, কি দরকার আপনার, বলুন।

সাহেবটি বলিল, শুনেছি এবং দেখ্‌ছি, আপনারা খুব সম্ভ্রান্ত পরিবার। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আপনাকে গোটাকতক মর্ম্মান্তিক কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এইটি আমার মেয়ে অ্যাঞ্জেলা, এইটি আমার মেয়ের ছেলে; আর আপনাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যিনি বর, তিনিই আমার মেয়ের স্বামী এবং এই শিশুর পিতা।

রাণীমা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

সকলেরই বাক্‌রোধ, একি নিদারুণ দুঃসংবাদ……!

বাহিরে তখন চিৎকার সুরু হইয়া গিয়াছে,—'লগ্ন চলিয়া যায়, বিবাহ কখন বসিবে।'

সাহেবটি আবার বলিল, অসময়ে এই সংবাদ দেওয়ায় আমি নিজে খুব লজ্জিত এবং বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু কোন উপায় ছিল না এ ছাড়া। আপনাদের 'এড্রেস' যোগাড় ক'রতে না পারায় আমাদের আসতে দেরি হয়ে গেল।

নীলা এঘর ওঘর করিতে করিতে সেখানে ছুটিয়া আসিল। বা রে, সব এখানে চুপ করে' বসে,' লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা সারাদিন উপোসী, বেশ তোমাদের আক্কেল যা' হ'ক।

সবাই নিরুত্তর, বউদি মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে। সামনেই অপরিচিত একটি সাহেব, মেম ও ছোট একটি বালক,—কি ব্যাপার!

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নীলা প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে কি? কথা বলছ না কেন? স্বামী কথার উত্তর দিল না, ভাই নীরব, বউদি জ্ঞানহীন প্রায় বসিয়া!

এইবার সাহেবটিকে নীলাই ইংরাজীতে প্রশ্ন করিল।

সাহেবটি যা' বলিল, শুনিয়া নীলা হতবাক হইয়া গেল। একি দুঃস্বপ্ন! কি হবে মাগো—বলিয়া নীলা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

একটু চিন্তা করিয়া নীলা নিজের মাথা দু'হাতে টিপিয়া ধরিল, তারপর কাঁপা গলায় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে?

নীরবে 'ভ্যানিটী ব্যাগ' হইতে মেম্‌টি তাহাদের সাত বছর পূর্ব্বে বিবাহের রেজিষ্টারী পত্র, পাত্রীর দস্তখৎ এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের সহি বাহির করিয়া দেখাইল।

সাহেবটি বলিল, আশা করি প্রতুল অস্বীকার করিবে না। প্রতুল বলিয়াছিল, ভারতে যাইয়া কোন কাজ পাইলেই তাহার স্ত্রীকে লইয়া আসিবে। কিছুদিন পূর্ব্বেও ৬০০৲ টাকা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়াছিল, এই দেখুন রসিদ।

তারপর এই কিছুদিন ধরিয়া একবারে চুপচাপ, চিঠিপত্র পর্য্যন্ত দেয় না। আমার মেয়ে প্রতুলকে অত্যন্ত ভালবাসে। চিঠিপত্র না পাওয়ায়

আমার মেয়ে কাঁদাকাটি করিয়া অস্থির। তখন আমি বাধ্য হইয়া ভারতে আমার এক আত্মীয়কে খবর লইতে বলি।

আত্মীয়টি খবর দেয়, প্রতুল পুনরায় বিবাহের সংকল্প করিয়াছে। তখন আমার মেয়ে জেদ ধরিল, 'আমি ভারতে যাইব।' বিব্রত হইয়া আমাকে যোগাড়যন্ত্র করিয়া লইয়া আসিতে দেরি হইয়া গেল।

এখানে আসিয়া আপনাদের ঠিকানা যোগাড় করিতে বহু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। আমি স্থির করিলাম, প্রতুলকে উপস্থিত এ বিষয় কিছু না বলিয়া আপনাদের সাবধান করা দরকার।

প্রতুলও আমাকে তা'র নিজের ঠিকানা ভুল দিয়াছিল। অনেক কষ্টে আমার সেই আত্মীয়ের সাহায্যে আজ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রতুলের বাড়ীর সঠিক ঠিকানা জানিতে পারি। জলঝড় মাথায় করিয়া ছুটিয়া গেলাম প্রতুলের বাড়ীতে। সেখানে বেয়ারার নিকটে শুনিলাম,—আজই বিবাহ এবং পাত্র বহুক্ষণ পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে।

বিবাহ বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, জানিনা। বোধ হয় প্রতুলের এ বিষয়ে শিক্ষা থাকিবে। দশটি টাকা বক্শিষ বলায় এবং বলিলাম—প্রতুলের বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়াই আমি আসিয়াছি—সে আমার বিশেষ পরিচিত, তবে সে আমাকে এখানকার ঠিকানা দেয়।

আমার সেই আত্মায়টি বোম্বে চলিয়া গিয়াছিল, ভগবানের অনুগ্রহে সে আজ সকালে আসিয়াছে। আমরা সোজা ট্যাক্সি করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। জানি আপনাদের হিন্দু ধর্ম্মের প্রথা, বিবাহ হইয়া গেলে কোন উপায় থাকে না।

নালা উত্তর দিল, আপনাকে ধন্যবাদ যে, আপনি এত কষ্ট স্বীকার ক'রে এসে আমাদের সর্ব্বনাশের হাত থেকে রক্ষা কর্‌লেন।

সাহেবটি বলিল,—মানুষ নিমিত্ত মাত্র, ধন্যবাদ দিন ভগবানকে।

রাণীমার যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। 'নীলা, ভগবান না হয় রক্ষে ক'রলেন, কিন্তু এখন উপায়।' যন্ত্রচালিতের মত রাণীমা কথা কয়টি বলিলেন।

আমি আগেই বলেছি নীলা, এ বিয়েতে মন আমার একটুও সায় দিচ্ছেনা। আমার অন্তর যেন বল্‌ছিল—এ বিয়ে দিতে গেলে অনর্থ না ঘটে যাবে না। কি অভিশাপে আমার এত বড় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'ল! এখন কি করবো ঠাকুর পো? রাণীমা কাতরভাবে চাহিলেন দেবরের মুখের পানে।

রাকাবাবুও অকূলে পড়িলেন। রাজবংশের সম্মান, খ্যাতি সব গেল। গগনচুম্বী রাজপ্রাসাদ হঠাৎ ভূমিকম্পের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লুটাইয়া পড়িল ধূলার ধরণীতলে! সাজানো ঘর আশাহত হইয়া পড়িয়া গেল! এখন উপায়?

নীলার স্বামী ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। চিৎকার করিয়া উঠিল, কোথায় 'লোফারটা'—নিয়ে আয় আমার চাবুক। চাবুক মেরে লোফারের স্পর্দ্ধা আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি।

অ্যাঞ্জেলা ধীরে ধীরে নীলার স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, দেখুন, আপনার রাগ হওয়া স্বাভাবিক, তবু আমি অনুরোধ করছি···।

আর···এ বিষয় নিয়ে গোলমাল না করাই ভাল। আপনারা দয়া করে' আমার স্বামীকে কিছু বল্‌বেন না, তা'হলে আমি বিশেষ দুঃখিত হব। আপনারা যদি দয়া করে' অনুমতি করেন, তাহ'লে আমি আমার স্বামীকে নিয়ে চলে যেতে পারি।

আপনারা আমায় অনুমতি করুন,···আমি আমার স্বামীকে নিয়ে চলে যাই।

মেমটির কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ !

এমন করিয়া দরদ নিয়া কথা বলা স্বামীর এই দুর্ব্যবহারের পরও এবং এমন অক্ষুণ্ণ ভালবাসা বজায় রাখিয়া চলা—এ দেশের কেন, হয়তো কোন দেশের মেয়ের পক্ষেই সম্ভব হইত না।

আর ঐ ভদ্রলোক, জলজ্যান্ত স্ত্রী, ছেলে ফেলিয়া আবার বিবাহ আসরে বর হইয়া বসিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নাই ! সাগব পারের ব্যাপার কে জানিবে ? মার্জ্জিত বিলাত ফেরত ধোপদস্ত কাপড়ের মত ধবধবে হইয়া শুক্লার মত মেয়েকে প্রেমের অভিনয় দেখাইয়া জয় করিয়া লইয়াছিল। দু'দিন পরে আবার হয় তো অন্য কোন মেয়েকে আর এক নতুন কথা বলিয়া তাহাকেও ভুলাইত। তখন আর শুক্লার প্রয়োজনও থাকিত না।

রাণীমা বলিলেন নীলার স্বামীকে, ধীরেন ভাই, সহ্য কর, থেমে যাও।

তারপর মেম্‌টিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি ব'লছি—তুমি তার স্বামীকে এই মুহূর্ত্তে নিয়ে যেতে পারো। আজ তুমি আমায় যে বিনাশের হাত থেকে বাঁচালে, তা'র পুরস্কার ঈশ্বর দেবেন, তবু আমি যৎকিঞ্চিৎ উপহার তোমার ছেলেকে না দিয়ে পারছি না। এই বলিয়া নিজের গলার মহামূল্য সরু চেনে গাঁথা হীরার লকেট সমেত হারটি খুলিয়া পরাইয়া দিলেন ছেলেটির গলায়। 'গুডবাই' বলিয়া তাহারাও সে স্থান ছাড়িয়া আসরের সন্নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল।

আসরের লোক সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল, কি ব্যাপার ! বরকর্ত্তা, তিনিও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন।

বরের সন্নিকটে যাইয়া মেমটি কি বলিল, ছোট ছেলেটিও প্রতুলকে দেখিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। নির্ব্বিকারচিত্তে অ্যাঞ্জেলা প্রতুলের হাত ধরিয়া সভা হইতে বাহিরে লইয়া আসিল। প্রতুলও নিঃশব্দে কলের পুতুলের মত সভা হইতে বাহিরে আসিল।

আর দ্বিতীয় কথা নাই। সাহেব এবং মেমটির সঙ্গে প্রতুল নীরবে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছায়াবাজীর মত এই ঘটনা এমন অকস্মাৎ ভাবে ঘটিয়া গেল যে, কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইতেছিল না। বর চলিয়া যাইতে বরযাত্রীর দলও কেহ থাকিল কেহ সরিয়া পড়িল। বাহিরের দুর্য্যোগের সহিত ভিতরের দুর্য্যোগ মিলিয়া উৎসবের আবহাওয়াকে কুৎসিত করিয়া তুলিল।

বড় ঘরের ব্যাপার লোকে প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও অন্তরালে গিয়া গা টেপাটিপি করিতে লাগিল।

লগ্ন বহিয়া যায়······সকাল হইলে মুখ দেখানো ভার।

প্রতুলের সহিত শুক্লার 'লাভ ম্যারেজ' কাহারো অজানা নাই।

তাহা ছাড়া পাত্র খুঁজিবার এখন সময়ই বা কোথায়! জানিয়া শুনিয়া ও মেয়ে গ্রহণ করিতে কেহই রাজী হইবে না। সম্ভ্রান্ত ঘরে পুত্রবধূরূপে শুক্লার স্থান পাওয়া দুস্কর হইয়া উঠিবে।

'ঠাকুরপো', রাণীমা অবিচলিত কণ্ঠে ডাকিলেন, 'যা' হয় ব্যবস্থা করুন। অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে মেয়েটার পরিণাম কোথায় দাঁড় করালেন একবার ভাবুন। কাল সকালে আমি এ মুখ লোক সমাজে বার ক'রবো কি করে'। তা'ছাড়া এত বড় বংশের সম্মান, মর্য্যাদা সবার আগে। বিহিত করুন, কি উপায়?'

নীলা বলিল, এর মধ্যে তুমি কাকে পাবে? যা'কে তা'কে ধরে তো আর মেয়ে দেওয়া যায়না।

রাণীমা বলিলেন, আজ রাতের মধ্যে যদি ব্যবস্থা না হয় তা'হলে যা'কে তা'কে দেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না নীলা।

রাকাবাবু বলিলেন, আমি দেখি কি ক'রতে পারি। কি উপায় করবো বুঝতে পারছি না। আবার বলিলেন, তখন যদি বউদির কথা শুনতাম নীলা, তা'হলে আজ এত বড় বিপদের সাম্‌নে উপস্থিত হ'তে হ'তো না। মান, সম্ভ্রম সব তো গেল, এখন লোকের কাছে মুখ দেখানো দায়।

পাগলের মত রাকাবাবু মাথার চুলগুলি চাপিয়া শুধু পায়চারি করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ উর্ম্মি আসিয়া উপস্থিত হইল, 'ওমা আমার যে ঘুম পাচ্ছে।'

রাণীমা ধমক্ দিয়া বলিলেন, যাও না ঘুমোতে।

বা রে, দিদি ভাইএর বুঝি বিয়ে দেখ্‌বো না! এমন সুন্দর করে' সাজ্‌লাম। আচ্ছা কাকু, প্রতুলবাবুকে তো নিয়ে চলে গেল, এখন দিদি ভাইএর বিয়ে হবে কার সঙ্গে?

রাণীমা রাগিয়া উঠিলেন। দুষ্টু মেয়ে কোথাকার, এখানে এলেন জ্যাঠামি ক'রতে। কে তোকে বল্‌লো প্রতুল চলে গ্যাছে? এখুনি তো আস্‌বে।

উর্ম্মি বলিল, বা রে, আমি নিজের চোক্ষে দেখ্‌লাম চলে গেল। তা'ছাড়া ওখানকার সব লোকই তো বল্‌ছে 'বর পালিয়ে গ্যাছে।' কখন ঘুমোবো ও-মা, এখন নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত খাইনি। শীগ্‌গির বিয়ে দিয়ে দাও।

রাণীমা বিরক্ত হইয়া মেয়েকে কাছ হইতে সরাইয়া দিলেন।

সস্নেহে রাকাবাবু উর্ম্মিকে কাছে টানিয়া বলিলেন, আচ্ছা মা মণি, তুমি এখন বলতো তোমার দিদিভাইএর বিয়ে কার সঙ্গে দিই। প্রতুল তো চলে গেল।

একটু হাসির সহিত উর্ম্মি বলিল—ওমা, কেন মাষ্টারমশাইএর সঙ্গে দিন না! আমার মাষ্টারমশাই খুব ভাল।

উর্ম্মিকে একটু সরাইয়া দিয়া রাকাবাবু চাহিলেন…রাণীমার মুখের পানে।

রাকাবাবু স্পষ্ট দেখিলেন, রাণীমার মুখের উপর আশার আলো দেখা যাইতেছে! অকূল সমুদ্রে যেন অস্পষ্ট তীরের রেখা!

অটল সংকল্প লইয়া রাণীমা বলিলেন, ঠাকুরপো, উর্ম্মির মাষ্টারমশাইএর সঙ্গে শুক্লার বিবাহ স্থির করুন। ছেলেটি আমাদের পালটি ঘর, প্রথম দিন খবর নিয়ে জেনেছি।

এ বিয়ে হ'লে আমি খুব আনন্দ পাবো। ছেলেটিকে সত্যিই আমি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি। আপনাদেরও শুক্লাকে ভালবাসা সার্থক হবে, তাকে সৎপাত্রে দান ক'রে। আর স্বর্গ থেকে আপনার দাদাও আশীর্ব্বাদ ক'রবেন, শুক্লা মানুষের হাতে পড়েছে দেখে'।

রাকাবাবু বলিলেন, আপনার কথাই ঠিক্—ছেলেটি সত্যিই সৎ। আর আমি আপনার অমতে কোন কাজই ক'রবো না। আপনার পুণ্যফলে শুক্লা আজ যে বিপদ থেকে রক্ষা পেল,—সে শুধু ভগবানের অসীম করুণায়। কিন্তু ছেলেটি যদি রাজী না হয়?

দৃঢ়তার সহিত রাণীমা বলিলেন, সে ভার আমার। ভগবানের অভিপ্রেত বাণী তিনি উর্ম্মির মুখ দিয়ে বার ক'রে দিয়েছেন। আমি জানি, আমি যে কোন অন্যায় করিনি—গোপালজী ছাড়া আমি যে

কিছু জানি না! কেন আমার সর্ব্বনাশ হবে? শুক্লা যে এখনো আমার অদৃষ্টের সঙ্গে জড়ানো—এখনও শুক্লার কেশাগ্রে এতটুকু টান পড়তে পারে না! গোপালজী আজ শুক্লাকে রক্ষা করেছেন। উত্তেজনায় রাণীমার গলা কাঁপিতে লাগিল।

নীলা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এত বড় অবিচার শুক্লা কি করে' সহ্য করবে! না, না, এ হতে পারে না।

রাকাবাবু নীলাকে ধমক দিয়া বলিলেন, ধৈর্য্য ধর নীলা। আমাদের বংশের মান, সম্মান সব চলে যেতে বসেছে! এখন কাঁদবার সময় নয়। আজকের দিনটা যদি কোন রকমে মানে মানে কেটে যায়, তবু লোককে বোঝানো যাবে। তা' না হ'লে একেবারে মেয়েটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বেশ বুঝে দেখ, ছেলেটি দেখ্তে শুন্তে ভালো এবং শিক্ষিত। উপস্থিত এর থেকে ভালো পাবে কোথায়? এখন দেখ, ভদ্রলোক যদি রাজী হয় তবেই বংশের মুখ রক্ষা। না হ'লে সাত হাত মাটির তলায় আশ্রয় নিতে হবে।

নীলার স্বামীও নীলাকে ধমক দিয়া থামাইল। তুমি চুপ করে' থাকো, একটি কথাও বলো না। বউদি ও ছোড়দা যা' ক'রবেন—শুধু চুপ করে দেখে যাও।

পিসি ভাইঝির চয়েস মত রংচংএ সং এনে সভাসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত। তোমাদের যা' শিক্ষা তার ওই পরিণতি। জব্দ হয়েছো ভালই।

আমিও দেখ্ছি অরুর টিউটর ছেলেটি সত্যিই ভালো। শুধু বাড়ী ঘরের অবস্থা…। তা' তুমি এত রাত্রে ভাল পাত্র পাচ্ছ কোথায়? এত রাত্রে কেন, আর কোনদিনই পাবে না। এখন আবার কান্নাকাটি—শুক্লার মতামত। মেয়েটার জন্যে তুমিই দায়ী। তোমারই উচিত এখন যোগাড়যন্ত্র ক'রে ঐ ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। আর মাত্র তিন কোয়ার্টার সময় আছে। তারপর লগ্নও নেই, রাতও ফর্সা।

ধীরেন নীলাকে বলিল, তোমরা এই ঘরে থাকো। তোমাকে দেখ্‌লেই শুক্লা অন্য রকম হয়ে যাবে। চলুন বউদি, আপনি আর আমি, আপনি একটু শক্ত হ'ন।

রাণীমা মলিন হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, আমি বেশ শক্ত আছি ভাই।

গর্ব্বিতা রাজকন্যা শুক্লা বধূবেশে সজ্জিত হইয়া বসিয়াছিল—টুক্‌টুকে লাল রংএর বেনারসী ও বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া।

আজ পর্য্যন্ত শুক্লা কাহারো কাছে পরাভব স্বীকার করে নাই। প্রতুল তাহাকে ঠকাইয়া মিথ্যার অভিনয় করিয়া চলিয়া গেল। তাহার জীবনের সব কিছু কাড়িয়া লইয়া লোক-সমাজে শেষ পর্য্যন্ত হীন প্রতিপন্ন করিয়া গেল।

ব্যর্থতায়, অপমানে, শুক্লার সারা অন্তর যেন পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল। অপমান সহিয়া লোকের অনুগ্রহের পাত্রী শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে হইতেই হইবে, এই কি বিধাতার অদৃষ্টলিপি!

সম্মানের সহিত দূরে থাকিয়া আজীবন প্রতুলেরি ধ্যান করিয়া শুক্লা একটা জীবন অনায়াসে কাটাইয়া দিতে পারিত।

কিন্তু আজ আর তাহার কিছুই থাকিল না। অভিনয়কারী, মিথ্যাবাদী প্রতুলের স্বরূপ তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল! কিছু পূর্ব্বেও যে প্রতুল তাহার কাছে কত সুন্দর ছিল, যাহার ধ্যান করিয়া সে একটা জীবন অনায়াসে কাটাইয়া দিতে পারিত—এই মুহূর্ত্তে সে শুধু তাহার নিকট অভিশাপ, অসহনীয় অশনির জ্বালা!

জীবনের প্রথম যেদিন শুক্লা জগতের পানে চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল বসন্তের নতুন কিশলয়ের মত—সেদিন ভাল লাগিয়াছিল প্রতুলকেই।

প্রতুলও তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল কত বিশ্বাসের বাণী লইয়া, প্রেমের কত রঙ্গিন গল্প বলিয়া। শুক্লার সুখে সে কত সুখী। শুক্লা ছাড়া জীবনে সে কোনদিন কোন নারীকে ভালবাসে নাই, ভালবাসিতে পারে না। সমগ্র জীবন ভরিয়া শুধু শুক্লাই প্রতুলের সম্বল। আজ সব মিথ্যা, শুধু মরীচিকা! শুক্লা নিজেকে খুব বেশী বড় মনে করিত, প্রতুল তাহার সেই গর্ব্বকে উপহাস করিয়া গেল!

শুক্লা সব সহিতে পারে, পারিবেও হয়তো অনেক কিছু। কিন্তু কি করিয়া সে সহিবে তাহার নিদারুণ অপমান? রাগে অপমানে শুক্লার কপালের উপর শিরা দুইটা সাপের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে।

রাণীমা মেয়ের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, মেয়ের উপর দিয়া কি প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে!

শুক্লা!

শুক্লা বলিল, কি।

শান্ত সহজ গলায় রাণীমা বলিলেন, এতদিন তুমি তোমার খুশিমত চলেছ, বল্‌তে গেলে—আমি কিছুই বলিনি। ভুল পথে গেলে একটু কষ্টে পড়্‌তে হয় সোজা পথে আস্‌তে। আজ আমি তোমায় কিছু বল্‌তে চাই। শুধু বলা নয়, আমার দাবি জানাতে চাই। তুমি আমার মেয়ে, আমার যে দাবি আছে তোমার ওপর, একথা তোমার মত শিক্ষিতা মেয়ে অস্বীকার ক'রবে না। আমার কর্ত্তব্যে কিছু ত্রুটি ছিল বলেই তুমি আজ এতখানি বিপদের মধ্যে পড়েছো। এর জন্যে ভগবানের কাছে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সন্তানের ভাল মন্দের জন্য কতকটা পিতামাতা দায়ী বইকি। এখনো যখন তুমি আমারি সুখ-দুঃখের মধ্যে জড়ানো সেখানে ভগবানের কাছে জবাব আমাকেই দিতে হবে।

তুমি স্বীকার কর বা নাই কর, তোমার ওপর যে আমার একটা দাবি আছে তাই জানাতে এসেছি। অরূপের টিউটর—আশীষের হাতে—তোমাকে সমর্পণ করে'—আমি আমার কর্ত্তব্য এই মুহূর্ত্তে সমাপন ক'রতে চাই।

রাগে শুক্লার মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথা বাহির হইল না। অস্পষ্ট স্বরে বলিল, মা—শেষকালে আমার মূল্য ধার্য্য ক'রলে বাড়ীর কর্ম্মচারীর সঙ্গে! কি অপরাধে এত বড় শাস্তির কথা বল্‌তে পারছ?

রাণীমা জলদগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, শুক্লা!

শুক্লা চমকাইয়া উঠিল মায়ের ডাক শুনিয়া!

রাণীমা বলিলেন, বাড়ীর কর্ম্মচারীকে যদি আমি উপযুক্ত মনে করি, তা'হলে জেনে রেখ, সেও তোমার মঙ্গলের জন্যে। মনে ক'রবে যোগ্য হাতেই তুমি পড়েছ। তোমাকে আমি আর বিশ্বাস ক'রতে পারি না, কারণ তোমার সঙ্গে জড়ানো আছে আমার শ্বশুর বংশের সম্মান। তুমি আমার সন্তান, তোমার সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার ক'রবার ভার শুধু আমার।

যদি কোন যোগ্য লোককে ভালবেসে তুমি আজীবন কুমারী থাকতে, আমি আনন্দের সঙ্গে তোমার কথাই বড় করে দেখ্‌তাম! গর্ব্ব হতো আমার সন্তানের উঁচু মনের পরিচয় পেয়ে!

শুক্লা বলিল, এর থেকে তুমি আমায় সময় দাও—আমি আমার প্রায়শ্চিত্ত করি।

রাণীমা বলিলেন, সে তুমি ইচ্ছে ক'রলে আজকের দিন বাদ দিয়েও পারবে।

শুক্লা অনুপায় হইয়া বলিল, কি মুস্কিল, আমি স্বামী ব'লে স্বীকার করবো কি করে'?

রাণীমা সংযত হইয়া বলিলেন, সে তোমার অভিরুচি, প্রবৃত্তি না হয় বলো না। আবার জোর দিয়া বলিলেন, স্বামীকে যদি স্বামী বল্‌তে ইচ্ছে না হয় আমার কিছু তো বল্‌বার নেই। আমার উপস্থিত কাজ, তোমার পথ বেঁধে দেওয়া। সে ইচ্ছায় কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না। আমাকে সংকল্পচ্যুত করা কারো ক্ষমতা নেই। গোপালজী বিপদের মধ্যে দিয়েই আমায় আলোর সন্ধান দেখিয়ে দিয়েছেন।

ধীরেন বলিল, মা মণি, তুমি তোমার মাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর, ভগবান্ তোমায় সুখী কর্‌বেন।

দু'হাত দিয়া শুক্লা মুখ ঢাকা দিল।

ভণ্টু অনেকক্ষণ বসিয়াছিল, ভিতরে যে গণ্ডগোল হইয়া গেল, ভণ্টু তাহা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই। ইংরাজ মহিলা আসিয়া পাত্রকে উঠাইয়া লইয়া গেল। ভণ্টুর ধারণা, বড়লোক-বাড়ীর বিবাহের কোন অনুষ্ঠান বুঝি! বড়লোকের বিবাহ বাড়ী—ভণ্টুর এই প্রথম দর্শন।

লোকগুলি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল যেন একটু অস্বাভাবিক ভাবে। জমাট্ ভাবটা যেন একটু আল্‌গা হইয়া গিয়াছে। আগন্তুকেরা কেমন যেন গা টেপাটিপি করিতেছিল। মরুক গে, অরূপ আসিলেই ভণ্টু উঠিবে। তাহাকে না বলিবার জন্য উঠিতে পারিতেছে না।

বউদির চিঠিখানির জবাব দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কাল একবার শ্যামলালের সহিত দেখা করিতে হইবে। মাসীমার বিশেষ অনুরোধ, শ্যামলাল যেন এ সপ্তাহে বাড়ী যায়; ভণ্টুর উপর ভার দিয়াছেন। শ্যামলালের জন্মমাস, বাড়ী যাওয়া দরকার; মাসীমার কথা রাখা উচিত। যেমন ভাবেই হ'ক শ্যামলালকে বাড়ী পাঠাইতে হইবেই।

গৌরী দিদি চিঠি দিয়াছে। তা'র ছোট মেয়েটার অসুখ হইয়াছে। এই মাসের শেষেই সে শ্বশুরবাড়ী যাইবে। ভণ্টু যদি পারে যেন একবার বাড়ী আসে, মায়ের জবানিতে গৌরী লিখিয়া দিয়াছে।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর ভণ্টু উঠিতে যাইবে, হঠাৎ লক্ষ্য পড়িল অরূপ আসিতেছে, যাক্ ভালই হইল।

অরূপ আসিয়া সোজা ভণ্টুর কাছে দাঁড়াইল। অরূপের সুন্দর মুখের উপর কে যেন কালির পোঁচ বুলাইয়া দিয়াছে!

মাষ্টারমশাই!

কেন অরূপ! ভণ্টু অরূপকে দেখিয়া বুঝিল, অরূপ কিছু বলিতে আসিয়াছে। কাজের বাড়ী, সত্যই ভণ্টুর অন্যায় হইয়াছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা। লজ্জিত হইয়া ভণ্টু বলিল, কি বল্‌বে বল অরূপ। থাম্‌লে কেন?

আপনাকে আমার মা ডাক্‌ছেন, দয়া করে একবার চলুন মাষ্টার-মশাই। কথায় যেন ব্যথা উছলাইয়া পড়িতেছে।

ভণ্টু বিস্মিত হইল! তাহার পর বলিল, মা ডাক্‌ছেন? চল, এর জন্যে আবার এত করে' বল্‌তে হয়!

অরূপের সঙ্গে ভণ্টু যাইয়া ড্রইংরূমে দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে দাঁড়াইতেই রাণীমা আসিয়া ভণ্টুর হাত দু'টি চাপিয়া ধরিলেন। বাবা আশীষ, আমার কথা আছে তোমার সঙ্গে, বড় দরকারী কথা বাবা।

আমার অনুরোধ তোমায় রাখ্‌তেই হবে বাবা। তুমি আমার কথা না রাখ্‌লে আমার মান, সম্মান সব যায়। বল আশীষ, আমার কথা রাখ্‌বে? রাণীমার দু'চোখ বাহিয়া জলধারায় ভণ্টুর হাত দুইটি সিক্ত হইয়া গেল।

ভণ্টু বিব্রত হইয়া উঠিল, একটু শান্তস্বরে বলিল, আমি বুঝতে পারছি না মা, আমাকে দিয়ে আপনার কি এমন বিশেষ দরকার আছে! আমি সামান্য মানুষ, আপনার পুত্রস্থানীয়। যদি কিছু দরকারই থাকে—আপনি আমায় তাহ'লে অনুরোধ না করে আদেশ করুন।

বাবা আশীষ, আজ আমার সব কিছু নির্ভর ক'রছে তোমার দয়ার উপরে।

ব্যথিত হইয়া ভণ্টু বলিল, আমাকে সংশয়ের মধ্যে রাখ্‌বেন না। বলুন, আমাকে দিয়ে আপনার কি উপকার হ'তে পারে। আমি সাধ্যাতীত চেষ্টা ক'রবো আপনার কথা রাখ্‌বার।

একি হেঁয়ালির মধ্যে ভণ্টু পড়িল, স্বয়ং রাণীমা—তিনি অনুনয় করিয়া কি বলিবেন! বড়লোকের অদ্ভুত খেয়াল!

রাণীমা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, আমি জানি, তুমি আমার বিশ্বাসের অমর্য্যাদা ক'রবে না। আমি তোমায় জানি বলেই তোমায় অনুরোধ ক'রছি। বাবা, তুমি আমার শুক্লাকে গ্রহণ কর। দয়া করে' তোমার পায়ে তার আশ্রয় করে দাও।

ভণ্টুর মাথার চুলগুলি সব খাড়া হইয়া উঠিল! একি কুগ্রহ তাহার পশ্চাতে চুপিসারে লুকাইয়াছিল! এতক্ষণে তাহার কাছে আগাগোড়া সব যেন পরিষ্কার হইয়া গেল।

ভণ্টুর বড় বড় চোখ দু'টিতে ভাসিয়া উঠিল দুঃখিনী মায়ের মুখ। পাষাণ মূর্ত্তির মত সে দাঁড়াইয়া রহিল নিশ্চল, নির্ব্বিকার।

রাণীমা আবার বলিয়া উঠিলেন, এ ছাড়া আমার যে কোন উপায় ছিল না বাবা, আর পরেও থাক্‌বে না। শুধু একমাত্র তুমিই এখন ভরসা।

ভণ্টু রুদ্ধ গলায় বলিল, তাই হ'ক, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক! কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন আপনার এ খেয়াল, আর কেনই বা আপনি আমায় এ আদেশ ক'রলেন! আমার এমন কোন যোগ্যতা নেই যে সেই অধিকারে আমি আশা করতে পারি শুক্লাদেবীকে পত্নীরূপে। তা' ছাড়া··· আমি অত্যন্ত গরিব।

রাণীমা বলিলেন, তোমার কোন পরিচয়ে দরকার নেই বাবা। আমি রত্ন নিয়ে কারবার করি, ভগবান্ আমায় রত্ন চিন্‌বার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমার ভাণ্ডারে এমন কোন রত্ন নেই যা' দিয়ে আমি তোমার সম্মান ক'রতে পারি। আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছি আশীষ। তুমিই পারবে শুক্লার সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে' তোমার পাশে তার স্থান করে' দিতে।

ভণ্টু গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, জানি না—কেন আপনি আমায় আশ্রয়চ্যুত ক'রলেন। তবে একটা কথা, এই অনুষ্ঠানে আমি একটি কানাকড়িও গ্রহণ করবো না। শুধু আমার এই অনুরোধ—আর আমার এই ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

রাণীমা বলিলেন, আমি কথা দিচ্ছি—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

আবার নহবৎ বাজিয়া উঠিল মিষ্টি সুরে। মাঙ্গলিক শঙ্খ ও হুলুধ্বনি চারিদিক হইতে ঝঙ্কারিয়া উঠিল। রাজপ্রাসাদ আবার কলরবে মুখরিত হইল।

ভণ্টুর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল সেই মায়ের মুখ—আর দু'দিনের পরিচয়ে পরিচিত যেন কত আপনার, বউদি ভারতীকে।

সম্প্রদানের সময় কে যেন মুঠো ভরিয়া একরাশ শিউলি ফুল তাহার হাতের উপর তুলিয়া দিল।

ভণ্টু ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, এ তাহার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য ভণ্টু সহিতে পারে কিন্তু সৌভাগ্যকে ভণ্টুর বড় ভয়।

হাত ধরিয়া মেয়েরা বাসরে লইয়া গিয়া বসাইল। ভণ্টুর কোন খেয়ালই নাই। মন তখন অন্য এক রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। মাথার ভিতরটা থাকিয়া থাকিয়া দপ্ দপ্ করিতেছিল।

রাণীমা আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—শুধু ধান-দূর্ব্বা দিয়া। ভণ্টুর হাতে আবার দু'ফোঁটা চোখের জল পড়িল! এ বোধ হয় রাণীমার আনন্দ অশ্রু!

ভণ্টু চকিতে একবার রাণীমার মুখের পানে চাহিল।

রাণীমা যেন বুঝিতে পারিলেন, ভণ্টুর জিজ্ঞাস্য বিষয়। নিজেই বলিলেন, না বাবা, আর আমার কাঁদ্‌বার তো কারণ নেই। আজ আমার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ! আজ আমার জীবন সার্থক, তোমার পাশে শুক্লাকে দেখে!

ভণ্টু গম্ভীর মুখে বলিল, আপনি এবার অনুমতি করুন, আমি বাইরে যাই?

ম্লান হাসি হাসিয়া রাণীমা বলিলেন, না আশীষ, তোমার তো এখন যাওয়া হবে না। এখন আরো দু'টো দিন তোমায় কষ্ট ক'রতেই হবে। অবশ্য আমার নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকলেও পাঁচজনের কথাই বল্‌ছি।

রাকাবাবু জোর করিয়া নীলাকে লইয়া আসিলেন, কাঁদিয়া নীলার চোখমুখ ফুলিয়া গিয়াছে।

সোণার ডিসে ধান দূর্ব্বা, দু'খানা কাগজ, দু'টি আংটি।

রাকাবাবু সস্নেহে বোনটির পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, দেখ্ পাগলী চেয়ে দেখ, কি অমূল্য সম্পদ আন্‌লাম, যা' তুই কল্পনাও

করিস্ নি! দাদার কি সুন্দর জামাই হ'ল একবার ভাল করে দেখ! অসময়ে যে বৃষ্টি হচ্ছে, আমার যেন মন বল্‌ছে—স্বর্গ থেকে দাদার শত আশীর্ব্বাদ বরিষণ ধারায় নাব্‌ছে!

দুধে রং‌এর বেনারসী পরনে, চন্দনে চর্চ্চিত মুখ, গলায় ফুলের গোড়, হাতে রূপোর দর্পণ—ভণ্টুকে অপূর্ব্ব লাগিতেছিল!

নীলা এতক্ষণে জামাই দেখিল, সবেমাত্র ভণ্টুকে দেখিয়া সে যেন আনন্দে দিশেহারা হইয়া গেল! দেখি বাবা মুখ তোলো, অতি সযত্নে নীলা ভণ্টুর হাত দু'টি চাপিয়া ধরিল—তারপর শুক্লার হাতখানি টানিয়া ভণ্টুর হাতের উপর ধরিয়া বোধ হয় একত্র করিতে গেল।

শুক্লা হাতখানি জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, পিসিমণি?

ছি শুক্লা! ছেলেমানুষি করো না!

নীলা আবার ভাল করিয়া ভণ্টুকে দেখিতে লাগিল। দশহাজার টাকার দুইখানি ক্যাসসার্টিফিকেট্, দুইটি আংটি—সোনার রেকাবির উপর রাখিয়া নীলা ভণ্টুকে আশীর্ব্বাদ করিল। আগ্রহ সহকারে সোনার ডিসখানি নীলা ভণ্টুর হাতে তুলিয়া দিতে গেল।

ভণ্টু একবার রাণীমার মুখের পানে চাহিল, অর্থ বোধ হয় এই—'এর তো কথা ছিল না!'

রাণীমা বলিলেন, তোমার পিসিমণির মনে কোনদিন যেন তোমার দিক দিয়ে এতটুকু ব্যথা না লাগে—এ মিনতিটুকু তুমি রেখ।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভণ্টু নীলার হাত হইতে সোনার রেকাবিখানি গ্রহণ করিল।

রাণীমা আবার বলিলেন, তোমার কাকাবাবু এবং আমি, আমরা কোনদিন তোমার কথা অন্যথা ক'রবোনা।

উর্ম্মি একপাশে শুইয়া ঘুমাইয়া গিয়াছিল, সারাদিনের পরিশ্রান্ত উর্ম্মি ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছিল। ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও অত লোকের আসা যাওয়ার ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া উর্ম্মি ঘামিয়া উঠিয়াছে। পানের সিক্ত রসে, নতুন শাড়িতে, ফুলের গহনাতে উর্ম্মি যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে।

ভণ্টু নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়া উর্ম্মির মুখখানি মুছিয়া দিল। গলা হইতে চেপ্‌টে যাওয়া ফুলের মালাগুলি সন্তর্পণে ছিঁড়িয়া দিল। এই মেয়েটার মায়ায় পড়িয়া আজ তাহার জীবনের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও তাহার জীবনে স্বাধীনতার কি অপরিমেয় খেয়ালই না ছিল! এখন আর তাহার কিছুই রহিল না!

নীলার অনুরোধ এড়ানো দায়; তা'ছাড়া হয়ত মনে বড্ড বেশী আঘাত পাইবে। রাণীমা সেইজন্য ভণ্টুকে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইলেন।

রাণীমা জানেন, তিনি আজ জিতিলেন বটে, কিন্তু ঐ ছেলেটি একেবারে নিঃস্ব হইল। তবু কোন উপায়ই যে ছিল না। মানুষ স্বার্থের দাস,—নিজের বিচার নিজে যে চলে না।

খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা মিটিলে, নীলা বাসর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিল। সকালেই আবার বাসী বিয়ের হাঙ্গামা, বর কনের একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

ভণ্টু ও শুক্লাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া নীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বড় একটা বালিশকে আশ্রয় করিয়া ভণ্টু একপাশ পানে গিয়া

সরিয়া বসিল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল আর নিজের অদৃষ্টের কথাও বোধ হয় চিন্তা করিতেছিল।

বাহিরে আকাশ তখনও ফুঁসিতেছিল। আধ্-খোলা জানালা দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছিল, কে যেন কালো আস্তরণে আকাশকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

ভণ্টুর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, শুক্লার অস্পষ্ট আওয়াজে!

শুক্লা ডাকিল, শুনুন,—

ভণ্টু সামনে ঘুরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমায় কিছু বল্‌ছেন? শুক্লার কপালের উপর শিরা দু'টি তখনো ফুটিয়া রহিয়াছে ভণ্টু এক নজরে দেখিতে পাইল।

গর্ব্বিতা শুক্লা আবার যেন নিজেকে ফিরিয়া পাইল, ভণ্টুকে ঘুরিয়া বসিতে দেখিয়া। দর্পের সঙ্গে সতেজ কণ্ঠেই শুক্লা বলিল, আপনি উপকার করেছেন মনে রাখবো, কিন্তু আমার—এই কয়টি কথা বলিতেই ঝরঝর করিয়া দু'চোখের জলধারায় শুক্লার কথা অসমাপ্ত থাকিয়া গেল। অশ্রু সারা গণ্ড ব্যাপিয়া অঝোর ধারায় নামিতে লাগিল।

বাহিরেও আবার নতুন করিয়া বৃষ্টির ধারা নামিয়াছে।

ভণ্টু বিব্রত হইয়া উঠিল। একটু ভাবিয়া শুক্লাকে বলিল, আপনি কি বল্‌বেন বলুন।

নিজেকে শুক্লা সাম্‌লাইয়া লইল। তারপর বলিল, জানিনা, কেন আপনি মাকে উত্তেজিত ক'রে আমার এত বড় সর্ব্বনাশ কর্‌লেন! আমি তো কোনদিন আপনার পথে বাধা হইনি! উপকারের বিনিময়ে আপনি যথেষ্ট টাকা পেয়েছেন, এবার আমায় মুক্তি দিন। কথাগুলি বলিয়া শুক্লা হাঁপাইতে লাগিল।

আহত হইয়া ভণ্টু বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিল, আপনি আমায় বিশ্বাস করুন, আমি কোনদিনও আপনার সাম্‌নে উপস্থিত হবো না। আজকের এই ঘটনাকে আমি এখনো বড় করে দেখিনি, আর কোনদিন যে দেখবো তাও মনে হয় না। এ আমার কাছে তুচ্ছ বলেই মনে হচ্ছে। যাক্‌গে, মানুষ মাত্রেরই ভুলভ্রান্তি হ'য়ে থাকে। যদিও আমি স্বইচ্ছায় আপনাদের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে জড়াইনি কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আমি নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জড়িয়ে পড়্‌তে বাধ্য হ'লাম। আপনি বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, তবু বল্‌ছি, আমি আপনাদের একটি কানা কড়ির লোভেও প্রলোভিত হইনি। শুধু আপনার মা—। কিন্তু থাক্ সে কথা। আমি সামান্য মানুষ। টাকা আমার কাছে সবকিছু নয়। রেখে দিন, এই নিন আপনার পিসিমার দেওয়া যৌতুক। সোনার ডিস্‌খানি শুক্লার কাছে সরাইয়া দিয়া ভণ্টু উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার বলিল, আমি যে কাপড় জামা পরে' প্রথম দিন আপনাদের বাড়ী এসেছিলাম, শুধু তাই নিয়েই আমি চলে' যাবো। আপনার শান্তির পথে, স্বাধীনতার পথে আমি কোনদিন বাধা হবো না। আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার খুশিমত চল্‌বেন।

কিছুক্ষণ সমস্ত নীরব। ভণ্টু ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর অতি···সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। যাইবার পর ওদিক হইতে দুয়ারটি আবার ভেজাইয়া দিল।

শুক্লা উবুড় হইয়া শুইয়া রহিল, বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নীলা আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া শুক্লার পিঠে হাত দিয়া ডাকিল, খুকী!

পিসিমণি বলিয়া ছোট মেয়ের মত নীলার বুকের ভিতর মুখ রাখিয়া শুক্লা কাঁদিতে লাগিল।

শোন্ খুকা, লক্ষীটি কাঁদিস্ না। তুই কাঁদলে আমি কত কষ্ট পাই তা' তুই জানিস্। আশীষকে অমন করে যা' তা' বল্লি কেন? ও কত মহৎ, একবার ভেবে দেখেছিস্?

ঝঙ্কার দিয়া শুক্লা বলিয়া উঠিল, ওর মহত্ত্ব তোমরাই দেখ। আমি ভাব্‌ছি ওর কি স্পর্দ্ধা! কি করে' তোমাদের বশীভূত করে' অনায়াসে আমার পাশে এসে বসলো!

ছি ছি খুকী তুই না লেখাপড়া শিখেছিস্? তোর মুখে এ রকম কথা শুনতে পাব তা' আশা করিনি!

শুক্লা তেমনি বিরক্তির সুরেই বলিয়া উঠিল, আমিও আশা করিনি যে তোমরা আমাকে একটা যার তার সঙ্গে ধ'রে বিয়ে দেবে। তাই যদি তোমাদের ইচ্ছা ছিল তাহ'লে কেন আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলে, কেন আমায় ছোট বেলায় যার তার সঙ্গে একটা বিয়ে দিয়ে দাওনি।

একটু বিরক্তির সঙ্গে নীলা উত্তরে বলিল, আমাদের সেই অপরাধের শাস্তি দেবার জন্যেই কি তুই প্রতুলের মত ছেলেকে বিয়ে ক'রতে যাচ্ছিলি? আদর করে স্বামী বলে যা'কে নিজের পাশে স্থান করে' দিয়েছিলি, শুধু এখন ভাব, তা'র কি স্পর্দ্ধা!

শুক্লা বলিল, স্বামীর স্থান প্রতুলকে আগে কোনদিনই করে দিইনি, কেন ও কথা বলছ? পিসিমণি, শুধু এতদিন আমাকেই দেখে এসেছ, কিন্তু আমার মনের শক্তি যে কতখানি তা' দেখনি। এবার তোমারা তা'ই দেখবে। তোমরা বংশের সম্মান রাখ্‌বার জন্যে তোমাদের কর্ত্তব্য সারলে, কিন্তু এ-কথাটা ভেবে দেখলে না—যে কার হাতে আমাকে স‌ঁপে দিচ্ছ। সামান্য একটা বাড়ীর মাষ্টার ছাড়া যে আর কিছু নয়! আজ যদি বাবা থাকৃতেন,—বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে শুক্লা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

অন্য সময় হইলে হয়তো নীলা এ-কথায় খুবই ব্যথা পাইত। আজ কিন্তু এ-কথায় নীলার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। দীপ্তকণ্ঠে নীলা বলিল, এতে আমার পিতৃপুরুষের সম্মান কিছুমাত্র লাঘব হয় নি, বরং অরূপের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। একটা বাঁদরের হাতে পড়্তে জলজ্যান্ত বউ বর্ত্তমানে। সে তোমার কাছে ভণিতা ক'রে তোমার মন জয় করেছিল, তার বাহাদুরী হচ্ছে সে অভিনেতা হিসাবে প্রধান বটে! তবে আশীষের সম্বন্ধে তুমি এতদিন আমায় যা' বলে এসেছিলে, সব ভুল।

যাক্ তুমি যা' ভাল বুঝেছ বলেছ—কিন্তু স্বামীকে এমন ক'রে তাচ্ছিল্য —আর অপমান ক'রে কথা বলাটা আমাদের হিঁদুর ঘরের মেয়ের পক্ষে পাপ এবং যে শোনে সেও মহাপাপী! এ-কথাটা ভুলোনা এখন থেকে। সে তোমারই মত আমাদের আদরের, তোমার শুভাশুভ তা'র শুভাশুভর ওপর নির্ভর ক'রছে। তা'র বিরুদ্ধে অন্ততঃ আর আমাদের সাম্‌নে তুমি কিছু বলোনা—এই আমার অনুরোধ। প্রতুলকে আর তাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বিচার কর যে কে সত্যিকারের মহৎ! প্রতুলকে বিয়ে ক'রলে আজ নিজের কি সর্ব্বনাশ ক'রতে ভেবে দেখ!

পিসিমণি, এতো করে কেন বল্‌ছ। প্রতুলের ছায়ার ক্ষীণ রেখাও আর আমার চোখের সাম্‌নে কোন দিন ভেসে উঠবে না! এত ভঙ্গুর, এত ক্ষণস্থায়ী আমার মনের সংকল্প নয় জেনে রেখে দিও। এই বাড়ীতে আমি কিছুই চাই না—শুধু একখানা ঘর পেলেই আমার যথেষ্ট। আমার মন যা' স্বীকার ক'রতে পাচ্ছে না—তাকে কোন যুক্তি দিয়ে তোমরা বাধ্য করাতে পারবে না—কিছুতেই না।

নীলার আর তর্ক করিতে প্রবৃত্তি হইল না—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কিছুক্ষণ শুক্লার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ও ঘরে বেবী কাঁদিয়া উঠিল, নীলা আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

নিজের ঘরখানিতে ভণ্টু ঘুমাইতেছিল, হঠাৎ কাহার নরম স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

নীলা যত্নসহকারে তোয়ালে দিয়া ভণ্টুর মাথার ভিজা চুলগুলি মুছিয়া দিতেছিল।

ভণ্টু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতে গেল।

নীলা বাধা দিল, থাক্। ব্যস্ত হয়ো না—মাথাটা মুছে দিই। মাথার চুলগুলো বড্ড ভিজে গেছে।

নীলা বাহাদুরকে ডাকিয়া খুব খানিকটা বকিল, বৃষ্টির রাতে জানালা বন্ধ না করার জন্য।

নীলা চলিয়া গেলে ভণ্টু উঠিয়া বসিল। মাথাটা বড় ভার হইয়াছে।

গত রাত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল,—স্বপ্ন না সত্য! মনে পড়িয়া গেল,—ভূমিকম্পে মানুষের কি ভাগ্যবিপর্য্যয়ই না ঘটিয়াছিল—সেইরূপ ভণ্টুর অদৃষ্টে রথ-চক্রের কি বিরাট পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়া গেল!

যে বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া ভণ্টু এতদিন স্বচ্ছন্দমনে নিজের কর্ত্তব্য সারিয়া চলাফেরা করিতেছিল আজ তাই তাহার নিকট অত্যন্ত রূঢ় হইয়া ঠেকিল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় পড়িয়া একি দুর্ভোগ! দুচোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল তাহার।

রাগ হইল নিজের উপর। কেন সে প্রলোভনে পড়িয়া চাক্‌রি লইল! কেন সেদিন শুক্লার নিদারুণ অপমান সহিয়াও তাহাদের বাড়ীতেই আশ্রয় লইল! আর কাল রাতেই বা কেন সে রাণীমার কথায় রাজী হইয়া গেল! কি প্রয়োজন ছিল পরের উপকারার্থে নিজেকে এতখানি বিপন্ন করার!

হঠাৎ উর্ম্মির ডাকে ভণ্টুর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল।

উর্ম্মি ও তাহার গুটীকতক বন্ধু আসিয়া দাঁড়াইল ভণ্টুর সম্মুখে।

উর্ম্মি ডাকিল, মাষ্টারমশাই।

অপর একটি বালিকা বাধা দিয়া বলিল, যা, মাষ্টারমশাই কেন, জামাইবাবু।

উর্ম্মি একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, কাল রাতে খুব মজা হ'ল, না মাষ্টারমশাই ?

উর্ম্মিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ভণ্টু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল,—কথা বলিতে গেলে পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া যায়! কিছুক্ষণ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ভণ্টু আস্তে আস্তে বলিল,—না উর্ম্মি, মজা একটুও হয়নি।

উর্ম্মি বলিল, আমার কিন্তু খুব মজা লেগেছিল। মা, পিসিমণি, কাকু সকলেরি ভাল লেগেছে।

—প্রতুল চলে' গিয়ে খুব ভালই হয়েছে, কি বলিস্, না ভাই ? উর্ম্মি বন্ধুদের লক্ষ্য করিয়া বলিল।

তাহারাও সমস্বরে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, ভালই হয়েছে।

ভণ্টু ধীরভাবেই আবার বলিল, না উর্ম্মি, ভাল একটুও হয়নি। বরং প্রতুলের সঙ্গে বিয়ে হ'লেই ভাল হ'ত। একি হ'ল জান তো? তোমাদের বাড়ীতে আর আমার থাকা চল্‌বে না। তোমাকে রোজ আর দেখতে পাবো না, পড়াতেও পারবো না। তোমাকে ছেড়ে আমার যে বড্ড কষ্ট হবে। আমাকে যে আজই চ'লে যেতে হবে।

উর্ম্মি বিব্রত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। না মাষ্টারমশাই, আপনি যাবেন না। আপনি গেলে···সত্যি বল্‌ছি আমারও খুব মন কেমন করবে।

ভণ্টু বলিল, আর যে তা' হয় না উর্ম্মি।

বাসী বিয়ের সময় উপস্থিত।

রাকাবাবু ডাকিতে আসিলেন ভণ্টুকে।

ভণ্টু আবার শিহরিয়া উঠিল! রাতের চুপিসারে যাত্রাদলের 'এক্ট' না হয় করিয়াছিল সে, দিনের বেলায় সব লোকের সামনে আবার উপস্থিত হইতে হইবে, অভিনয় করিতে? আবার সেই লজ্জা অপমানের সম্মুখীন হইতে হইবে? যে শুক্লার উপেক্ষাভরা চাহনি মনে পড়িলে ভণ্টুর ঘৃণায় অপমানে দেহ, মন এখনও পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠে, সেই শুক্লাকে কেন্দ্র করিয়া আবার তাহাকেই অভিনয় করিতে হইবে?

বাসী বিয়ের নিয়ম ভণ্টুর জানা আছে। কি করিয়া সর্ব্বসমক্ষে নারায়ণ ও অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া সে শপথ গ্রহণ করিবে—আজ হইতে লইলাম ভার বধূর। শুক্লার যে একবেলারও ভার লইবার যোগ্যতা তাহার নাই।

পথ চলতি পথিক যে, মুসাফিরখানাই যাহার প্রকৃত আশ্রয়, এই দু'ঘণ্টা পরেই তাহাকে আবার কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিতে হইবে, কে জানে!

তাই অনিচ্ছায় দেহভার টানিয়া ভণ্টু যাইয়া উপস্থিত হইল বিবাহ প্রাঙ্গণে।

যন্ত্রচালিতের মত 'বর' সাজিয়া ভণ্টু কর্ত্তব্য সারিয়া চলিয়াছে, পুরোহিতের কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল।

শুক্লার দু'টি হাত ধরিয়া তাহাকে নাকি খই ফেলিতে হইবে আগুনের মধ্যে। বেচারী শুক্লা! তাহারি বা অদৃষ্টের কি পরিহাস! নিয়ম অনুসারে তাহারি পার্শ্বচরী হইয়া তাহারি অনুবর্ত্তিনী হইতে হইবে শুক্লাকে সর্ব্বসময়ে—সর্ব্বক্ষণে!

না হাসিয়া পারা যায় না। হায় বিধিলিপি!

পুরোহিত আবার বলিল, বাবা, জোরে জোরে মন্ত্র বল।

ভণ্টু বলিল, মনে মনে বলে' যাচ্ছি। ভণ্টু মনে মনেই প্রতিজ্ঞা করিল,—আজ থেকে দুঃখের ভার নিলাম।

সিঁদুর দানের সময় ভণ্টু আবার দেখিল শুক্লার কপালের শিরা দুইটি সাপের মত ফুলিয়া উঠিতেছে।

সকলের সব অনুরোধ এড়াইয়া ভণ্টু আপনার ঘরটিতে চলিয়া আসিল এবং ক্লান্ত দেহ তার বিছানার উপর এলাইয়া দিল!

—বাহাদুর, একটু জল খাওয়াতে পারিস্?

আজ ভণ্টুর বাহাদুরকেও ডাকিতে সংকোচ বোধ হইতেছিল। আজ যেন এ সংসারে ভণ্টুর কোন দাবিই নাই।

চতুর বাহাদুর,—সে সব বুঝিয়া ফেলিল ভণ্টুর মনের কথা। সে কিছুই বলিল না।

ভণ্টুকে এক গ্লাস জল দিয়া বাহাদুর ঘরের এক কোণে নীরবে বসিয়া রহিল।

ভণ্টু বুঝিল, বাহাদুরেরও ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

অরূপ আসিয়া ডাকিল, মাষ্টারমশাই, ভিতরে চলুন, মা ডাক্‌ছেন।

ভণ্টু বলিল, মাকে বলো গিয়ে আমার ক্ষিদে মোটেই নেই। খেলেই শরীর খারাপ ক'রবে।

অরূপ বলিল, থাক্ তবে। তারপর একটু কি ভাবিয়া বলিল,—আপনার অপমান যতখানি হয়েছে তার শতগুণ অপমান আমি যেন নিজে অনুভব করছি। কেন জানি না, ওরা সবাই মিলে আপনাকে ন দিল। সেই সঙ্গে আমাকেও ফেলে দিল যথেষ্ট অসুবিধের বা

য়া আমার যে সামনেই পরীক্ষা!

—নিজের উপর বিশ্বাস রেখে সাধনা করে যেও অরূপ, জীবনে কোন পরীক্ষার জন্য কোনদিন আটকাবে না। তবে—হাঁা, চাই নিজের অধ্যবসায়। ভণ্টু কথা কয়টি অরূপকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া গেল।

বেয়ারা আসিয়া ভণ্টুকে দু'খানা চিঠি দিয়া গেল। দু'খানা চিঠিই শ্যামলালের বাড়ী হইতে আসিয়াছে।

একখানি চিঠি দুর্গাবতী লিখিয়াছেন, অপরখানি বোন গৌরীর চিঠি। ভারতীর 'সাধ' উপলক্ষে দুর্গাবতী টাকা পাঠাইয়া—গঙ্গাজল ও গৌরীকে আনাইয়াছেন। গৌরীর ভাসুরপো আসিয়া দিয়া গিয়াছে।

দুর্গাবতী চিঠিতে আরও লিখিয়াছেন—শ্যামকে লইয়া ভণ্টু যেন এই সপ্তাহে বাড়ী আসে।

... ...

অরূপ ফিরিযা আসিল একা।

রাণীমা বুঝিলেন, মেয়ে চরম অশান্তি আরম্ভ করিয়া দিযাছে। এমন কোন সাংঘাতিক কথা বলিয়াছে যাহাতে ভণ্টুর প্রবৃত্তিতে বাধিতেছে এ বাড়ীতে জলস্পর্শ করিতে।

নালা খাবার আয়োজন করিয়া বসিয়াছিল। অরূপ একা আসিতেই কোন কথা আর অরূপকে জিজ্ঞাসা না করিয়া শুধু রাণীমাকে বলিল, —আমি আজকের মত বরানগরে চল্‌লাম, ননদের বাড়ী।

সন্ধ্যার পর ভণ্টু শ্যামলালের মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভণ্টুকে অনেকদিন পরে দেখিয়া শ্যামলাল বলিল, তারপর কি মনে করে', ভাল আছিস্ তো? উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কথা কয়টি বলিয়া ভণ্টুকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া শ্যামলালের কেমন সন্দেহ হইল। বিস্ময়ের সহিত শ্যামলাল জিজ্ঞাসা করিল, কি রে ব্যাপার কি?

ভণ্টু একটু নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, যা' সন্দেহ করছ তাই। একে একে ভণ্টু সব ঘটনাই শ্যামলালকে বলিয়া গেল।

শ্যামলাল সজোরে ভণ্টুর পিঠে একটা থাবড়া মারিয়া বলিল, সাবাস্, সাবাস্! তোর 'লাক্' বটে! আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে ভণ্টু, বলে' বোঝাতে পারছি না। তুই সুখী হ'।

ভণ্টু মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, তুমি যা' ভাবছ শ্যামদা—সে গুড়ে বালি। রাজকন্থে হুঁসিয়ার মেয়ে। তবে আমি রাজকন্থে বা অর্দ্ধেক রাজত্বি এ দু'টোর একটাও চাইনে। আবার তোমারই গলগ্রহ হ'তে হবে দিন কতকের জন্থে। তাই এলাম শ্যামদা, কাল সকালেই কিন্তু আমি এখানে উঠে আস্‌বো।

উত্তেজিত হইয়া শ্যামলাল সোজা হইয়া বসিল—ভণ্টে, আর পাগলামি করিস্‌নে। ভগবান্ তোকে নিজে হাতে তুলে দিয়েছেন। আর ইচ্ছে করে' হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়াস্‌নে।

—তার থেকে বলি, যেগুলো যৌতুক পেয়েছিস্ সেগুলো বরং চেয়ে নিয়ে আয়—আমি বিলিব্যবস্থা করে' দিচ্ছি।

—জানিস্ ভণ্টু, জীবনে সুখ সুবিধে কিছুই দেখ্‌লাম না। শুধু সঞ্চয় ক'রেই যাচ্ছি। শুধু জানি, পয়সাই হ'ল এ জীবনে সব—তা' ছাড়া কেউ কারো নয়। আজ মা, বউ অসন্তুষ্ট হচ্ছে, বুঝতে পারছি। কিন্তু এও বলি, টাকা না থাকলে দেখ্‌তাম ঐ ওরাই তখন কত বল্‌তো। ওরে বাপু, অনেক দেখ্‌লাম, অনেক দেখেছি।

ভণ্টু বলিল, তুমি যা' বুঝেছ একবারে সার বুঝেছ। কিন্তু, আমি পারবো না শ্যামদা। তবে তোমার আশ্রয় আমার দিন কতক প্রয়োজন, আর শরীরটাও বড় খারাপ যাচ্ছে। ওদের কাছে এ মাসের মাইনেটা

পাবো, আমার নিজের কাছেও গোটা তিরিশ আছে—মাস দুই বেশ চলে' যাবে।

একটু চিন্তা করিয়া শ্যামলাল বলিল, তোর যতদিন ইচ্ছে হয় থাক্, সে আর বেশী কথা কি! তবে তুই বরং এক কাজ কর, আমার বাড়ী চলে' যা। তোর বউদি, মাসীমা খুব খুশি হবে। আর আমিও নিশ্চিন্ত মনে পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'তে পারব। তোর তো এবার এম্-এ পরীক্ষা দেবার কথা? তুইও ভাল করে' পড়্‌গে।

শ্যামলালের বাড়ীর অবস্থা এবং যে টাকা সে বাড়ীতে প্রতিমাসে পাঠায় তাহাতে ভণ্টু যদি ছ'মাসও বসিয়া খায়—শ্যামলালের কিছু আসে যায় না। বরং এক কথায় সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। যদিও শ্যামলাল বাড়ী কমই যায়, তবু চিন্তা ঠিকই আছে। ভারতীর শরীর খারাপ, মা একা।

ভণ্টুকে নিরুত্তর দেখিয়া শ্যামলাল বলিল, চল্ ভণ্টু, তোর সঙ্গে যাই, তোর শাশুড়ীর সঙ্গে দু'টো কথা বলিগে।

বাধা দিয়া ভণ্টু বলিল—না, না, থাক্ শ্যামদা, ওসব ঝঞ্ঝাট থাক্।

খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া শ্যামলাল বলিল, তা' হয় না ভণ্টু। আমি যেখানে তোর দাদা, সেখানে আমার তো একটা কর্ত্তব্য আছে। তা' ছাড়া বউমা অর্থাৎ শুক্লা মাকে একবার নিয়ে যাবার কথা বলা তো দরকার। ভাব্‌বে সত্যিই বুঝি কেউ নেই।

সোল্লাসে কিসের এক প্রেরণায় শ্যামলাল গায়ে জামাটা চড়াইয়া বলিল, চল্ ভণ্টু, শুক্লা মাকেও একবার দেখে আসি।

ভণ্টু হাসিয়া বলিল, চল, সাক্ষাৎ রণচণ্ডী দর্শন ক'রতে। ঘুঘু দেখেছো শ্যামদা, ফাঁদ তো দেখনি? চল, দেখিয়ে আনি।

ভণ্টু আসিতে উর্ম্মি ছুটিয়া আসিল।

কোথায় গিয়েছিলেন মাষ্টারমশাই, মা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন। জানেন, পিসিমণি চলে' গিয়েছে দিদিভাইএর ওপর রাগ করে'। দিদি ভাইএর সঙ্গে কেউ কথা বল্‌ছে না। আমিও একটা কথা বলিনি, বয়ে গেছে আমার।

শ্যামলাল ভণ্টুকে বলিল, এটি শালী বুঝি?

উর্ম্মি বিস্ময়ের সুরে বলিল, ওমা, কি কথা! আমি শালী হ'ব কেন —আমি তো উর্ম্মি, ডোরা, রাধারাণী কত কি! একটু গম্ভীর হইয়া আবার বলিল, এ রকম কথা বলা ভাল নয়। শালা, শালী বড্ড খারাপ গাল। মা শুন্‌লে খুব রাগ কর্‌বেন।

ভণ্টু হাসিয়া বলিল, সত্যিই ওঁর অন্যায় হয়েছে! আমার দাদা কিনা, মাকে না হয় বলে' কাজ নেই। কি বল?

একটু বিমর্ষমুখে উর্ম্মি বলিল, তবে না হয় থাক্, বল্‌বো না।

শ্যামলালের ভারি ভাল লাগিতেছিল মেয়েটিকে। উর্ম্মিকে কাছে ডাকিয়া বলিল,—সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে, 'শালী' বলে'।

উর্ম্মি বলিল, আমাদের মেট্রন বলেন, 'অন্যায় করলে পাপ হয়'।

শ্যামলাল অসহায়ের মত মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, তাই তো উপায়! —এখন মাকে গিয়ে বল দেখি, মাষ্টারমশাইএর দাদা এসেছেন; একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে চান। কেমন পারবে তো?

ওমা, এই আবার কাজ নাকি? আমি বলে কত বড় বড় কাজ করি, কি বলুন মাষ্টারমশাই?

রাণীমা ও রাকাবাবু আসিয়া শ্যামলালকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া অন্দরমহলে লইয়া গেলেন।

শ্যামলাল হতভম্ব হইয়া গেল ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ দেখিয়া! যেন সাজানো ইন্দ্রপুরী!

বিনীতভাবে শ্যামলাল রাকাবাবুকে বলিল, যদিও আমি সামান্য লোক ক্ষমতা আমার বিশেষ কিছুই নেই, তবু আমার ইচ্ছা—শুক্লা মাকে দু'দিন নিয়ে যাই--আমার গরিবের কুঁড়েঘরে।

রাকাবাবু একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, আপনি আপনার যোগ্য কথাই বলেছেন। বল্‌তে গেলে এখন আপনাদের জোরই বেশী। বিয়ে যখন দিয়ে দিয়েছি তখন আমরা বল্‌তেই বা কি পারি? তবে শুক্লার শরীর সম্বন্ধে একটু চিন্তা করা দরকার।

একটু অপেক্ষা করুন। রাকাবাবু 'বেল' টিপিয়া 'বয়কে' ডাকিলেন। 'বয়' আসিতে রাকাবাবু বলিলেন, 'দিদিসাহেবাকো বোলাও'।

রাণীমা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, দেওরের বোকামি দেখিয়া। এখুনি তো আবার ঐ ভদ্রলোককে অপমানসূচক কথা বলিতে শুক্লা কিছুমাত্র দ্বিধ বোধ করিবে না।

সুসজ্জিতা শুক্লা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল,—কাকু আমায় ডাকৃছ? অপরিচিত শ্যামলালকে গ্রাহ্যই করিল না। ভাবিল সাধারণ গ্রাম্য ভদ্রলোক, হয়ত কাকুর কাছে চাকৃরিপ্রার্থী।

শ্যামলাল এইবার বিব্রত হইয়া উঠিল। নিজের যে কি কর্ত্তব্য তাহাও ভুলিয়া গেল। ইহার সহিত তাহাদের ভণ্টুর বিবাহ হইয়াছে!

রাকাবাবু শুক্লাকে বলিলেন,—ইনি হ'লেন আশীষের দাদা। এঁর ইচ্ছা তোমাকে দু'দিনের জন্য এঁদের বাড়ীতে নিয়ে যান।

শুক্লা মুখখানিকে কুঞ্চিত করিয়া—একবার রাকাবাবুর মুখের পানে চাহিল। আস্তে আস্তে আবার কপালের উপর শিরা দুইটি দেখা দিল, শরীরের সমস্ত রক্ত আসিয়া মুখের উপর জমিয়ামুখ লাল হইয়া উঠিল ।

—কাকু, এইজন্তেই কি আমাকে ডেকেছ? তুমি কি আমার মুখ দিয়ে সেই কথা এই ভদ্রলোককে শোনাতে চাও?

হঠাৎ শ্যামলালের দিকে চাহিয়া শুক্লা হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইল।

রাণীমা কতকটা তবুও আশ্বস্ত হইলেন মেয়ের সুবুদ্ধি দেখিয়া।

শ্যামলালও ভিতরে ভিতরে ঘামিয়া উঠিয়াছিল। সে যেন কোন পদস্থ অফিসারের সামনে উপস্থিত হইয়াছে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য।

শুক্লা গ্রীবা উন্নত করিয়া শ্যামলালকে প্রশ্ন করিল, আপনি আমায় নিতে এসেছেন কেন, এবং কি সূত্রে বুঝিয়ে দিন।

শ্যামলাল সত্যিই জেরায় পড়িল। আমৃতা আমৃতা করিয়া কোনক্রমে বলিয়া ফেলিল,—আপনি আমার ভাইএর স্ত্রী কিনা, তাই আপনাকে নিয়ে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য।

শুক্লা কি একটা কঠিন কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু কি ভাবিয়া থামিয়া গেল। শুধু গম্ভীরভাবে বলিল,—আমায় মাপ করবেন, আমার শরীর মন এখন কিছুই ভাল নেই, এখন আমি কোথাও যেতে পারবো না—তা'ছাড়া যেখানে সেখানে যাওয়া আমার অভ্যেস নেই।

শ্যামলাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না না থাক্, আমি এমনি ব'লছিলাম, সত্যিই তো পাড়াগাঁয়ে যাওয়া আপনাদের পক্ষে কষ্টের বৈ কি!

শ্যামলালের কম্পমান কণ্ঠের ভীতি-বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া শুক্লা মনে খুশি না হইয়া পারিল না।

ক্ষণপরে স্বরটা একটু নরম করিয়া বলিয়া উঠিল,—হ্যাঁ, আপনার ঠিকানা নীচে ম্যানেজারের কাছে রেখে যেতে পারেন। পল্লীগ্রাম দেখার ইচ্ছা আমার একটু আছে, যদি সুবিধা করতে পারি, নিজে চেষ্টা ক'রবো।

রাকাবাবুর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া শুক্লা বলিল, কাকু, তাহ'লে এবার আমি যেতে পারি? আর কোন দরকার নেই তো?

রাকাবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন, না মা, আর কোন দরকার নেই, যেতে পার।

কাল হইতে শুক্লার সমস্ত শরীর যে বিষে জর্জরিত হইতেছিল—যে জ্বালায় জ্বলিয়া শুক্লার দেহ মন দগ্ধ হইতেছিল—আজ মা এবং কাকার সম্মুখে একটি নিরীহ ভদ্রলোককে উপলক্ষ করিয়া শুক্লা সেই বিষ উদ্‌গিরণ করিয়া দিল। লক্ষ্যস্থল ভদ্রলোক নয়,—তাহার মা এবং কাকা।

তাই যেন বিজয়-গর্ব্বে শ্লেষের হাসি মুখে আনিয়া শুক্লা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্যামলালও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতক্ষণে বুঝিল, ভণ্টুর প্রাপ্তি-যোগের প্রতি বৈরাগ্যের কারণ। অনেক দুঃখে এ গৃহে 'দণ্ডবৎ হইয়া' তাহার আশ্রয় লইতে চায় সে।

শ্যামলাল মনে মনেই ভাবিল, মেয়ে বটে একখানা—সিংহের উপর চড়াইয়া দিলেই হয়।

... ...

রাণীমার সহিত ভণ্টু পরদিন সকালে দেখা করিল।

'মা', বলিয়া সম্বোধন করিয়া ভণ্টু বলিল,—আমি আজই যাব মা। আপনি আমায় অনুমতি দিন।

রাণীমার মুখের উপর আষাঢ়ের একখণ্ড কাল জলভরা মেঘ আসিয়া দেখা দিল। অতি করুণ সুরে রাণীমা বলিলেন, আমি জানি, তোমায় যেতে হবে।

বড় দুঃখ থেকে গেল, আমরা তোমার ওপর বড় বেশী রকম 'অবিচার করলাম বলে'। বাবা আশীষ, আমার অনুরোধ, আমার

অবস্থা বুঝে আমাকে ক্ষমা করো। আমি সব বুঝেও তোমার ওপর অবিচার করেছি। তাই আমি তোমার ক্ষমার পাত্র। তুমি আমাকে ক্ষমাই ক'রো।

—আর আমার একটা অনুরোধ,—যেদিন ওর আর কোন উপায় থাকবে না—যেদিন ও মনের জ্বালায় পুড়ে ছাই হয়ে' যাবে—হয়ত সেদিন আমি থাকব কিনা জানি না,—সেদিন যেন ও তোমার আশ্রয় পায়। তোমার অন্তরের পরিচয় আমি পেয়েছি আশীষ। আমি জানি, তুমি আমার শেষ অনুরোধ রাখ্‌বে।

নিজের অজ্ঞাতে ভণ্টুর চোখ দু'টি সজল হইয়া উঠিল। কি বলা উচিত সে যেন ভুলিয়া গেল।

শুধু যথাযোগ্য স্থানে যথোচিত প্রণাম এবং অভিবাদনের পর বাহাদুরকে একখানি 'রিক্সা' ডাকিতে বলিয়া নিজের ঘরটিতে গিয়া প্রবেশ করিল।

রিক্সা-চালক 'রিক্সা' লইয়া উপস্থিত। ইতিমধ্যে ভণ্টুও নিজে প্রস্তুত হইয়াছে।

অরূপ আসিয়া দাঁড়াইল। চোখ দু'টিতে যেন অশ্রু টল্ টল্ করিতেছিল, কিছু না বলিয়া ১০০৲ টাকা ভণ্টুর পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল।

অরূপের মাথায় ক্লান্ত হাতখানা রাখিয়া ভণ্টু বলিল, মন খারাপ করো না অরূপ। আমি আমার দেহটাকেই টেনে নিয়ে চলেছি কিন্তু মন আমার পড়ে' রইল এইখানে, তোমাদের কাছে। আমি বলছি, তুমি প্রত্যেক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে।

খাজাঞ্চী আসিয়া এই মাসের মাহিনা ভণ্টুকে গুণিয়া দিয়া গেল।

সকলেই আসিল, কিন্তু উর্ম্মিকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ভণ্টু বোধ হয় এরই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কাঞ্চী অনেক চেষ্টা করিয়াও উর্ম্মিকে বাহির করিতে পারিল না।

রাকাবাবু দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—পাঁচখানা ঘরের গাড়ি থাক্‌তে বাবা তুমি 'রিক্সায়' যাচ্ছ।

রিক্সাচালক রিক্সা ঠেলিতে যাইবে—হঠাৎ বাহাদুরের কথা ভাসিয়া আসিল,—এই রিক্সাওয়ালা, থোড়া রোখো।

খাকি সার্ট, প্যাণ্ট পরিয়া এবং তাহার ছোট টিনের সুটকেস্ ও সেতারটি হাতে লইয়া বাহাদুর আসিয়া দাঁড়াইল।

সকলেই এক বাক্যে প্রশ্ন করিল, তুই কোথায় যাবি?

গম্ভীর হইয়া বাহাদুর উত্তর দিল, মাষ্টারবাবুর সঙ্গে।

ভণ্টু বলিল, তুই কোথায় যাবি? আমার নিজেরই আস্তানার ঠিক নেই।

বাহাদুর সে কথার উত্তর না দিয়া অল্প হাসিয়া রাণীমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, কাঞ্চীকে একটু দেখ্‌বেন।

রাণীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সত্যিই যাবে বাহাদুর?

বাহাদুর বুট দিয়া মেঝে ঘষিতে ঘষিতে বলিল, হ্যাঁ, আমি ঠিকই যাব। মাষ্টারবাবুর জ্বর। একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার বলিল, যদি আমায় কাঞ্চীর মাহিনার দরুন কিছু দেন।

রাণীমা খুশি হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত বাহাদুরই তাঁহার অসুস্থ জামা'য়ের সম্মান রাখিল।

বাহাদুরের হাতে নীলা লুকাইয়া বেশী ১০০৲ টাকা দিতে গেল,—রেখেদে বাহাদুর, যদি দরকার হয়।

বাহাদুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীলার মুখের পানে চাহিল, অত টাকা কিসের জন্য ?

নীলা লজ্জিত হইল, রাণীমা স্তম্ভিত হইলেন !

বাহাদুর জানাইল, টাকা লইলে মাষ্টারবাবু অসন্তুষ্ট হইবেন। ভাবিবেন, বাহাদুর টাকার লোভে তাঁহার সঙ্গ ধরিয়াছে।

কাঞ্চীর মাহিনা পনরো টাকা লইয়া বাদবাকী নীলার হাতে ফেরত দিয়া রিক্সার পা-দানিতে ছুটিয়া গিয়া বাহাদুর বসিল।

রিক্সা গেট পার হইয়া যখন বড় রাস্তায় পড়িল, ভণ্টু একবার রাজবাড়ী পানে চাহিল, দেখিল, জানালার গরাদে ধরিয়া শুক্লা উদাস দৃষ্টিতে রাজপথ পানে চাহিয়া……

ভণ্টু আর একবার ভাল করিয়া দেখিতে গেল, কিন্তু রিক্সা এক হেঁচ্‌কা টানে তখন তাহাকে রাস্তার বাঁকে লইয়া গিয়াছে।

শ্যামলাল হাওড়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। পূর্ব্বের কথামত ভণ্টু ও বাহাদুর যাইয়া শ্যামলালের সঙ্গে ট্রেনে বসিল। কোন প্রকারে ট্রেনে উঠিয়া ভণ্টু প্রবল জ্বরে সেই যে শুইল, তাহার পর আর মনে নাই। শ্যামলালের গ্রামের ষ্টেশনে পৌঁছিয়া বাহাদুরের সাহায্যে আবার গরুর গাড়িতে উঠিয়াই সে শুইয়া পড়িল।

… … … …

ভারতীর শরীর মোটেই ভাল নয়। হাসিখুশি যেন ভুলিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা বিমনা।

গৌরী আসিয়াছে, তবু দুর্গাবতী খানিকটা নিশ্চিন্ত।

আজ ভারতীর 'সাধ' উপলক্ষে সামান্য কয়েকজন লোকজন খাওয়ানো

হইয়াছে। দুর্গাবতী সাধ্যাতীতভাবে যোগাড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে বিমলাকে পাইয়া দুর্গাবতী খুব আনন্দিত হইয়াছেন।

দুই সখীতে মিলিয়া পুরানো দিনের কত গল্পই করিয়া যায়। অফুরন্ত গল্প-ভাণ্ডার, একাংশও যেন শেষ হইতে চায় না। বিমলা আবার পরশু দিন যাইতে চায়।

দুর্গাবতী কিছুতেই রাজী হন না।

পল্লীগ্রামের ব্যাপার। কেরোসিন বিভ্রাট। সন্ধ্যাবেলাতেই যেন মনে হয় অনেক রাত। কয়দিন ধরিয়া শীতও বেশ পড়িয়াছে। একটা জ'লো হাওয়া সমানে কয়দিন ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

কাঠের উনানের নিবন্ত আঁচের পার্শ্বে বসিয়া দুই সখী গল্প করিতেছিল।

ভারতী গৌরীর মেয়েটিকে কোলে বসাইয়া গল্প বলিতেছিল।

গৌরী খুব কাজের মেয়ে। ব্যবহারও চমৎকার। এবেলা মা এবং মাসীমাকে রান্নাঘরে যাইতেই দেয় না। ভারতীকেও নড়িয়া বসিতে দেয় না। সব কাজ নিজেই করে।

ঝিঁঝিপোকাগুলি একসুরে ডাকিয়া চলিয়াছে।

গৌরীর মেয়ে প্রশ্ন করিল, মাসীমা, ঝিঁঝিপোকাগুলো কি বল্‌ছে?

সাদরে মেয়েটির গায়ে হাত বুলাইয়া ভারতী বলিল, আমি যেমন তোমায় গল্প বলছি না, ওমনি চাঁদের মা-বুড়িকে ঝিঁঝিগুলো রামায়ণের গল্প সুর করে পড়ে' শোনাচ্ছে।

ভারতীর কথা বলার ভঙ্গি দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

হঠাৎ গরুর গাড়ির ক্যাঁচ্‌ক্যাচানি শব্দ শোনা গেল।

দুর্গাবতী বলিলেন, ও বউমা, বোসেদের ননী ঠাকুরঝি এল বুঝি।

কথার বাধা পড়িল গাড়োয়ানের ডাকে,—ও মা-ঠাকরুণ একটা লণ্ঠন আনগো ? তোমাদের কুটুম এয়েচেন।

সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কোন রকমে লণ্ঠনটা উস্কাইয়া দুর্গাবতী দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

কে-গা, কে ?

শ্যামলাল সাড়া দিল, আমি মা।

দুর্গাবতী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলেন। শ্যামলাল গাড়ি করিয়া আসিয়াছে, তবে কি শ্যাম অসুস্থ ? উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে দুর্গাবতী ডাকিলেন, বাবা শ্যাম।

শ্যামলাল মায়ের কণ্ঠের আওয়াজে বুঝিতে পারিল চাঞ্চল্যের কারণ কি। একটু হাসিয়া বলিল, আমি ভাল আছি, তবে ভণ্টুর বড্ড জ্বর, তাই গাড়ি ক'রতে বাধ্য হ'লাম।

ঘটনা স্থলে বিমলা, গৌরী সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল। ভারতী আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শ্যামলাল সবিশেষ ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া গেল।

বিমলা একটু ভাল মানুষ ধরণের, অতশত বোঝেনা, রাজবাড়ীতে বিবাহ হইয়াছে ভালই ! এখন একবার পুত্রবধূর মুখ দেখিতে পাইলে জীবন স্বার্থক হয়।

দুর্গাবতী স্থির হইয়া সব শুনিলেন। তারপর বলিলেন শ্যাম, ভণ্টু কি আমার ফেল্‌না ছেলে। তারা না হয় বড়লোক, আমরা না হয় সামান্য মানুষ। পাত্র উঠে গেল বলে, শেষ পর্য্যন্ত আমার বাছার ওপর এ অত্যাচার কেন ? কি অধিকারে আমার দুধের বাছার জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিল ?

'রাজ-দুহিতা' না হয় হ'ল, তা' বলে আমার ভণ্টুর কড়ে আঙুলের যোগ্যতাও সে মেয়ের নেই।

ছেলে আমার আধখানা হয়ে গিয়েছে। এখন ভালয় ভালয় সেরে উঠ্‌লে বাঁচি।

ভণ্টুর কপালে ভারতী জল-পটি দিতেছিল।

'মুখপোড়া ছেলে, তোর অত দরদে কি দরকার ছিল?' কথা কয়টি বলিয়া দুর্গাবতী ভণ্টুর মুখের পানে চাহিলেন।

তারপর বাহাদুরের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'বেঁচে থাক বাবা তুমি, রাতের প্রাতর্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি'। নামেও যেমন বাহাদুর, গুণেও তেমনি বাহাদুর।

গৌরীও মাসীমার কথা সমর্থন করিয়া রাজবাড়ী আর শুক্লাকে এক মনে বসিয়া গালি পাড়িতে লাগিল।

বিমলা একটু হাসিয়া বলিল, মা মেয়ে মিলে' না হয় গাল' দিচ্ছিস্, দে। আমি বলি গঙ্গাজল, তোর ছেলেই বা রাজী হ'ল কেন? তোর ছেলে তো একেবারে কচি খোকা নয়। ওদিকে শ্যাম এসেছে, বাহাদুর এসেছে, খাবার যোগাড় ক'রতে হবে না? বউমা বসে' ভণ্টুর মাথায় জল-পটি দিচ্ছে।

গৌরী লজ্জিত হইয়া রান্নাঘর পানে চলিয়া গেল।

শ্যামলাল মাসীমাকে দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইল। বিনা বাহুল্যের এমন স্বল্পভাষী মানুষ, শ্যামলালের চোখে খুব কমই পড়ে।

ভারতী যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনে যা কিছু আনন্দ, কে যেন দিন দিনই হরিয়া লইয়া যাইতেছে। দিন কাহারো সুখ

দুঃখের জন্ত অপেক্ষা করেনা, তাই দিন চলিয়া যাইতেছে। আপনার দেহটিকে বহিয়া চলিবার শক্তি যেন ক্রমশঃই ফুরাইয়া আসিতেছে ভারতীর।

ভাগলপুর হইতে মা, লইয়া যাইবার জন্ত বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতী সম্মত হয় নাই।

রাত্রে শুইয়া শ্যামলাল ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিল, দিন দিন এমন হ'য়ে যাচ্ছ কেন?

বিমনা হইয়া ভারতী উত্তর দিল, কি জানি।

ভুরু কোঁচকাইয়া শ্যামলাল বলিল, এ কিন্তু অন্যায়। বাঁচতে যেখানে হবে সেখানে শরীরটাকে মাটি ক'রে লাভ কি? তা'ছাড়া, সত্যিই আমি বুঝতে পারি না, তোমার এত মন খারাপের কারণ কি? তাই না হয় বুঝিয়ে বল।

ভারতী উত্তর দিল, বাঁচ্‌বার ইচ্ছাও নাই—আর তোমায় বুঝিয়ে বল্‌বার মত শক্তিও আমার নেই। শুধু ভয় হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে না পড়ি। তোমার অর্থের অপব্যবহার ক'রে তোমাকে যেন হয়রানি না করি।

মনে মনে উষ্ণ হইলেও শ্যামলাল সংযতভাবে বলিল,—দেখ ভারতী, আমি যে কিছু না বুঝি তা' নয়। আমি বুঝি, মানুষ মাত্রেই কিছু না কিছু আশা করে। আর আমিও আশা করি আমার অনাগত ভবিষ্যতের উপর। বর্ত্তমানটাই আমার কাছে সব কিছু নয়। আমি চাই, আমার পরে যারা আস্‌বে আমার জায়গায়, তারা যেন দারিদ্র্যের পীড়নে আমাকে কখনও অভিশাপ না দেয়। হয়ত তোমাদের চক্ষে আমি কঞ্জুস কিপ্‌টে আরও কত কি। কিন্তু আমার কাছে অপরের অনুকম্পা প্রার্থী হওয়ার থেকে ওই কৃপণ আখ্যাও শতগুণে শ্রেয়ঃ।

ভারতীর দুর্ব্বল শরীরে বেশী বলিবার বা বকিবার মত শক্তি ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্যামলালের কথা এককথায় সমর্থন করিয়া পাশ ফিরিল।

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে আকাশের বুকে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া জল্‌জল্‌ করিতেছে। তৃতীয়ার চাঁদ সবেমাত্র বাঁকা হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, কি ভাবিয়া ভারতীর দু'টি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। দূরে একটা শেয়াল ডাকিতেই আরও কতকগুলি বিকট রবে ডাকিয়া উঠিল। ভারতী ভয়ে স্বামীর বুকের মধ্যে আশ্রয় লইল।

ঘুমের ঘোরে নিবিড় ভাবে শ্যামলালও ভারতীকে জড়াইয়া ধরিল।

ভারতী শ্যামলালের বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়া মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় যেন হাহাকার করিয়া উঠিল।

নিজের অজ্ঞাতে শ্যামলালের বক্ষ চোখের জলে ভাসিয়া গেল। শ্যামলাল কিছুমাত্র জানিতেও পারিল না······

ভণ্টুর ক'দিন খুব জ্বর গেল।

বাহাদুর প্রাণপণে সেবা করিল।

দুর্গাবতী প্রায়ই বলিতেন, আহা বাছারে, ভাগ্যে তুই ছিলি।

ভারতীও রুগ্ন শরীর লইয়া যথাসাধ্য ভণ্টুর সেবা করিল।

ভারতীর সারা অন্তর যেন ভণ্টুর প্রতি সমবেদনায় ভরিয়া উঠে। ভারতী বোঝে, ভণ্টুর অন্তরে তীব্র ভাবে শুক্লার কথাগুলি বাজিয়া আছে। সহ্য করিতে পারে নাই ভণ্টু, তাই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। ভাবিয়া পায় না ভারতী, স্ত্রী—সে কি করিয়া স্বামীকে উপেক্ষা করে।

নিজের কথা মনে পড়িয়া যায়। মনের অশান্তিতে ভারতী পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, মৃত্যুর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তবুও ঘুণাক্ষরে স্বামীকে নিজের কথা জানিতে দেয় নাই। জীবনে নিজের সুখই কি সব চাইতে বড়!

ভণ্টু একটু ভাল হইলে গৌরী ও বিমলা চলিয়া গেল।

ভণ্টুও যাইবার জন্য ব্যস্ত।

দুর্গাবতী বাধা দেন, ওমা, এই রোগা শরীর নিয়ে এর মধ্যে কোথা যাবি বাছা?

ভণ্টু বলিল, আর কেন, চেষ্টা করতে হবেতো আবার চাকরির জন্য।

দুর্গাবতী বলিলেন, আর দিনকতক থাক্।

ভারতীর শরীরের অবস্থা দিন দিনই খারাপ! বড় দুর্ব্বল। হাত পা, মুখ বেশ ফোলে। জ্বরও মধ্যে মধ্যে হয়।

ভারতীর শরীরের অবস্থা দেখিয়া দুর্গাবতী ও ভণ্টু বেশ চিন্তিত হইয়া পড়ে।

ভণ্টু আর থাকিতে রাজী নহে। কলিকাতা যাইয়া সর্ব্বাগ্রে শ্যামলালকে বলিয়া ভারতীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভণ্টু ও বাহাদুর কলিকাতায় আসিল।

শ্যামলাল পরীক্ষা লইয়া খুব ব্যস্ত।

ভণ্টু দু'দিন থাকিয়া খুব বোঝাইল শ্যামলালকে, ভারতী সম্বন্ধে। শোন শ্যামদা, পরীক্ষা ফেলে' রেখে' ছুটি নিয়ে সোজা বাড়ী চলে' যাও। বউদির যা' শরীরের অবস্থা।

শ্যামলাল বিরাট এক হাই তুলিয়া তুড়ি মারিয়া বলিল, বলিস্ কিরে? চাক্‌রি-বাকরি ছেড়ে বাড়ী গিয়ে বসে' থাকব?

ভণ্টুও নাছোড়। না দাদা, আমি কিছুতেই শুনব না। বাড়ী না যাও এখানে একটা বাসা কর। বউদি ও মাসীমাকে নিয়ে আসি। আমিত আর বসে' থাকবনা, কিছু রোজগার তো ক'রবই। আমার সাধ্যমত তোমায় সাহায্য ক'রব।

শ্যামলাল উত্তর দিল, ওরে, সব কাজ সব সময় খেয়ালের ওপর চলে না। তোরা হ'লি 'ইয়ংম্যান্,' তোদের সঙ্গে আমাদের মত এক হয় না।

ভণ্টু বলিল, ভুল কর্‌ছ শ্যামদা, এর জন্যে কিন্তু একদিন পস্তাতে হবে।

শ্যামলাল উত্তর দিল, পরের কথা পরে হবে। দুর্ভোগ যদি অদৃষ্টে লেখা থাকে, তা'তো আর খণ্ডন করা যাবে না।

এর পর ভণ্টু আর কি বলিতে পারে। স্বামী হইয়া শ্যামলাল যদি প্রয়োজন বোধ না করে নিজের স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য করিতে, সে তো অপর ব্যক্তি, বলিতে গেলে বিশেষ কোন সম্বন্ধই নাই, সে আর বেশী কি বলিতে বা করিতে পারে।

দুপুর বেলা বাহাদুর শ্যামলালের মেস হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, ভণ্টুকে কিছু না বলিয়াই বাসার সন্ধান করিতে।

বাহাদুর অনেক খুঁজিয়া টালিগঞ্জের দিকে ছোট টালির একখানি কাম্‌রা সংগ্রহ করিয়া শ্যামলালের মেসে ফিরিয়া আসিয়া ভণ্টুকে জানাইল—ঘরের সন্ধান মিলিয়াছে, আজ এখুনি যাইতে হইবে।

ছোট্ট একখানা টালির বাড়ী। চারিখানা কামরায় চারিঘর ভাড়াটে আছে। বাহিরের ঘরখানি বাহাদুর ভাড়া লইয়াছে। ভিতরের সহিত বাহিরের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। মেয়েছেলেরা থাকে ভিতরের দিকে, বাহাদুর ও ভণ্টু বাহিরের দিকেই থাকিবে।

বাহাদুরের সমস্ত কথা শুনিয়া ভণ্টু অসহায়ের মত বাহাদুরের মুখের পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তবে তাই চল্ বাহাদুর।

বাহাদুরই যেন ভণ্টুর একমাত্র সহায় এখন। ভণ্টু ইচ্ছা করিয়া এই সম্বলটুকু আর ছাড়িয়া দিতে রাজী নহে। তাই শ্যামলালের কাছ হইতে বিদায় লইয়া যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট ঘরটীতে আসিয়া আশ্রয় লইল ভণ্টু।

বাহাদুর চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব ভণ্টুকে সুখে রাখিবার। একটি 'ইক্‌মিক্‌-কুকার' কিনিয়াছে তাহাতেই বাহাদুর রান্না সারিয়া লয়।

ভণ্টু যেন দিন দিন কিরকম হইয়া যাইতেছে। যে জীবনে ছিল অফুরন্ত আনন্দের উৎস, হঠাৎ নির্দ্দিষ্ট সীমারেখায় পৌছিয়া সেই উৎস যেন তাহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কে যেন চুপিসারে আসিয়া দুঃস্বপ্নের মধ্যে তাহার সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ যেন তাহার আর এক নতুন জীবন আরম্ভ হইয়াছে।

তবে অরূপ, বিশেষ করিয়া উর্দ্মি, এক এক সময় এখনও তাহার চিন্তাস্রোতে ব্যাঘাত ঘটায়। সে ভাবে, যাহারা আপনার, তাহারা হইল পর। আর কোন দেশের বাহাদুর, সেই আজ শত মায়ায় তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কে জানে, এ বন্ধনটুকু আবার কতদিনের!

মাসিক সাত টাকা বেতনে বাড়ীওয়ালার একটি ছেলেকে ভণ্টু পড়ায়। আর বাকী সময় নিশ্চিন্ত মনে ছবি আঁকিয়া যায়।

শ্যামলালের সহিত ভণ্টু আর ইচ্ছা করিয়াই দেখা করে নাই। যে আপনার অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য দেখাইতে অবহেলা করে, তাহার মনুষ্যত্বের উপর আস্থা রাখিতে সে ঘৃণা বোধ করে।

দিনকতক হইতে হাতের পুঁজি প্রায় শূন্য। বাহাদুর চিন্তিত হইয়াছে, ভণ্টু বুঝিতে পারে।

—শোন্ বাহাদুর, একটা কাজ কর; দেখ্‌না এই ছবিগুলো যদি কোন কাজে লাগে?

বাহাদুর উত্তর দিল, আপনার সখ ক'রে আঁকা অমন সুন্দর ছবিগুলো, শেষ পর্য্যন্ত—

বাধা দিয়া ভণ্টু বলিল, না, ওসব কথা ছেড়ে দে, যা' বল্‌ছি বরং চেষ্টা দেখ।

সময় মত বাহাদুর, ধর্ম্মতলা ও চীনা-পল্লীতে গিয়া ছবিগুলো বিক্রি করিয়া আসে। এবং দুই চারি টাকা যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই দৈনিকের খরচ কোন রকমে চালাইয়া লয়।

বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকটি পাশের একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকেন। এম্‌নি তিনি লোক খুব ভাল। তবে ইনি সেই ধরণের লোক যিনি পয়সা দিয়া কাহার উপকার না করিলেও গতর দিয়া যেটুকু সম্ভব—করিতে নারাজ হন না।

এই ভদ্রলোক পাড়ার হাইস্কুলে ভণ্টুর একটি চাকরি ঠিক করিয়া দিয়াছেন। মাসিক বেতন চল্লিশ টাকা। আজ হইতেই 'জয়েন্' করিতে হইবে।

তাই ভণ্টু তাড়াতাড়ি ছবিতে রং‌এর কাজ শেষ করিতেছিল। আজই বিক্রয় করিতে হইবে, টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

দুর্গাবতীর একখানি চিঠি পিয়ন দিয়া গেল। —ভারতীর একটি মেয়ে হইয়াছে, তবে ভারতীর শরীর খুব খারাপ।

যাক' তবুও ভণ্টু একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

... ...

শুক্লা বসিয়াছিল, গাড়ি-বারাণ্ডাতে। পথ দিয়া কত লোক যাইতেছে, কে কাহার খোঁজ রাখে। উদাস দৃষ্টি মেলিয়া শুক্লা লোক চলাচল দেখিতেছিল।

—চাই চানাচুর,—

চানাচুরওয়ালা পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া ও গলায় একটি হারমোনিয়াম্ ঝুলাইয়া কেমন অঙ্গভঙ্গী সহকারে সুরে সুর মিলাইয়া রগড়ের গান করিতেছিল। আর ঝোলা হইতে মধ্যে মধ্যে চানাচুরের প্যাকেট বাহির করিয়া খদ্দেরকে গছাইতেছিল।

শুক্লা অনুভব করিল, বেশ জীবন! ঐ চানাচুরওয়ালাও তাহার চেয়ে স্বাধীন এবং সুখী।

পিসিমণি চলিয়া গিয়াছেন অনেকদিন। এবার যাইয়া শুক্লাকে চিঠি খুব কমই দেন।

কাঞ্চী আসিয়া জানাইল,—'ক্রিসেন্‌থিমাম্,' 'সান্-ফ্লাউয়ার' একটা ফুলও ফোটে নাই।

বিরক্ত হইয়া শুক্লা বলিল, কেন? গাছের বোধ হয় যত্ন হয় না। মালী কি বলে, জেনে আয়। এই সময়ে প্রত্যেকবারই তো 'সিজ্‌ন্ ফ্লাওয়ার' রাশ রাশ ফোটে, এবার একটা ফুলও না ফোট্‌বার কারণ কি?

একটা 'ট্রেতে' করিয়া লিলি, ডালিয়া ও চীনা-গাঁদা টেবিলের উপর রাখিয়া কাঞ্চী বলিল, দিদি-সাহেবা, 'মালী বলে,—সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু ফুল না ফুটিলে সে কি করিতে পারে।' গাছের তলা খুঁড়িয়া একরকম পোকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

কাঞ্চী আবার ডাকিল—দিদি সাহেবা।

শুক্লা জবাব দিল, কি।

—ওই বাড়ীর সাম্‌নে মাঠটাতে একটা 'সার্কাশ' এসেছে, আমি একদিন দেখ্‌তে যাব।

শুক্লা নির্লিপ্ত ভাবেই বলিল, বেশতো, যাস্‌।

তাহার সখের ফুলগাছগুলিতে আর ফুল ফোটে না। শুক্লার মনে হইল, তাহার জীবনেরও সব আনন্দ যেন ফুরাইয়া গিয়াছে।

ঊর্ম্মি, সেও বেশীরভাগ সময় নীচেই থাকে, শুক্লার সঙ্গে দেখা খুব কমই হয়। মা, তিনিও যতদূর সম্ভব শুক্লাকে এড়াইয়া চলেন। অরূপের সঙ্গে দেখা হইলেও সেও কথা খুব কমই বলে। সকলেই যেন তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চায়।

শুক্লারও কোন জিনিসে আর তেমন আসক্তি নাই। মন সর্ব্বদাই অস্থির। কিছুদিন থেকে তাহার ইচ্ছা একবার পশ্চিম পানে যাইবার। বাবা থাকিলে সে হয়ত আব্‌দার ধরিত আবার ইউরোপে যাইবার। প্রভাতের স্যুইজারল্যাণ্ড, আজও তাহার চোখে যেন ভাসে।

কোথা হইতে রাহুবেশধারী প্রতুল আসিয়া তাহার জীবনের সব সুখ-শান্তি গ্রাস করিয়া গেল—

প্রতুলের কথা মনে পড়িতেই ধীরে ধীরে মানস-পটে উদিত হয় ভণ্ট। যতই শুক্লা চেষ্টা করে হেলা ভরে ভণ্টর চিন্তা মন হইতে

মুছিয়া ফেলিবার—ততই যেন মনের অজ্ঞাতে দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠে ভণ্টুর মুখ। একি দুর্ব্বলতা তাহার।

কিন্তু এভাবে নীরস, নিঃসঙ্গ জীবনও আর বহা চলে না। মাকে ডাকিয়াও পাওয়া যায় না। আজই সে স্থির করিবে, যত শীঘ্র সম্ভব, পশ্চিমে যাইবার।

কাকুর সঙ্গে একবার দেখা করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করা দরকার। দারোয়ান লালসিং, চাকর বাবুলাল, কাঞ্চী ও রাঁধিবার জন্ম পাড়েজীকে সঙ্গে লইলেই যথেষ্ট।

আরদালী মারফৎ জানিল, কাকু 'অফিস-রূমে' আছেন। 'ট্রেতে' করিয়া কাঞ্চী একখানি খামের চিঠি আনিয়া দিল।

খামখানি উল্টাইয়া শুক্লা বিস্মিত হইল, ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া! জায়গাটার নাম যেন শোনা, কিন্তু কই,······ভাল ভাবে মনে পড়িতেছে না তো ?

কুতূহলী হইয়া শুক্লা খামখানি ছিঁড়িল। বিস্ময়ের পর বিস্ময়—এ কাহার চিঠি! ঠিকানা ভুল হয় নাই তো? না, পরিষ্কার ছাপার মত অক্ষরে তাহারি নাম লেখা।

গ্রাম ও পোঃ—শিউড়ী,
জেলা—হুগলী।

'আমার আদরের শুক্লা বোন্‌টি,

হয়তো চিনিতে পারিবে না, কিন্তু তোমায় চিনিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমার দিদি। প্রিয় বোন্ শুক্লা, আমি তোমার অপরিচিত হইলেও তুমি আমার চির পরিচিত। বড় আপনার, স্নেহের—ছোট বোন্—শুক্লারাণী।

জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমি তোমায় দেখিয়া আসিতেছি মানস-চক্ষে। তাই তোমায় চিঠি লিখিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলাম না।

তুমি যতই শিক্ষিতা হও বা যতই আধুনিকা হও, আমার কাছে তোমার মূল্য—সেই স্নেহের ছোট বোন্। আমি বড় দিদি, আমার অধিকার তোমার উপর সর্ব্ব মুহূর্ত্তে।

পৃথিবীর কাছ হইতে আমার বিদায় লইবার সময় উপস্থিত। তাই সব কিছু আশা নিরাশায় দুলিতে দুলিতে মনে পড়িল তোমার কথা।

শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানুষের আশার পরিসীমা থাকে না। জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যত অতৃপ্তি থাকিয়া যায়—জীবনের সন্ধ্যাবেলায়, অন্তর কিন্তু আর বাধা মানে না; অসংযমী হইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

আমার ছোট বোন্ শুক্লা, আজ আমার সারা-হৃদয়ের একমাত্র কামনা—একবার তোমাকে দেখিবার।

মৃত্যু-পারের যাত্রী—তোমার দিদি—মনে রাখিও। কোন দ্বিধা না করিয়া যদি পার, একবার অতি অবশ্য অবশ্য আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে। মরণে যেন শান্তি লইয়া যাইতে পারি।

রুগ্ন, অসমর্থ মনের ইচ্ছা জানাইলাম। যদি অসুবিধা না বোঝ, নিশ্চয়ই আসিবে।

আর, যদি না আস, যদি কথা না রাখ, তাহা হইলেও কোন অসম্মান নাই। জানিও, দিদির কাছে ছোট ভাই বোন্দের কোন ত্রুটি বা প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না। ইতি—

তোমার দিদি—ভারতী।

অশ্রু আর বাধা মানিল না। কি জানি—শুক্লার চোখ দু'টিও এই-বার অকস্মাৎ জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কে এই দরদী ভদ্রমহিলা! এমনভাবে তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে! আজ, আপনার বলিতে তাহার তো কেহ নাই। আজ যে সে নিঃস্ব।

পিসিমণির পথও শুক্লার কাছে বন্ধ।

মনে পড়িয়া যায় বাবাকে। কি ভালই বাসিতেন তিনি শুক্লাকে। শুক্লার আব্দার এ বাড়ীতে অপূর্ণ থাকিবার যো ছিল না। আর আজ, তাহার প্রয়োজন এ সংসারে নাই বলিলেই চলে। মা সর্ব্বদাই ঠাকুর ঘরে থাকেন। তিনি অরূপ ও উর্ম্মিকে লইয়াই নিজের মনোমত করিয়া গড়িতেছেন।

কাঞ্চী আসিয়া খবর দিল—উর্ম্মির 'মেট্রন্' আসিয়াছে।

শুক্লা বলিল, ডোরার আয়াকে ডাকিয়া বলিয়া দাও, ডোরাকে ডাকিয়া দিবার জন্য।

যথা সময়ে উর্ম্মি আসিয়া হাজির হইল। শুক্লা অবাক হইয়া উর্ম্মিকে দেখিতে লাগিল। উর্ম্মির পরনে ছোট একখানি লাল গরদের শাড়ি। চুলগুলি একত্র করিয়া চূড়া বাঁধা, কাপড় আবার কোমরে ফাঁস বাঁধিয়া পরা হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শুক্লা বলিল, ওমা, এমনভাবে সং সাজ্‌লি কেন?

উর্ম্মি বলিল বা রে, ঠাকুর ঘরে বলে সন্ধ্যে দিতে হবে, ধূপ পোড়াতে হবে। আমার বলে এখন কতো কাজ। মার যে আজ একাদশী। কি বলছ, তাড়াতাড়ি বলো দিদিভাই, আমায় এক্ষুণি যেতে হবে।

ভ্রূ কুঞ্চন করিয়া শুক্লা বলিল, তোর 'মেট্রন' এসেছে। তোকে পড়্‌তে হবে না? এখন যাবি কোথায়?

ব্যস্ত হইয়া উর্ম্মি বলিল,—মা, 'মেট্রনের' কাছে পড়্‌তে মানা করে দিয়েছেন। আজ থেকে আমি 'মেট্রনের' কাছে পড়বো না, আর মেমেদের স্কুলেও যাবো না। বাঙ্গালির মেয়ে হয়ে 'মেট্রনের' কাছে পড়া আর বিলিতী স্কুলে যাওয়া খুব লজ্জার কথা—মা বলেছেন। আমি শুধু বাড়ীতে পড়্‌বো—আর ভাল ভাল কেত্তন শিখ্‌বো। মা, ম্যানেজারকে বলে দিয়েছেন, আনন্দ বাজারে লিখে দিতে—ভাল দিদিমণির জন্যে।

কাঞ্চী বলিল, এমা, ঐটুকু মেয়ে, ও কখনো প্রদীপ জ্বালাতে পারে ?

—দেখ দিদিভাই, তোমার কাঞ্চীকে মানা করে দাও—আমাকে যেন খুকু, খুকু না বলে। আমি বলে কত বড়ো হ'য়ে গিয়েছি—এখনো খুকু। আমি প্রদীপ জ্বালাতে পারবো না—পারবে তুমি ? জানো মশাই, আমি সব পারি। মাষ্টার মশাইকে চিঠি লিখেছি—কাল পিওন এলে তার হাতে দিয়ে দেবো। কত কি লিখেছি—আপনার জন্য মন কেমন করে—আপনি আমার প্রণাম নেবেন।

কাঞ্চী তুমি বড়ো অসভ্য। মাষ্টারমশাই পর্য্যন্ত বল্‌তেন—উর্ম্মিরাণী কত সুন্দর, কত বড়।

কাঞ্চী বলিল, এমা, খুকু কি বলে। পিওনের হাতে নাকি চিঠি দেয় ? খামে ঠিকানা লিখ্‌তে হয়, টিগিট লাগাতে হয়—কত কি।

উর্ম্মি রাগিয়া বলিল, তুমি কি মনে ভেবেছো আমি এমনিই বোকা, না ? ছুটিয়া গিয়া উর্ম্মি একখানা কাগজ আনিল, এক পিঠে থ্যাব্‌ড়া থ্যাব্‌ড়া লেখা—উল্‌টো পিঠে বাঁকা বাঁকা অক্ষর, ভুলে ভরা—শুধু 'মাষ্টারমশাই' লেখা। এই দেখ দিদিভাই, লিখেছি কিনা ?

কাঞ্চী বলিল, খাম কই, টিগিট কই, ঠিকানা লেখা কই ?

চোখ টানিয়া উর্ম্মি জবাব দিল, বা রে, সেতো পিওন সব ঠিক

ক'রবে। পিওনই তো মাষ্টারমশাইকে খুঁজে চিঠি দিয়ে আসবে। তুমি বরং বাহাদুরকে একটা চিঠি লিখে দাও।

শুক্লার ডাকে কথার স্রোতে বাধা পড়িল। ডোরা, মা তোকে পড়্‌তে মানা করলো ?

উর্ম্মি উত্তর দিল, হ্যাঁ।

শুক্লার কপালের উপর শিরা দুইটা দপ্‌ করিয়া আবার একবার রবারের মত ফুলিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তেই আবার মিশাইয়া গেল।

—যা ডোরা, তোর কাজে যা, আর তোকে দরকার নেই।

এ সংসারে কাহাকেও শুক্লার আজ প্রয়োজন নাই। এতখানি উপেক্ষা সহিয়া তাহাকে এই বাড়ীতে বাস করিতে হইবে ? মা একবার প্রয়োজনও বোধ করিলেন না—তাহার মতামতের ? অথচ একদিন এ সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ তাহার ইঙ্গিতেই চলিত।

সোজা যাইয়া সে কাকুর সঙ্গে দেখা করিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সংকল্প জানাইল—আজই, না হয়তো কাল, সে বাহিরে যাইবেই।

রাকাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, তোমার ভাল লাগছে না এখানে ?

দৃঢ়ভাবে শুক্লা জানাইল, না।

রাকাবাবু বলিলেন, আমার বা তোমার মায়ের এখন তো যাওয়া চল্‌বে না।

শুক্লা উত্তর দিল, কারোকে যেতে হবে না। তুমি শুধু খবর নাও—আমাদের বাইরের বাড়ী কোন জায়গায় খালি আছে কিনা ?

রাকাবাবু বলিলেন, আচ্ছা।

শুক্লা নিজের ড্রাইভারকে খবর পাঠাইল, কাল সকালে তাহার গাড়ি যেন তৈয়ার থাকে। যথেষ্ট পরিমাণে পেট্রোলও যেন ভর্ত্তি থাকে।

... ...

ভারতী শুইয়াছিল। কোলের কাছে সদ্য ফোটা একরাশ সাদা ধবধবে ফুলের মত ছোট্ট একটি মেয়ে, যেন ভারতীর প্রতিচ্ছায়া।

যাক্, তবু ভারতী সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে যে, তাহার মেয়ে হইয়াছে। যদি পুত্র সন্তান হইত তাহা হইলে সে আবার শ্যাম-লালেরই বংশধর হইত, আবার হয়তো তাহারি মত কোন হতভাগিনীর জীবন লইযা ছিনিমিনি খেলিত। এদের রক্তে হয়ত বিষ আছে!

ভারতী বুঝিয়াছিল, তাহার আয়ু দিন দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। তাহার অবর্ত্তমানে শ্যামলাল যে এই শিশু সন্তানটির বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিবে, এ ভরসা তাহার নাই। মাতৃসমা বৃদ্ধা শাশুড়ী, তিনিই বা আর কতদিন! এই শিশুটির তখন কি উপায় হইবে, মরণেও তো তাহার শান্তি আসিবে না।

পথের বন্ধন এই শিশুটি—ইহার জন্য এক একবার ভারতীর বাঁচিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কে তাহাকে সযত্নে বাঁচাইয়া তুলিবে! যাহার প্রয়োজন ছিল সেত কেবল তাহার জন্য রাখিয়া গিয়াছে নিষ্ঠুর উপেক্ষা। ভারতী আর ভাবিতে পারে না; গভীর অবসাদে তাহার ক্লান্ত চোখ দু'টি আপনা আপনি জুড়িয়া আসিল।

দুর্গাবতী ও ঘরে রান্না করিতেছিলেন। ভারতীর জ্বর হইয়াছে, আজ আর ভাত দিবেন না। তাড়াতাড়ি রান্না সারিয়া তিনি আবার শিশুটির পরিচর্য্যায় যাইবেন। বউটার চিন্তায় দুর্গাবতী সর্ব্বদাই চিন্তিত।

কবিরাজ বলেন,—এ সময় শরীর দুর্ব্বল থাকে, ভাবিবার কিছু নাই, তবে সাবধানেরও মার নাই। সাম্‌নে শীত, ফাগুনের হাওয়া না পড়া পর্য্যন্ত শরীর এইভাবেই চলিবে; তবে ওষুধ বরাবর চালিয়ে যেতে হবে।

দুর্গাবতী একাকী, অত শত বোঝেন না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক তিনি—পরামর্শ করিবার পর্য্যন্ত দ্বিতীয় আর কেহ নাই যে—কোন্‌টা করা বা না করা উচিত তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে। শ্যাম যে নিজের সন্তান হইয়া তাঁহাকে শেষ বয়সে এইরূপ শাস্তি দিবে, দুর্গাবতী এতটা কোন দিনও কল্পনা করিতে পারেন নাই!

দুর্গাবতী এক মুঠা ডাল ভিজাইয়াছিলেন। সেই কয়টি বাঁটিয়া বড়ি দিবেন ভাবিতেছিলেন—আর আকাশের দিকে চাহিয়া এক একবার রৌদ্রের অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু সজাগ্‌ দৃষ্টি ছিল তাঁহার ভারতীর ঘর পানে—শিশুটির দিকে।

হঠাৎ বাহিরের দুয়ারে একখানি মটরগাড়ি আসার শব্দ পাওয়া গেল।

বাহিরের দুয়ার ভেজানোই ছিল, প্রায় শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইতে দুয়ার ঠেলিয়া একটি মেয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

দুর্গাবতীও দুয়ারের নিকট যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন—আর যাইতে হইল না। একেবারে সামনা সামনি হইয়া ক্ষণিকমাত্র চোখোচোখি হইতেই দুর্গাবতীই প্রশ্ন করিলেন, কে মা তুমি?

মেয়েটি ধীরকণ্ঠে বলিল, আমি শুক্লা। আপনি আমায় চিন্‌তে পার্‌বেন না!

দুর্গাবতীর মুখের উপর হাসি ফুটিয়া উঠিল, একটু থামিয়া বলিলেন, মায়ের কাছে কি সন্তান কখনো অচেনা হয় মা? তোমাকে আমি ঠিকই চিনেছি।

শুক্লা জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে ছুঁয়ে আমি প্রণাম করতে পারি?

দুর্গাবতী বলিলেন, নিশ্চয় পারো। মেয়ের কাছে মায়ের আবার কি সংস্কার থাকতে পারে মা? তোমাদের নিয়েই যে আমার সংসার, আমার আচার, নিষ্ঠা তোমরাই তো সব। আর প্রণাম করাটাই কি বড়ো—তুমি কতদূর থেকে এসেছ, এই যে সবার বড় কথা মা। আমার মন আনন্দে উছ্‌লে উঠেছে।

তারপর চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, চল মা, তোমার দিদির কাছে। সে তোমায় দেখ্‌লে কত সুখী হবে!

কথা কয়টি বলিতে দুর্গাবতীর গলা ব্যথায় ভারি হইয়া উঠিল।

শুক্লার বুঝিতে বিলম্ব হইল না বউএর প্রতি শাশুড়ীর ভালবাসা।

ভারতী দূর অন্তরীক্ষে একমনে চাহিয়াছিল।

—বউমা দেখ, কে এসেছে।

চমক ভাঙ্গিয়া ভারতীর লক্ষ্য পড়িল, শাশুড়ী এবং তরুণীটির প্রতি।

স্বাভাবিক গলায় বহু পরিচিতের মত ভারতী বলিল, এস শুক্লা, আমি অপেক্ষা ক'রছিলাম—তোমারি জন্যে! আমি জানি তুমি আস্‌বে। বলিয়াই ভারতী যেন কি রকম ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তারপর নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, মা, একখানা আসন এনে দিন শুক্লাকে।

দুর্গাবতী বলিলেন, চেয়ার তো আছে।

বাধা দিয়া ভারতী বলিল, দিদির কাছে বস্‌বে ছোট বোন্‌—তার জন্যে আসনই যথেষ্ট—যাতে দামী শাড়িখানা নষ্ট না হয়।

দুর্গাবতী একখানা আসন আনিয়া বিছাইয়া দিলেন।

ভারতী বলিল, শুক্লা বস।

শুক্লা সুবোধ বালিকার মত আসনের উপর গিয়া বসিল। কাঞ্চী তো অবাক্। এমন তাজ্জব ব্যাপার তাহার চোখে এই প্রথম পড়িল।

শুক্লা যেন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে ভারতীকে দেখিয়া। এই ভারতী! এ রূপ, মানুষ যে শুধু কল্পনায় ধ্যান করে!

কত বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে সে, কত বড় বড় 'পার্টিতে' গিয়াছে, কিন্তু এমন রূপ তো কোনদিন চোখে পড়ে নাই তার। শুক্লা শুধু আসিয়াছিল কৌতূহল মিটাইবার জন্য—ভাবিয়াছিল, যে অপরিচিতা নারী শুধু কথার মালা রচনা করিয়া ছত্রে ছত্রে কত পরিচিতের মত ঠাট বজায় রাখিয়া শুক্লার মত মেয়েকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—সম্মুখে আসিয়া দু'চারিটা শক্ত শক্ত মুখের কথায় চিঠির জবাব দিয়া সরিয়া পড়িবে। কিন্তু চাক্ষুষ দেখামাত্রেই মনের সব জটিল গ্রন্থি এক টানেই শিথিল হইয়া গেল।

শুক্লা বলিল, দিদি আমায় কি কোন দরকারে ডেকেছেন?

—হাঁ শুক্লা, আমি তোমায় ডেকেছি; তোমাকে বড় দেখ্‌বার ইচ্ছা আমার হয়েছিল। শেষ আশা কেন অপূর্ণ থাকে! আর, ভণ্টু ঠাকুরপোর সঙ্গে একদিন ঠিকই মিলে যাবে, সেদিন দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমার হয়তো হবে না।

শুক্লার কপালের উপর শিরা দুইটি দেখা দিল,—উত্তেজিত হইয়া বলিল, ভারতীদি আপনি কি আমায় এইজন্যেই ডেকেছেন? আমার সঙ্গে আপনার তো পরিচয় ছিল না, শুধু শুধু কেন আঘাত দিচ্ছেন?

শুক্লা, ভাই, যা' সত্য তা' কি কখনও মিথ্যার আবরণে ঢাকা যায়? সত্য যদি মিথ্যা দিয়ে ঢাকা যেত বোন্, তাহ'লে দুনিয়ায় মানুষের দুঃখ ব'লে আর কিছু থাক্‌তো না। শোন শুক্লা, আমারও

সব ছিল, কিন্তু ত্যাগের মহত্বে আমি যে আনন্দ পেলাম তাই আমার জীবনের পাথেয় হ'য়ে রইল। একে একে ভারতী নিজের অতীত কাহিনী অকপটে শুক্লাকে শোনাইয়া গেল। ভাই শুক্লা...... বলিতে বলিতে ভারতী কেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। শুক্লা বিব্রত হইয়া উঠিল। ভারতীর অবস্থা দেখিয়া কি করা কর্ত্তব্য বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কাঞ্চী হঠাৎ বুদ্ধি করিয়া দুর্গাবতীকে ডাকিয়া আনিল।

দুর্গাবতী আসিয়া ভারতীকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া না ভাবিয়াই শিশুটিকে শুক্লার কোলে ফেলিয়া ছুটিয়া গেলেন ভারতীর কাছে। কাঞ্চীও গেল দুর্গাবতীর সাহায্যে।

শুক্লার মুহূর্ত্তের মধ্যে কি এক অনুভূতিতে সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল।

কি জানি কি এক দুর্ব্বার আকর্ষণে শুক্লার অন্তর মমতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কচি মেয়ে কাঁদিয়া উঠিল, অনভ্যস্ত শুক্লা তবু কোল নাড়া দিয়া থামাইতে চেষ্টা করিল।

হৃদয়ের সমস্ত একাগ্রতা দিয়া শিশুটিকে পরম আগ্রহে শুক্লা নিরীক্ষণ করিতেছিল। ওই তো মায়ের হাল, কখন আছে কখন নাই। বৃদ্ধা ঠাকুরমা তল্পিতল্পা গুটাইয়া বসিয়া আছেন 'ডাকের' আহ্বানে। পিতা, সে থাকে বাহিরে, তা' ছাড়া শিশুর পরিচর্য্যা! তাহাকে দিয়া বেশী কি উপকার হইবে। কি জানি কেন, তেজস্বিনী শুক্লা আজ পরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তান্বিত হইল—বিশেষ করিয়া শিশুটির পরিণাম ভাবিয়া।

কিছুক্ষণ পরে ভারতী চোখ মেলিয়া চাহিল। দুর্গাবতীও আশ্বস্ত হইলেন। কাঞ্চী বিব্রত হইয়া ছুটিয়া আসিল শুক্লার কাছে। এমন অভাবনীয় কাণ্ড সে এই প্রথম দেখিল! বিস্ময়ে সে হতবাক্!

—শুক্লা!

ভারতীর ডাকে শুক্লা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

ভারতী বলিল, বড় সুন্দর লাগছে তোমার কোলে খুকীকে।

শুক্লা একটু লজ্জিত হইল। দুর্গাবতী বলিলেন, মা তোমায় কত কষ্ট দিলাম। শুক্লা বলিল, না—কষ্ট আবার কি। কাঞ্চী আসিয়া শিশুটিকে সযত্নে শুক্লার কোল হইতে তুলিয়া লইল।

—আর তোমায় ডেকেছি কেন জান শুক্লা, ভারতী বলিল।—আমার দুরদৃষ্টের সঙ্গে জড়িত এই শিশুটি। আজ আমি মরণকেও ঠেকিয়ে রেখেছি—পথের বন্ধন এই শিশুটির জন্যে। জীবন তো কেটে গেল শুধু মিছে কোলাহল আর অশান্তিতে। অভিশপ্ত জীবন, শুধু অভিশাপ বহন করেই গেলাম, মরণেও শান্তি পাবো না। এই শিশুর অভিশাপ সেখানে গিয়েও দগ্ধাবে। আজ আমার কেউ নেই শুক্লা—যার হাতে ভার দিয়ে তৃপ্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারি।

কথা কয়টি বলিয়াই ভারতী আবার হাঁপাইতে লাগিল।

শুক্লা বলিল, আপনি কথা বলবেন না, আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে।

ভারতী হাসিল, কিন্তু সে বড় মলিন হাসি! না, কষ্ট আর কি—জীবনে কত কষ্ট করেছি। কেউ জানে না, কাকেও বলিনি—আজ বল্‌তে দাও। ছিল একজন, জীবনের সাথী—সুখ-দুঃখের ভাগী। এমন অদৃষ্ট—সেও আজ দূরে। জানো শুক্লা, সেই দরদী বন্ধু—মায়ের স্নেহ, স্বামীর সোহাগ, ভাইবোনের মমতা, বন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসা সব দিয়ে আমাকে ঢেকে রেখেছিল। তার সুখে—আমার নিজেরও

তৃপ্তি ছিল কত। কিন্তু ভগবানের কাছে আমার সে সুখ সইল না। সেই—বন্ধু, রমা হ'ল বিধবা। আমি খবর পাইনি, সবাই আমায় লুকোচ্ছে। মা লুকিয়ে কাঁদেন। কিন্তু রমা—সে যে ম্লানমুখে রোজ রাতে এসে আমার কাছে কত কাঁদে। চোখ বুঁজ্‌তে পারি না—তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে চোখ বুজলেই সে আসে। রমার কান্না আমি দেখ্‌তে পারবো না, সে যে ছিল খুশির উচ্ছ্বাস! তাই আমার আগেই যাওয়া দরকার।

ভারতীর দু'চোখ দিয়া অবিরাম জলধারা বহিতে লাগিল। শুক্লারও চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল।—দিদি কাঁদ্‌বেন না, আমি আপনাকে ভাল ক'রে তুলবো। পশ্চিমে, আমার বাড়ীতে আপনাকে নিয়ে গিয়ে আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা কর্‌বো।

ভারতী বলিল, না বোন্‌, তা' হয় না। তাতে আমার স্বামীকে ছোট করা হয়। আমার জীবন থাকৃতে আমি তো পারবো না তাঁর অসম্মান ক'র্‌তে!

শুক্লা বলিল, কিন্তু কই, তিনি তো আপনার জন্য কোন ব্যবস্থা ক র্‌ছেন না?

ভারতী বলিল, তবু তিনি আমার স্বামী। আমার মা বাপ ওঁকেই আমায় দান করেছেন। উনি যদি প্রয়োজন বোধ না করেন আমাকে বাঁচিয়ে তোলবার, আর তো কারো অধিকার বা দরকার নেই বোন্‌। আমরা হিঁদুর ঘরের মেয়ে, একথা অস্বীকার করা তো চল্‌বে না।

শুক্লা খানিক্‌ বিমনা হইয়া গেল, তারপর ধীরে বলিল—এমনি ভাবেই তা'হ'লে জীবনটা দেবেন?

ভারতী ম্লান সুরে বলিল, আমি হয়তো মরতাম্‌ না শুক্লা! কিন্তু বড় ব্যথা পেলাম আচম্‌কা আঘাতে। নিজের দুঃখকে কোন দিন বড় করে

দেখিনি, কিন্তু দুঃখ দিল রমা, আর দুঃখ পেলাম ভণ্টু ঠাকুরপোর ছন্নছাড়া জীবনটার কথা ভেবে। ওরা দু'জনে কি ভাবে এল আমার জীবনে। ভণ্টু ঠাকুরপো যে কত ভাল, কত উদার—সে শুধু আমিই জান্‌লাম। বেচারা জীবনে কিছুই পেলোনা।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম, ঠাকুরপো—শুক্লাকে কি রকম দেখ্‌লে ?

উত্তর হলো, 'না—বউদি, তাকে আমি তো দেখ্‌বার মত দেখিনি।' কি ধৈর্য্য ! টপ্‌ টপ্‌ করিয়া ভারতীর চোখ দিয়া আবার দুই ফোঁটা জল পড়িল ;

শুক্লা নিজেকে সম্বরণ করিয়া অন্যদিকে চাহিল। কি জানি, অবাধ্য চোখ দুইটি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া যদি দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া দেয়।

শুক্লা বলিল, দিদি এইবার তো আমায় উঠ্‌তে হবে। একটা কথা বলি, যদি কিছু না মনে করেন ;—আপনার খুকুর ভার আমি নিলাম। যদি আপনি খুশি মনে দেন তবে আপনি যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন আর ওকে কেড়ে নেব না—তারপর ওই হবে আমার শেষ সম্বল।

আ ! বাঁচালি শুক্লা—বোন্‌টি আমার।

যাইবার সময় শুক্লা বলিল—একটা অনুরোধ আমার, আমি যে এসেছিলাম কেউ যেন না জান্‌তে পারে।

দুর্গাবতী বলিলেন, না বাছা, কথা দিচ্ছি—কেউ জান্‌বে না।

ভারতীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া শুক্লা হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—দিদি আশীর্ব্বাদ করুন—আপনার বোন্‌ যেন হ'তে পারি।

ভারতী বলিল, সব সময়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।

সবারি কাছ হইতে বিদায় লইয়া শুক্লা গাড়িতে গিয়া বসিল,—মন যেন তাহার অন্য রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

'মা—বাবা যার হাতে সঁপিয়া দেয়—অধিকার শুধু তারই' চির পুরাতন কথা—বহুবার শুক্লা শুনিয়া আসিয়াছে। তবু যেন কথাটা শুক্লার অন্তরের অন্তঃপুরে গিয়া কেন আঘাত করিতে লাগিল।

'ভন্টু ঠাকুরপো বড় ভাল—উদার, মহৎ,' ত্বরিতে শুক্লার চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিল—খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি পরিহিত ভন্টুর মূর্ত্তি। আজ তাহারও স্বামী আছে—মা, কাকা ও পিসিমণির নির্ব্বাচিত। কতক্ষণ চিন্তায় মগ্ন ছিল, শুক্লার খেয়াল ছিল না। লিলুয়ার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, হঠাৎ একখানা 'ট্যাক্সি' খুব জোরে আসিয়া শুক্লার 'কারের' কাছে 'টায়ার' 'বার্ষ্ট' করিল। শুক্লার গাড়িটিরও সঙ্গে সঙ্গে গতি মন্থর হইয়া গেল। গাড়িটি পাশ কাটাইবার সময় শুক্লা মুখ বাড়াইতেই নজর পড়িল—প্রতুল ও বিবাহের রাত্রে সেই ইংরেজ মহিলাটি। প্রতুলের বুকে মাথা রাখিয়া মেম্‌টি অর্দ্ধশায়িতা অবস্থায়—প্রতুল মেম্‌টির সোনালী চুলের উপর লাল ক্লীপ্‌টি সন্নিবদ্ধ করিয়া দিতেছে। ড্রাইভারের সন্নিকটে বসিয়া প্রতুল ইংরেজ মহিলাটির প্রেমে এমনই তন্ময় হইয়াছে যে বহির্জগতের সব কিছুই তাহাদের কাছে তুচ্ছ।

শুক্লার চোখ দুইটা দপ্‌ করিয়া একবার জ্বলিয়া উঠিল। প্রতুলকে দেখিয়া ঘৃণায় তাহার শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠিল। তাহার কি সর্ব্বনাশই না করিতে বসিয়াছিল সে। একদিন মেম্‌টির মতই শুক্লাও কত নির্ভর কত বিশ্বাসই না করিয়াছিল তাহাকে। সাজানো খেলাঘর দম্‌কা ঝড় আসিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ওলট্‌পালট্‌ করিয়া দিল। আজ বড় বেশী করিয়া মনে পড়ে দাম্ভিক ভন্টুকে—তুচ্ছ জ্ঞানে সেও ফেলিয়া দিয়া গেল দশ হাজার টাকার কাগজগুলো। জগতে সকলেই উপেক্ষা করে শুক্লাকে—

ঠেলিয়া ফেলিয়া দিযা চলিয়া যায় ;—পাওনা থাকে তাহার শুধু করুণা, শুধু দয়া !

কাঞ্চী বসিয়াছিল পাশে,—সে সহসা বলিয়া উঠিল, বেশ সুন্দর খুকুটা, না দিদিসাহেবা ?

শুক্লা সামান্য একটা হুঁ বলিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

বাড়ীতে আসিয়া শুক্লা শুনিল, মা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন বিশেষ প্রয়োজনে। শুক্লা হাত, মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া গেল পুকুরের কাছে,—ডাকিল, পান্তু, শান্তু, মান্তু। লেজে দোল দিতে দিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছগুলি বাণায় বসিয়া পরম নির্ভর-ভরে—শুক্লার হাত হইতে ছোলাব ছাতুর দলাগুলি খাইযা আবার জলের মধ্যে চলিয়া গেল। শুক্লা একটু হাসিল,—যাও তোমরা। মানুষেরা শুক্লাকে ভুলিলেও মাছগুলি তাহার ভালবাসার দাম ঠিকই বোঝে, তাহারা আজও তাহার কথার অপেক্ষা রাখে।

সে ইচ্ছা করিয়াই মায়ের কাছে একটু দেরিতে গেল। প্রচ্ছন্ন অভিমানে শুক্লা যে ইঙ্গিত দেখাইল, রাণীমার তাহা দৃষ্টি এড়াইল না।

শুক্লা যাইতেই রাণীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়েছিলি খুকী—সারাদিন কাটিয়ে এলি ? সময়ে খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, কি ব্যাপার ?

শুক্লার অন্তরে যে আগুন ফুঁসিতেছিল—হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ও, এই জন্যে বুঝি ডাকা—শুধু কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে ?

রাণীমা শান্ত স্বরে বলিলেন —আমি শুধু জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোথায় গিয়েছিলি। তা'ছাড়া, কোথায় যাও বা না যাও দেখা আমার একটা কর্ত্তব্য।

শুক্লা বলিল, কেন আমি কি কচিঁ খুকী যে আমার ওপর সারাদিন লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে ?

রাণীমা বলিলেন, তুমি তার থেকেও দায়িত্বের জিনিস্। তোমার প্রত্যেকটি কাজ এখন আমায় চোখে চোখে দেখ্‌তে হবে।

শুক্লার নাকের ডগা লাল হইয়া উঠিল, বলিল—মানে ?

রাণীমা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—'মানেটানে' বুঝিনে খুকী ; শুধু এইটুকু বুঝি—লোকতঃ, ন্যায়তঃ এসব অন্যায়। তোমার স্বামী থাক্‌লো কোথায়, তুমি থাক্‌লে কোথায়। অথচ, কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমার প্রাণান্ত। তারপর, তোমার খুশি মত কাজের সময় বা বয়স এটা নয়। পয়সা হয়তো তোমাদের থাক্‌তে পারে—তা'বলে দৃষ্টিকটু বা অশোভন কিছু হলে' লোকে বল্‌তে ছাড়্‌বে কেন ?

শুক্লা বলিল, 'স্বামীটামী' আমার কেউ নেই।

রাণীমা হাসিলেন,—লোকে শুন্‌বে কেন। এই দেখ, তোমার আশীষ, উর্ম্মির ছবি এঁকেছিল। বড় এগ্‌জিবিসনে তোমার কাকা পাঠান। এই ছবি 'ফার্ষ্ট' হয়। হাইকোর্টের কোন্ জজ্ কিন্‌তে চায় ছবিখানা ১৭০০৲ টাকা দিয়ে। আমার ভাই অর্থাৎ তোমার মামা চিঠি লিখেছেন কত গর্ব্ব করে'। এবং তোমার স্বামীর নামে পাঁচ জায়গা থেকে পাঁচবার প্রশংসা পত্র আস্‌ছে।

শুক্লা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল;—তুমি রাখো আর গর্ব্ব ক'রে পড়— আমার ওতে দরকার নেই। শোন মা, আজই আমি বাইরে যাবো ! এখানে একটুও ভাল লাগ্‌ছে না। ওইটুকু ডোরা—সেও জানে আমার কথার কোন দামই নেই। সেও আমায় উপেক্ষা ক'রে চ'লে যায়।

রাণীমা বলিলেন, খুকী, মিছে নিজেকে উত্তেজিত করছিস্। কেউ তোকে অপমান করেনি—ক'রতে পারবে না কোনদিন। এ শুধু তোর

মন তোকে সাজিয়ে ভাঙ্ছে, গড়্ছে। বিবাহিতা মেয়েরা যদি বাপের বাড়ীতে ছ'মাস থাকে—তাহ'লেই তাদের মনে বিপ্লব বাঁধে। এটা অতি সাধারণ কথা। গোত্র ছাড়িয়ে মেয়েকে পর করিয়ে দেওয়া হয়। স্বামী তার যাই হোক্, সেই আশ্রয়ই হয় তার সব থেকে বড়। বিদেহ রাজকন্যার কথা জানিস্ তো? তবে ভগবান্ যদি কোনদিন 'দিন' দেন, আশীষের হাতে তোকে যদি দিতে পারি—সেদিন তুইও স্বাধীন—আমিও মুক্ত।

শুক্লা বলিল, কি যন্ত্রণা, 'স্বামী স্বামী' ক'রে তো পাগল ক'র্লে দেখ্ছি।

দুই চোখে অগ্নি-বর্ষণ করিয়া রাণীমা চাহিলেন শুক্লার পানে।—খুকী আমার মেয়ে হ'য়ে তুই কি ক'রে এত বড় স্বেচ্ছাচারী হ'লি বুঝতে পার্ছি না। আশীষ যত যাই হোক্ সে তোর স্বামী—আমার জামাই। এ সংসারে আমি তার অসম্মান হ'তে এতটুকুও দেব না। লেখাপড়া শিখে মানুষের ভেতরটা ভাল হয় জানি কিন্তু তুই যে লেখাপড়া শিখে এমন হ'য়ে যাবি তা' আমি কল্পনাও ক'রতে পারিনি।

শুক্লা মায়ের কাছে চিরদিন আদর পাইলেও তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে কোনদিনই উপেক্ষা করিতে সাহসী হয় নাই। আজ তাঁহার দৃপ্তস্বরে প্রত্যেকটি কথার মধ্য দিয়া সে আরও বিশেষ করিয়া অনুভব করিল যে মায়ের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা যেন অসম্ভব। প্রতিবাদ করিতে ভরসা হইল না, কোনমতে উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া সে ধীরে ধীরে আপনার শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

ভণ্টু একটা টুইশানি পাইয়াছে এবং স্কুলে একটা কাজ পাইয়াছে ইহাতেই সে সুখী। বড় আশা ভণ্টুর কোনদিনই নাই। অবসরমত সে ছবি আঁকে। ভারতীর একখানা ছবি ধরিয়াছে। পদ্মাসনের উপর ভারতী বসিয়া—দেশ-মাতৃকার মূর্ত্তিতে রূপ দেওয়া হইতেছে। খুব ভাল করিয়া সারা অন্তরের যত ভক্তি ও ভালবাসা ছিল, সব দিয়া ভণ্টু আঁকিয়া চলিয়াছে।

বাহাদুর সারাদিন নিজের সেতারটি লইয়াই ব্যস্ত—তাহাকে লইয়াই ভাঙ্গা-গড়া করে এবং ফাঁকে ফাঁকে ভণ্টুর যাবতীয় কাজও ক'রে। রাতে অবশ্য দু'তিন ঘণ্টার জন্য বাহিরে যায় ও দারোয়ান মারফৎ মোটামুটি রাজবাড়ীর খবর সংগ্রহ করে এবং সেই সঙ্গে কাঞ্চীরও খবর পায়।

ছবিতে নূতন রং দিয়া একটু দূরে গিয়া ভণ্টু দেখিতেছে তাহার রং দেওয়া ঠিক হইল কিনা—এমন সময় পিওন আসিয়া তাহার নামে একটি চিঠি দিয়া গেল।

খামের উপরের ছাপ দেখিয়া ভণ্টু ভাবিল বোধ হয় ভারতীর পত্র। তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা ঠিক নয়।

শিউড়ীতে শ্যামলালের বাড়ীর ঠিকানায় অরূপ চিঠি দেয়, সেই চিঠি দুর্গাবতী পাঠাইয়া দেন। বিস্ময়ের সহিত চিঠিখানা পাঠ করিতে করিতে ভণ্টু অবাক্ হইয়া গেল। বারংবার চিঠিখানি পড়িয়া মনের মধ্যে স্মরণ করিয়া লইল—'ঠিক্', কি অপ্রত্যাশিত কাণ্ড!

বাহাদুর বুঝিয়া লইয়াছে—চিঠিখানার মধ্যে কিছু রহস্য আছে। ভণ্টুর মুখের ভাব দেখিয়া বাহাদুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—।

উল্লসিত কণ্ঠে ভণ্টু বলিল—সেই যে, রাজবাড়ীতে থাকৃতে উর্ম্মির ছবি এঁকেছিলাম—অরূপ সেটা একজিবিসনে পাঠিয়েছিল। সেই ছবি

'ফাস্ট' হয়। হাইকোর্টের কোন জজ্ নাকি কিন্‌তে চায় ১৭০০ টাকায়। সত্বর মত জান্‌তে চেয়েছে।

বাহাদুর আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিল। সে যে নীরবে লোকটির সেবা করিয়া যায়—এমনিই কি? সে যেসে লোকের সেবাও করে না—দস্তুরমত গুণগ্রাহীর সেবক সে! আত্মপ্রসাদের গর্ব্বে প্রভুভক্ত বাহাদুরের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ১৭০০ টাকা পাইলে তাহাদের অভাবও থাকিবে না।

বাহাদুরের হাত দিয়া ভণ্টু একটা চিঠি পাঠাইল—অরূপের কাছে। বর্ত্তমানে টাকা পাওয়া গেলে ভালই হয়—তবে অরূপ যা' ভাল বিবেচনা করে—ইত্যাদি।

উর্ম্মির ব্যাঙ্কে যে টাকা ছিল—তাহাই দিয়া ছবিখানা কেনা হইয়াছিল। উর্ম্মির 'ফটো'—ন্যায়তঃ ওখানা উর্ম্মিরই প্রাপ্য। রাকাবাবু—বাহাদুর মারফৎ ১৭০০ টাকার চেক্ ভণ্টুকে পাঠাইয়া দিলেন।

ভণ্টু যেন জীবনে নূতন আনন্দের স্বাদ পাইল। বিষাদভরা নিরানন্দময় জীবনে—কতদিনকার দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সাম্‌নে কে যেন ধরিয়া দিল পরমান্ন। মানুষের কঠোর পরিশ্রম যদি সার্থক হয়, তাহার যে কি আনন্দ—সে শুধু জানে ভুক্তভোগী। আজ তাহার পরিশ্রম সফল—সে আবার নূতন প্রেরণায় হইয়া উঠিবে সমুজ্জ্বল। বাঁচিয়া থাকুক, দীর্ঘজীবী হউক অরূপ।

চারিদিক হইতে ভণ্টুর সম্মানও বাড়িয়াছে। ইহারি মধ্যে—দুই এক জায়গায় ভাল চাকুরির সন্ধানও মিলিতেছে। দেখাই যাউক, অদৃষ্ট আবার কোথায় লইয়া যায়। উপস্থিত কর্ত্তব্য একবার বউদির সংবাদ লওয়া।

মা এবং গৌরীর জন্তে কিছু কাপড় ও খুঁটিনাটি দু'একটি জিনিস্ কিনিয়া সে বাহাদুরকে জানাইল—বাড়ী হইতে ওই পথেই সে একবার শিউড়ী হইয়া ঘুরিয়া আসিবে। দিন চারেকের মধ্যেই ফিরিবে।

বাহাদুর জানাইল—সে সব ঠিক আছে।

ভণ্টুর মুখে সব কথা শুনিয়া মা বিমলাদেবী শুধু আনন্দ-অশ্রু ফেলিলেন, বলিলেন—বাবা ভণ্টু, শুনে খুব সুখী হ'লাম। তোর মাসীকে গিয়েও খবর দিস্। আমার থেকে গঙ্গাজল তোকে কিছু কম স্নেহ করে না। আর তা' ছাড়া বুড়োও তো হ'লাম—এখন তোদের রেখে যেতে পারলেই আনন্দ। তবে তোর জন্তেই অশান্তি—না হ'লি গৃহী—না সন্ন্যাসী।

ভণ্টু বলিল, মা কিছুমাত্র ভেবনা—যে বাহাদুর আছে, আমার কোন ত্রুটিই রাখেনা।

বিমর্ষ হইয়া বিমলা বলিলেন,—কি আর বলি বল। বেঁচে থাক্ বাহাদুর। যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিস্—রাজা হয়েও পথের ভিখারী।

ভণ্টু অবাক্ না হইয়া পারিল না—একটু হাসিয়া বলিল, কবেই বা রাজা হ'লাম আর আমার এখুনি বা দুঃখটা কি—বুঝ্‌লাম না।

অনেক কথার পর বোন্ গৌরী খুব চিন্তান্বিত হইয়া ভণ্টুকে জানাইল,—মায়ের শরীর খুব খারাপ, রোজ রাতে একটু করিয়া জ্বর হয়। এই কিছুদিন পরেই আবার সেও চলিয়া যাইবে, ভণ্টুও থাকে বিদেশে। যে দেশ—ডাকিলেও একটা লোকের সাড়া পাওয়া যায় না, ইত্যাদি।

বিমলাও বলিলেন,—ভণ্টু, এ দেশ আমার একটুও ভাল লাগে না। সব থেকে বড় কথা, গঙ্গা নেই। 'উনি' বেঁচে থাকতে সেই ভয়ই সর্ব্বদা

ক'রতেন।—মহাপুরুষ ছিলেন, তাই কাজ উপলক্ষে নবদ্বীপ গেলেন—সেইখানেই দেহ রাখ্‌লেন। তোমাদের আর কিইবা বল্‌বো, তবে তোমরা বিব্রত হচ্ছ—তাই বল্‌ছি। শিউড়ী আমার খুব ভাল লেগেছে। গঙ্গার তীর, তা' ছাড়া গঙ্গাজল রয়েছে। যদি একটু জমি খোঁজ করে দু'শো টাকার মধ্যে একটু চালাঘর তুলে' দিস্—বড্ড আনন্দ পাই। শেষ সময় এই ইচ্ছাই আমার বেশী।

ভণ্টু ও গৌরী—সহজেই রাজী হইল। ভণ্টু বাহাদুরকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিল—দিন আষ্টেক তাহার দেরি হইবে—ভাবিবার কারণ নাই। আর স্কুলের পণ্ডিত মশাইকে সংবাদ দিতে জানাইল যেন স্কুলে খবরটা দেন।

মায়ের ও দিদির পায়ের ধূলা লইয়া ভণ্টু নির্দ্দিষ্ট দিনে শিউড়ী রওনা হইল।

ভারতীর দিন দিন শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে জীবনের আর কিছুমাত্র আশা নাই। ভারতী শুইয়া ছিল। সারাদিন একটু জ্বর আছে। কথা বলিবার ক্ষমতাও আর বিশেষ নাই।

দুর্গাবতী অদূরে বসিয়া খুকীকে তেল মাখাইতেছিলেন, বলিলেন,—

—দেখ বউমা, তোমার মেয়ে বাছা এরি মধ্যে আমাকে চিনতে পারে। মুখের খানিকটা কানুর মত আদল আসে। ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া দুর্গাবতী বলিলেন কথা কয়টি—বউএর আনমনা ভাবটা কাটাইবার জন্য।

ভারতী শুধু ক্ষীণ হাসি হাসিল।

আবার বলিলেন, হ্যাঁগা বাছা—তুমি কিছু বল্‌তে চাও? তোমার শরীর কি রকম বুঝছ? শ্যামকে কি 'তার' ক'রবো?

ভারতী হাত নাড়িয়া বাধা দিল—তারপর আস্তে আস্তে বলিল, এমন কিছু কি আর হয়েছে যা'র জন্তে লোককে বিব্রত করবেন? তা' ছাড়া আপনি তো ক'বরেজ মশাইকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

বিমনা হইয়া দুর্গাবতী বলিলেন, কি যে করি—বুঝিনা বাছা। সবাই তো বল্‌ছে—আঁতুরে পোয়াতীর অমন হয়। যেমন বরাত করে' এসেছিলাম, তেমন তো হবে? অথণ্ড পেন্নমাই, মন্ন:বাও না তো?

—কিগো, কি বল্‌ছ মাসীমা—আল্‌গা বাহিরের দরজা ঠেলিয়া ভণ্টু প্রবেশ করিল। দুর্গাবতী আপন অদৃষ্ট নিয়ে তন্ময় ছিলেন—ভারতী চোখ বুঁজিয়া শাশুড়ীর কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল।

সচকিতে চোখ মেলিয়া দুর্গাবতী আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। প্রায় কাঁদিয়া বলিলেন, আয় বাবা ভণ্টু—বেঁচে থাক্—তুই ছাড়া আর আমার কেউ নেই। এতক্ষণে অনুভব করিলেন—কণ্ঠ তাঁহার শুকাইয়া গিয়াছে। কাল একাদশী গিয়াছে—এক ঘটি জলের এখন প্রয়োজন তাঁহার।

ভারতীর তো ভুল হয় না—শাশুড়ীর খাওয়ার সম্বন্ধে তাহার আগ্রহই তো বেশী? কাল একাদশী গিয়াছে, আজ এখন পর্য্যন্ত তিনি খাননি—ভারতী একবার জিজ্ঞাসাও তো করিল না? কি এক অজানিত আশঙ্কায় দুর্গাবতী শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁর বউএর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া।

ভণ্টুর সঙ্গে ভারতী বেশ হাসিয়া গল্প করিল। যখন শুনিল ভণ্টু তাহাদেরি বৈঠকখানার পাশে ঘর উঠাইবে—তখন ভারতী খুব আনন্দ প্রকাশ করিল। গৌরী ঠাকুরঝিকে তাহা হইলে আবার সে দেখিতে পাইবে।

দুর্গাবতী বলিলেন, আমি কালই চিঠি লিখে দিচ্ছি গঙ্গাজলকে—চ'লে আসুক শীগ্‌গির'। একাটি আমারও দিন কাটেনা।

ভণ্টু বুঝিল, ভারতী আগের থেকে ভালই। তবু সন্দেহের অবকাশ না রাখিয়া বড় একজন ডাক্তারকে হুগলী হইতে আনাইল।

ডাক্তার আসিয়া কিন্তু ইংরাজীতে যাহা মন্তব্য প্রকাশ করিল—শুনিয়া ভণ্টু স্তম্ভিত হইয়া গেল!

—দু'দিন আগেও যদি ডাক্‌তেন, তবু আপনারা রোগীর প্রতি কিছু কর্ত্তব্য ক'রতেন। রক্ত-শূন্য—শরীরে এক ফোঁটাও রক্ত নাই—যে কোন মুহূর্ত্তে 'হার্ট্‌-ফেল্‌' ক'রতে পারে।

ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, কোন উপায় নেই?

গম্ভীর মুখে ডাক্তার বলিল—কোন উপায় নেই। তবে আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে' থাক্‌বেন না—অন্য কোন ব্যবস্থা ক'রতে পারেন।

ভণ্টু কাহাকেও না জানাইয়া শ্যামলালকে 'তার' করিয়া আসিল।

পরদিন ভারতী নিজে খাবার চাহিল—দুর্গাবতী আনন্দের সঙ্গে বউকে খাইতে দিলেন। ভারতী নিজের কাপড়ে মুখ মুছিয়া দুর্গাবতীকে বলিল,—এবার আপনি খান্‌গে মা। আজ আমি বেশ ভাল আছি। তবে আপনার পায়ের ধুলো আমার মাথায় বুলিয়ে দিন—বেশ ভাল ক'রে দিন।

দুর্গাবতী বধূকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। খুকীকে এখানে শুইয়ে দিয়ে যাই—কি বল বউমা?

উদাস কণ্ঠে ভারতী বলিল—দি'ন।

দুর্গাবতী খুকীকে শোয়াইয়া দিয়া বলিলেন, ভণ্টুকে ডেকে দিয়ে যাই, একা থাক্‌বে—কি বল?

হ্যাঁ, ঠাকুরপোকে ডেকে দিয়ে যান।

ভণ্টু আসিয়া বলিল,—বেশ ভালই তো আছ বউদি ?

ভারতী শুধু হাসিল। ভণ্টু বাহির পানে কি দেখিতেছিল—ভারতীর ডাকে চমক ভাঙ্গিল।

—গোটাকতক কথা আছে আমার···তোমায় বল্‌বার।

কিন্তু আজ্‌কেই না বল্‌লে নয় বউদি ? শরীর খারাপ—বেশী কথা বলা ঠিক হবে কি ?

ভারতী তবু বলিল—আজ ভাল আছি।

—শোন ঠাকুরপো, খুকীটার ভার তোমায় নিতে হবে। আর সময়মত ওকে শুক্লার কাছে পৌঁছে দিও—অবশ্য মা'র অবর্ত্তমানে।

ভণ্টু বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য ! তাহা হইলে বউদির কি বিকার হইল নাকি ? কি সব বাজে বকিতেছে ?

ভারতী ভণ্টুর বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিয়া হাসিল,—না ঠাকুরপো, ঠিকই বল্‌ছি। বড় ইচ্ছা ছিল রমার সঙ্গে দেখা করার—শেষ ইচ্ছা মনেই থাক্‌লো। মাসীমাকে এইখানে আন্‌বার ব্যবস্থা করো—মা একা থাক্‌বেন। ভণ্টুর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া ভারতী অনুরোধ করিল—ঠাকুরপো আমার প্রধান কর্ত্তব্য অসমাপ্ত থাক্‌লো—বল তুমি, কথা দাও—আমার বুড়ো শাশুড়ীর ভার নিলে—পণের বন্ধন এই শিশু—এর ভারও নিলে !

ভণ্টু ব্যথিত হইয়া উত্তর দিল—কি বল্‌ছ বউদি। কেন ব্যথা দিয়ে কথা বল্‌ছ ? তোমার বন্ধন তোমার থাক্‌। সন্ন্যাসী মানুষ আমি—আমার আশ্রয় কখন কোথায় তার কি ঠিক আছে ? অবলম্বনের মধ্যে একটা বুড়ো মা—তাকেও মনে ক'রছি তোমাদের কাছে গছিয়ে দেবো। নিজেও তোমাদেরি ভরসা করি। আমার যে আপনার বল্‌তে জগতে তোমরাই। তোমার কি সাজে বউদি -স্বার্থ-

পরের মত নিজের দিকটা দেখা ? আমার বউদি—সে যে কতো বড়—ত্যাগই হলো তা'র ধর্ম্ম।

ভারতী স্থির দৃষ্টি মেলিয়া খলিতকণ্ঠে জবাব দিয়া গেল—সবই সত্যি ঠাকুরপো—কিন্তু তবু আমার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেলাম। আর আমার অনুরোধ—তোমার দাদাকে ভুল বুঝ না। লোকটা কোন-দিনই নিজের সুখ সুবিধা দেখ্‌ল না ; শুধু সাধনা তার, পয়সা। এত শীগ্‌গির আমার ডাক্ আস্‌বে—সে জান্‌তো না। আর একটা কথা—শুক্লার স্বামী—তুমি। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যা' করা কর্ত্তব্য, যদি কোনদিন বোঝ—সে সময় উপস্থিত—সেদিন তুমি নিজের কাজ ক'রতে অবহেলা করো না। তার শত দোষ তোমায় ক্ষমা করতে হবেই সেদিন। যেখানেই থাকি না কেন—সেই শুভ ক্ষণের জন্যে আমার আত্মা প্রতীক্ষা ক'রবে……।

গম্ভীরমুখে ভণ্টু বলিল, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। কিন্তু আমার ধারণা—তুমি নিশ্চয়ই ভালো হবে।

ভারতীর পাণ্ডুর মুখে শুধু এক ঝিলিক হাসি খেলিয়া গেল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ নিস্তেজ হইবার পূর্ব্বে যেন একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া প্রাণের একান্ত কথা কয়টি বলিয়া সহসা চির-অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল ! দুর্গাবতী আছড়াইয়া পড়িলেন।

ভারতীর মৃত্যু এত আকস্মিক যে ভণ্টু প্রথমটা বুঝিতেই পারিল না। দুর্গাবতীর ক্রন্দনে এক্ষণে সে উপলব্ধি করিল—ভারতী আর ইহজগতে নাই।

শ্যামলাল যথাসময়ে 'তার' পাইয়াছিল এবং সেই দিনই আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও ভারতীর প্রাণহীন দেহ ঘরের মধ্যে—ভণ্টু বোধ হয় ট্রেনটার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল।

শ্যামলাল যখন শুনিল ভারতী আর নাই—শুধু নির্ব্বিকারচিত্তে ভারতীর মাথার কাছে গিয়া বসিল। মৃতা স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া দু'টি কথা শুধু বলিল,—একি ক'রলে ভারতী, আমাকে এমনিভাবে ঋণী ক'রে চ'লে গেলে? ভারতীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার বলিল,—এমনি ক'রে ভুল বুঝ্‌তে হয়? আমি যা' করেছি সবি যে তোমার জন্যে—সেই জন্যে আজ পর্য্যন্ত ফাঁকিকেই পেয়ে আস্‌ছি। তা'তেও দুঃখ ছিল না—তুমিও স্ত্রী হ'য়ে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলে?

তারপর ভণ্টুকে উদ্দেশ করিয়া শ্যামলাল বলিল—যাও ভণ্টু তোমার বউদিকে নিয়ে যাও। ওর শেষ কাজ তুমিই কর। জন্মান্তর যদি মান্‌তে হয়—তাহ'লে জন্মান্তরে তুমিই ছিলে ওর পরম আত্মীয়। আমি যেখানে এক ফোঁটা ওষুধ দিয়েও কর্ত্তব্য রক্ষা করিনি—সেখানে মুখে আগুন দিয়ে আর অধিকার দেখাবার সার্থকতা আছে মনে করি না।

... ...

শ্যামলালের মুখে যেন নামিয়া আসিয়াছে একখণ্ড জমাট্‌ কালো মেঘ। সেখানে এক ফোঁটা বরিষণ নাই, রৌদ্র নাই—শুধু একখানা কালো মেঘ! ভারতীর ঘরেই সে আশ্রয় লইয়াছে। কাহারও সাথে একটা কথাও বলে না—বিশেষ প্রয়োজনেও নয়।

লোক মারফৎ খবর পাঠাইয়া ভণ্টু মা ও দিদিকে নিজের দেশ হইতে আনাইয়াছে। কিন্তু শ্যামলালকে দেখিয়া ভণ্টু চিন্তিত হইয়া পড়িল। এদিকে শ্যামলালের ছুটিও বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল—শ্যামদা কল্‌কাতায় কবে যাচ্ছ?

অবিচলিত কণ্ঠে শ্যামলাল বলিল—আমার কল্‌কাতা যাওয়ার আর তো দরকার নেই। চাক্‌রিতে 'রিজাইন' দিলাম।

ভণ্টুর মাথার ভিতরটা কে যেন ঘোলাইয়া দিল! কি ব্যাপার! শ্যামলাল দিল চাক্‌রিতে জবাব! এর থেকে আশ্চর্য্য দুনিয়ায় কি হইতে পারে!

শ্যামলাল এইবার নিজের থেকেই বলিয়া গেল—আর কিসের জন্য আমার কষ্ট করা? যা'র ভবিষ্যৎ ভেবে, যা'কে সুখী করার আশায় আমার উপার্জ্জনের দিকে ঝোঁক ছিল—সেই যেখানে ভুল বুঝে' চ'লে গেল—আর কেন? আমিও যেখানে ওই পয়সা ভালবেসে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম—তাই বুঝি শেষ দেখাও সে ক'রলে না। তা'ছাড়া জানিস্ ভণ্টু, তোর বউদির পয়সায় বড্ড ঘেন্না ছিল—ও জিনিসের সংস্রব পারতপক্ষে আমি এড়াবার চেষ্টা ক'রবো।

এ দুনিয়ায় সবই সম্ভব—ভণ্টু আজ এই প্রথম উপলব্ধি করিল। সব মানুষের ভিতরেই ভগবান্ বাস করেন—স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে তিনি হ'য়ে ওঠেন জাগ্রত। শ্যামলালের উপর ভণ্টুর যে বিশ্রী ধারণা ছিল, আজ তাহা চোখের সামনে বিপর্য্যস্ত হইতে দেখিয়া ভণ্টু নিজের মনে মনেই বিচার করিয়া বুঝিল—মানুষের দোষ গুণের মীমাংসা করিতে যাওয়া কতো বড় মিথ্যা।

ভণ্টুর যাইবার দিন শ্যামলাল বলিয়া দিল—অফিস ফাণ্ডের টাকাগুলি তুলিয়া সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দিতে মায়ের নামে—আর ভণ্টুই যেন জামিন

থাকে। শুধু মাসহারা হিসাবে যতটুকু দরকার শ্যামলাল যখন যেখানে থাকিবে, চাহিলে যেন পায়।

ভণ্টু যখন মেসে এবং অফিসে যাইয়া শ্যামলালের কথা প্রচার করিল তখন সকলেই শ্যামলালের চরিত্রের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন শুনিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না।

অফিসের তখন যিনি বড়-সাহেব তিনিও সমস্ত শুনিয়া 'লেকচারের' ছলে দু'ছত্র বলিয়া গেলেন—বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাত। সময় সময় এমন উদারতা দেখায় যাহা প্রশংসনীয়, এবং হয়তো অনেক জাতের মধ্যে অনেকে পারে না। শ্যামলালবাবুর কর্ম্মজীবনে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে ধারণা ছিল—পেন্‌সন গ্রহণ করাইতেই হয়তো একটু কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু সেই শ্যামলালবাবু চরিত্রের এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখাইলেন যাহা ভাবিবার বিষয়।

মনের উপর দিয়া একটানা খুব খানিকটা ঝড় বহিয়া গেল ভণ্টুর। তাই ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য সে বাহাদুরের জিম্মায় দেহ এলাইয়া দিল।

ভারতী তো চলিয়া গেল। শ্যামলালও মনের দুঃখে বাড়ী ছাড়িয়া পশ্চিম পানে রওনা হইয়া গিয়াছে। সবাই নিশ্চিন্ত মনে যা'র যা' দায়িত্ব ছিল, নির্ব্বিবাদে ভণ্টুর উপর চাপাইয়া সরিয়া পড়িল। ভণ্টু একটু হাসিল। তাহার নাকি দুঃখ থাকিতে পারে না বা সাজে না। সে যেন কর্ম্মফল-ত্যাগী সন্ন্যাসী—যাহার নিকট সুখ বা দুঃখ অনুভূতির বাহিরে। যাহা হউক, ভারতীর মেয়েটি যতদিন না বড় হয় আর ভারতীর শেষ আদেশ পালন করিবার ভার যখন গ্রহণ করিয়াছে—ততদিন দায়িত্ব

তাঁহারই। শ্যামলালও আবার যাইবার পূর্ব্বে ভণ্টুর নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছে যে, ভারতীর স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ তাহারি গ্রামে যে কোন সৎ প্রতিষ্ঠান যেন গড়িয়া তোলা হয়। ভণ্টুও তাই প্রতিজ্ঞা করিল যে আজ হইতেই সে জীবনের ধারা বদলাইয়া ফেলিবে। কিন্তু নিজের আদর্শ মত জীবনের সেই পরিবর্ত্তন সাধন করিবার মত শক্তিই বা তাহার কই? অথচ দায়িত্ব লইয়াছে অনেক কিছুর। গ্রহচক্রের আবর্ত্তনে তাহার জীবনের শেষ পরিণতি কোথায় গিয়া ঠেকিবে তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। ভণ্টুর বহুদিনের ইচ্ছা সে একটি 'ষ্টুডিও' খুলিবে। কিন্তু যে পরিমাণে টাকার প্রয়োজন তাহার একাংশও ভণ্টুর নাই।

শ্যামলালের সবসুদ্ধ দশ হাজার টাকা ভণ্টুর জিম্মায় জমা আছে। ভারতীর 'মডেলটি' ভাল করিয়া তোলার বাসনাও তাহার বহুদিনের। উপস্থিত বিশ্রামের জন্য কিছুদিনের মত তাহার শিউড়ীতে থাকিবার ইচ্ছাই বেশী। তবে শিউড়ীর কথা মনে পড়িলে প্রথমেই ভারতীর সেই ব্যথা-কাতর মলিন মুখখানি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। বেচারী ভারতী, যদি জানিয়া যাইত—শ্যামলাল কত ত্যাগী—আজ তাহারি জন্য শ্যামলাল এক কথায় সংসারের সর্ব্ব সুখ পরিত্যাগ করিয়া চির অনভ্যস্ত দুর্গম পথের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল—তাহা হইলে মরণেও হয়তো ভারতী কিছুটা শান্তি লইয়া যাইতে পারিত। চিরদিন না খাইয়া না পরিয়া যে অর্থ শ্যামলাল সঞ্চয় করিয়াছিল—আজ তাহার একটি কপর্দ্দকের প্রতিও কোন আসক্তি নাই। আজ একবার ভাবিয়া দেখিলও না সে নিজের বলিতে কিছু। পরম বিশ্বাসে বড় ভাইয়ের দাবিতে ভণ্টুর উপর অধিকার জানাইয়া চলিয়া গেল। কেবল সেই কথা শ্যামলালের—থাকিয়া থাকিয়া ভণ্টুর অন্তরে ঘা দিয়া যায়।—'আবার চাকরি কেন;—আমি তো নিজের জন্যে কোনদিন কিছু করিনি।'

মানুষের সাময়িক ভুলের জন্য—জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি পর্য্যন্ত কি ব্যথার বোঝাই না বহিয়া মরিতে হয়!

দুইটি জীবন অকালে নষ্ট হইয়া গেল। একজন চলিয়া গেল জীবনের পরপারে—আর একজন মনের গ্লানিতে দগ্ধ হইয়া কোথায় যে উধাও হইল কে জানে।

শ্যামলাল বলিয়া গিয়াছে—মাসে একখানা চিঠি দিবে। সেই ঠিকানার নির্দ্দেশমত—যখন শ্যামলালের যতটুকু প্রয়োজন—ভণ্টু যেন পাঠাইয়া দেয়। তবে মা যতদিন জীবিত থাকিবেন, বছরে একবার আসিয়া মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া যাইবে শ্যামলাল। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ভণ্টু ক্লান্ত হইয়া উঠিল। শেষে স্থির করিল সে কিছুদিনের জন্য শিউড়ীতেই যাইবে। বাহাদুর কলিকাতায় থাকুক, কোন ভাল কাজের সন্ধান পাইলেই সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে।

... ...

চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত হাজারিবাগ।

হাজারিবাগ রোডে একখানা বাড়ী ভাড়া লইয়া মাধববাবু আসিয়াছেন। কিছু দূরেই 'কেনারী হিল'। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—তবু রমা বসিয়া কেনারী হিলের কোলের নীচে। তাহার দুঃখের বন্ধু এই পাহাড়—তাই নীরব বন্ধুর কাছে আসিয়া সে বসিয়া থাকে এবং দু'চোখের অবিরাম জলধারায় পাষাণ পাদমূল সিক্ত করে। তাহার অব্যক্ত প্রাণের দুঃখ লোকসমাজে বলিবার নয়। যে পৃথিবীর অপরূপ রূপকে রমা কতো ভালবাসিত—আজ তাহারি চক্ষে সেই পৃথিবীর হইয়াছে মৃত্যু। কাহার অভিশাপে তাহার এই দশা!

ভারতী, সেও সহিতে পারিল না—চলিয়া গেল। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি পর্য্যন্ত তাহাকে তিলে তিলে দগ্ধ হইতে হইবে। কোথায় গেলে

মুহূর্তের জন্য শান্তি পাওয়া যায়! ক্রমে সন্ধ্যাতারা আকাশের বুকে ফুটিয়া উঠিল আর ধীরে ধীরে অন্ধকারের কালো মলাটখানা পৃথিবীর বুকে কে যেন ঢাকা দিয়া দিল। দিন যায়, রাত আসে। মাস, বছর সবই ঘুরিয়া আসা যাওয়া করে, কিন্তু কোথায় যে মানুষ চলিয়া যায় মৃত্যুর পরে—ভাবিয়া ঠিক পাওয়া যায় না। রমা আজ দু'মাস ধরিয়া কত দেশ খুঁজিল—কিন্তু কই, ক্ষণিকের তরেও অনুপম তো দেখা দিল না! মৃত্যুই মানুষকে করিয়া দেয় নিষ্ঠুর! না হইলে অনুপম তো হৃদয়হীন ছিল না। ভালবাসার কি কোন মূল্যই নাই? আজ সে কাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে। এমন করিয়াই কি প্রাণের সব রস নিংড়াইয়া লইয়া যাইতে হয়!

ভারতী আর রমা—এক বৃন্তে যেন দুইটি ফুল ফুটিয়াছিল। একজন অকালে ঝরিয়া গেল—আর একজন শিলার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শুষ্ক ডালে কোন গতিকে দোল খাইতেছে। একুশ বছর বয়সেই সব সমাপ্তি।

জয়াদেবীর আবার শোকের উপর নূতন করিয়া ভগবানের আঘাত দেওয়া—তাঁহার সন্তান সম্ভাবনা। একেই শোকাবিষ্টা, তাহার উপর লজ্জায় ধিক্কারে আরো যেন পাগলের মত হইয়াছেন তিনি।

মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া স্বামী, স্ত্রী—২০ হাজার টাকার 'ক্যাস-সার্টিফিকেট্' রমার নামে কিনিয়া দিলেন। অনুপমও ১৫ হাজার টাকার "লাইফ ইনসিওর' করিয়াছিল—রমাই পাইয়াছে।

রমা আসিয়া মায়ের কাছে দাঁড়াইল। জয়া দেবী শুইয়াছিলেন, মেয়ে বড় একটা মা—বাবার সামনে আসে না। রমাকে দেখিলেই জয়া কাঁদিয়া অস্থির হন।

—মা !

জয়াদেবী পাশ ফিরিলেন। আয় মা—রমাকে কোলের কাছে বসাইয়া রুক্ষ জট-বাঁধা চুলের মধ্যে হাত দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিছু বল্‌বি রমা, বল্‌ ?

মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া রমাও কাঁদিয়া ফেলিল, একটু স্থির হইয়া জানাইল,—এখানে আর একটুও ভাল লাগছে না। তা' ছাড়া তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল আমাদের ওই দেশে, বিশেষতঃ আমাদের ওই গ্রামে একটা ভাল কলেজ তৈরী করার। বিনোদ ঠাকুরপোও ১৫ হাজার টাকা দেবে —চিঠি দিয়েছে। তুমিও আমায় কিছু দাও।

জয়াদেবী বলিলেন—খুব ভাল কথা। তোমার শান্তিতেই আমার শান্তি !

মাধব রায় শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন—তাঁহারি মেয়ে তাহার যোগ্য আবেদন জানাইয়াছে। আরও ১৫ হাজার টাকা দিতে তিনি তখনই সম্মত হইলেন। জীবনে বহু পয়সা উপায় করিয়াছেন—ইচ্ছা করিলে আজও করিতে পারেন। কিন্তু ভগ্ন মনকে খাড়া করা যায় না। ম্লানমুখী দুঃখিনী মেয়ের মুখ—সব সময়েই চিন্তার ব্যাঘাত ঘটায়—ও যদি কিছু লইয়া শান্তি পায়, পা'ক।

তার পরদিনই মাধব রায় দেশের ঠিকানায় 'তার' করিয়া দিলেন—শীঘ্রই দেশে রওনা হইতেছেন।

... ...

অনেক ভাবিবা চিন্তিয়া রাণীমা স্থির করিলেন—শুক্লার দিন কতক বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন। ইউ, পির মধ্যে গড়মুক্তেশ্বরে অনেক আত্মীয় পরিজন আছে। তা'ছাড়া সেখানকার বিশাল জমিদারি—ম্যানেজারের

উপর ভার। নিজেদেরও মধ্যে মধ্যে দেখাশুনা করার প্রয়োজন। কর্ত্তার শেষ ইচ্ছা ছিল, গড়মুক্তেশ্বরের গোটা দুই মহাল যেন শুক্লাকে বিবাহে যৌতুক দেওয়া হয়।

এখান হইতে 'তার' পাঠানো হইয়াছিল—ষ্টেটের তরুণ ম্যানেজার বিমল রায়ের নামে। শুক্লার যাইবার দিন রাণীমাই স্থির করিয়া দিয়াছিলেন।

যথাসময়ে গড়মুক্তেশ্বরে পৌছাইতেই ম্যানেজার হইতে বাড়ীর নিম্নতম কর্ম্মচারিটি পর্য্যন্ত সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া শুক্লাদেবীকে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া অভ্যর্থনা করিল। গেটের দুইদিকে দুইজন বন্দুকধারী প্রহরী দাঁড় করাইয়া গাড়ি প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সম্মান-সূচক তোপধ্বনি করাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রীতিমত সমস্ত নিয়মই পালন করা হইয়াছিল—রাজকুমারী শুক্লার আগমন উপলক্ষে।

বাপের এক বৃদ্ধা পিসি মাতঙ্গিনী দেবী—সাদরে শুক্লাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বহুদিন পরে আপনার বংশের মেয়েকে দেখিয়া বৃদ্ধা আনন্দাশ্রু ফেলিলেন, এবং সকলের কুশল সমাচার খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। শুক্লার প্রাণান্ত। কিন্তু মায়ের আদেশ—গুরুজনদের উপর যেন কোন প্রকারে বিরক্তি প্রকাশ না করা হয়। মাছ ধরানো হইতে নানা রকম খাবার তৈয়ারী—কিছুরি ত্রুটি হয়নি। বহুদিন পরে শুক্লা যেন আবার নিজেকে ফিরিয়া পাইল।

বড় পিঁড়ি পাতিয়া পিসিমা সামনে বসিয়া শুক্লার আহারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

রূপার থালায়, রূপার বাটিতে কত রকমের উপকরণে তৈয়ারী কত রকমের খাদ্যদ্রব্য—শুক্লা না হাসিয়া পারিল না। তারপর প্রায় পাঁচজনের আহার—সে একা কি করিয়া সমাপ্ত করিবে!

পিসিমা গালে হাত দিলেন—শুক্লার আহারের পরিমাণ দেখিয়া।

—ও, তা'হলে বউ, ছেলেপুলের কোন খবরই রাখে না—কি বলিস্ খুকী?

শুক্লা একটু হাসিল।

—বাপ মরে গেল অল্প বয়সে—আজ তাই তোমাদের এই খোয়ার। তোমাদের খেয়ে পাঁচজনে গড়ে উঠ্‌ল—আর তোমাদের যত্ন অভাবে গালের হাড় বেরিয়ে গেল। বউ আমাদের চিরকাল এলোপাতাড়ি ভাবেই কাটাল—না চিন্‌লে পয়সাকড়ি, না বুঝলে সংসার।

অনেক আত্মীয়—সকলকেই শুক্লার পিতা সম্মানের সহিত রাখিয়াছিলেন—রাণীমাও সে নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই।

ত্রিতলের উপর পিতার নিজস্ব ঘরখানি শুক্লার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

ঘরে ঢুকিতেই সোনার 'ফ্রেমে' বাঁধা পিতার বড় 'অয়েল-পেন্টিং' ছবিখানির প্রতি নজর পড়িল। রাজবেশে পিতা দাঁড়াইয়া। বহুদিন পরে শুক্লা যেন পিতাকে আবার কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইল। নতজানু হইয়া সে খানিকক্ষণ পিতার 'ফটো'খানির নীচে বসিল এবং করজোড়ে পিতার উদ্দেশে প্রণাম জানাইল।

গড়মুক্তেশ্বরের দৃশ্যও ভারি মনোরম। চারিদিকে পাহাড়। যমুনার এক শাখা—পাহাড়ের গভীর খাদের কোল দিয়া সরীসৃপের মত কেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। শুক্লার ত্রিতলের ঘরখানি হইতে এর দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়।

শুক্লার আবার এরই মধ্যে একটি বন্ধুও জুটিয়াছে—নাম মিনতি—

তাহাদেরই দূর আত্মীয়া। কাঞ্চী মধ্যে মধ্যে ব্যস্ত হয়—তাহার ভাই বাহাদুরের জন্য।

তরুণ ম্যানেজার বিমলবাবু মধ্যে মধ্যে জানায়—চলুন না—আপনাদের জমিদারি একবার দেখ্‌তে?

শুক্লা উত্তর দেয়—কি দরকার, আপনি তো দেখ্‌ছেনই।

বিমল ছেলেটি ভালো। তা'র ইচ্ছা—নিজেদের জিনিস নিজেরা একবার দেখুক।

দু'মাস কাটিয়া গেল। বিমলের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে শুক্লার দেশ বিদেশের এবং নিজেদের জমিদারি-সংক্রান্ত দরকারী কথার আলোচনাও হয়।

মিনতি একদিন চুপি চুপি আসিয়া একটা নতুন খবর দিল।—জানেন শুক্লাদি, অসীমার সঙ্গে বিমলবাবুর বিয়ের কথা হচ্ছে। অসীমা ও বিমল বাবু দু'জনেরি খুব ইচ্ছা—কিন্তু বিমলবাবুর বাবা রাজী ন'ন।

অসীমা খুব দুঃখ করেছে—বল্‌ছে—ভাই মিনতি, আমি আত্মহত্যা ক'রব।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শুক্লা মিনতির মুখের পানে চাহিল—কেই বা অসীমা আর কিই বা কথা!

মিনতি সবিশেষ বুঝাইয়া দিল। অসীমা তাহার বন্ধু—এবং শুক্লারই একজন অতি সামান্য অবস্থার প্রজার মেয়ে। শুক্লার ঘর হইতে অসীমাদের কুঁড়েঘরখানি দেখিতে পাওয়া যায়। বেচারীর মা নেই। চারিটি বোন্, দুটি ভাই। দুটি বোনের বিবাহ হইয়াছে। অসীমা তৃতীয়। ছোট নাবালক ভাই বোন্—সবই অসীমার তত্ত্বাবধানে থাকে।

বিমলবাবু আশা দেন অসীমাকে বিবাহ করিবেন এবং সেইমত কথাও দিয়াছিলেন—কিন্তু দেশ হইতে বিমলবাবুর পিতা লিখিয়াছেন—'সামনের

১১ই তাঃ বিমলের বিবাহ স্থির—দিন কতক ছুটি হইয়া যেন চলিয়া আসে।'

—কি রকম ক'রে অসীমা কথাটা শুনেছে—বুঝ্‌লেন ভাই শুক্লাদি! তাই অসীমা আমার কাছে দুঃখ ক'রছিল।

আমি বল্‌লাম, কাঁদিস্‌নে। দিদিমণি এসেছেন—আমি একবার চেষ্টা ক'রবো।

উদাসভাবে শুক্লা জবাব দিল—আমি কি ক'রতে পারি।

... ...

শুক্লা কিন্তু ভারতীকে ভোলে নাই। মনের পটে মাঝে মাঝে ভারতী আসিয়া দেখা দেয়।

সেদিন একটু সকালেই শুক্লার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আলস্যভরে দেহটা মুচ্‌ড়াইয়া আল্‌গা চুলের বেণীটাকে জড়াইতে জড়াইতে খোলা বাতায়নপথে দাঁড়াইতেই অনুভব করিল—একটা জ'লো হাওয়া হুহু শব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ঘরের মধ্যে পাশের ঘর-সংলগ্ন দুয়ার খোলা—ওঘরে কাঞ্চী ও মিনতি শুইয়া আছে। জানালা বন্ধ করিতে গিয়া নজরে পড়িল—আধ-ময়লা কালো পাড়ের শাড়ি পরিয়া একটী সুন্দরী মেয়ে পাতকুয়া হইতে জল তুলিতেছে। টিনের বাড়ী—পাশেই এক ঝাড় কলাগাছ—তাহারই নীচে পাতকুয়া। এক কাঁদি কলাও ধরিয়াছে।

একটি ছোট ছেলে বসিয়া খুব কাঁদিতেছে—কিসের বায়না ধরিয়াছে বোধ হয়। শুক্লার সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই ছেলেটি থামিয়া গেল এবং ঘাড় হেঁট করিয়া মাটি খুঁটিতে লাগিল। শুক্লা বুঝিল—ওই মেয়েটিই অসীমা এবং ছেলেটি ওরই ভাই।

মিনতির একান্ত অনুরোধ শুক্লাদিকে—যে তিনি যদি একবার বলেন বিমলকে তাহা হইলে বিমলবাবু নিশ্চয় বিয়েতে অমত ক'রবেন না।

শুক্লা উত্তর দেয়—ওঁর বাবা যদি রাজী না হন, তাহ'লে একটা অশান্তি তো ?—আর আমার কথা শুনবেনই বা কেন ?

মিনতি দুঃখিত হইয়া চলিয়া যায়। অসীমাকে লইয়া মিনতি বেচারীর কি দুর্ভোগ!

ক্রমে ক্রমে শুক্লারও অসীমাকে দেখিতে দেখিতে কেমন একটা মায়া পড়িয়া গেল। অসীমাকে মিনতি দু'দিন জোর করিয়া শুক্লার নিকট লইয়া আসিয়াছিল। চমৎকার কীর্ত্তন গায় মেয়েটি। মুখখানিও ভারি সুন্দর। শুক্লারও তো সঙ্গী বা কথা বলার লোক চাই! কাজেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অসীমা শুক্লার নিকট পরিচিত হইয়া গেল।

ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। কি একটা জিনিস বাটি করিয়া অসীমা অতি সযত্নে কাপড় ঢাকা দিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে শুক্লার জন্যই বোধ হয় লইয়া আসিতেছিল। কাপড়ের খানিকটা মাথায় আলগোছে ফেলিয়া বৃষ্টির মধ্যে টিপিটিপি পা ফেলিয়া অসীমা আসিতেছিল—শুক্লা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল—সুন্দর অসীমা! নিটোল হাত দু'টিতে শুধু হলদে রংএর কাঁচের চুড়ি—তবু চমৎকার দেখায়। রুক্ষ এলো চুল বৃষ্টির জলে ভিজিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া দিতেছিল! হাস্নাহানার ঝোঁপের আড়ালে হঠাৎ বিমলকে শুক্লা দেখিতে পাইল। বোধ হয় অপেক্ষা করিতেছিল অসীমার জন্যেই।

বিমল। অসীমা, শোন একটা কথা।

অসীমা। এখন আমার কথা শোনবার সময় নেই।

বিমল। দু'মিনিট।

অসীমা। এক মিনিটও নয়। আমরা গরিব মানুষ, বড়লোক তুমি —তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলা, বিশেষতঃ এইস্থানে—পাপ!

বিমল। তুমিও ভুল বুঝ্‌লে?

অসীমা। ভুলের কিছু নয়। কেউ যদি দেখে, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমার কিন্তু অনেক ক্ষতিই হবে। আমার গরিব বাবাকে এর জন্যে শাস্তি ভোগ কর্‌তে হবে।

বিমল। কেউ কিন্তু ছিল না, শুন্‌লেও পার্‌তে।

উপরে জানালার কাছে যে শুক্লা দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল— বিমলের নজর সেদিকেই পড়িল না। শুক্লাও দাঁড়াইয়াছিল—নিজের মনে একটু হাসিয়া ক্ষণিকের জন্য সরিয়া আসিল!

বিমল আবার বলিল, যাও এখন—তোমার সব বড়লোক বন্ধু জুটেছে; বলা যায় কি, অদৃষ্টের চাকা হয়তো ঘুরে যেতেও পারে। কত রাজপুত্র জুট্‌বে এখন তোমার।

অসীমা চলিয়া আসিতেছিল, ঘাড় ঘুরাইয়া কথা ফিরাইয়া দিয়া বলিল,—সে তোমাদের চলে। ভালবাসাকে তোমরাই কেনা-বেচা ক'রতে পার—আমাদের চলে না। বিশেষতঃ, আমরা গরিব-গেরস্ত সামান্য মানুষ—আমাদের এক কথা। তোমাদের পরিবর্ত্তন আস্‌তে পারে, কিন্তু আমরা একভাবেই থাক্‌বো। দড়ি, কলসী বেঁচে থাক— যমুনা থাক্‌লো আমার জন্যে……ভয় কি! আর দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করিয়া হন্‌ হন্‌ শব্দে অসীমা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

শুক্লা আবার একটু হাসিয়া ধীর পদক্ষেপে 'ড্রইংরূমে' একটা সোফায় গিয়া বসিয়া পড়িল।

অনেক খুঁজিয়া অসীমা ও মিনতি শুক্লাকে বাহির করিল। নত মুখে অসীমা আসিয়া দাঁড়াইল।

একটু হাসিয়া শুক্লা বলিল, কিগো সীমা-রাণী, এ বৃষ্টিতে কি মনে ক'রে? লজ্জায়, সংকোচে অসীমা কথা বলিতেই পারিতেছিল না, মিনতি বলিয়া দিল,—ও নিজে হাতে চা'ল, ছোলা, বাদাম ভেজেছিল; বৃষ্টির দিনে খেতে ভাল লাগে ব'লে আপনার জন্তে এনেছে।

—ও, তাই নাকি? তা' দাও, লজ্জা কি? বাটিতে মাখা চাল, ছোলা, বাদাম ভাজা, নারিকেলের টুক্‌রা, শসার খণ্ড, কাঁচা লঙ্কা সবই ছিল—শুক্লা আনন্দসহকারে অসীমার কাছ হইতে বাটিটি গ্রহণ করিল। তারপর ডাকিল কাঞ্চীকে। কাঞ্চী আসিতেই শুক্লা অসীমাকে দেখাইয়া বলিল—এই দিদিমণিকে নিয়ে বাথরুমে যাও। আমার শাড়ি থেকে ভাল একটা শাড়ি, ব্লাউজ আর পেটিকোট দাওগে। যাও, ভিজে কাপড়ে থাকে না—অসীমা। কাপড় ছেড়ে' এসগে।

অসীমা একটু বিব্রত হইয়া কাঞ্চীর অনুসরণ করিল।

অসীমার আনীত জিনিসের গোটা দুই দাঁতে কাটিতেই শুক্লার বেশ ভাল লাগিল।

শুক্লার ভাল একখানা নীলাম্বরীতে অসীমাকে সুন্দর লাগিতেছিল। আড়-নয়নে শুক্লা অসীমাকে দেখিয়া লইল।......বস অসীমা। নিজে আরও কিছুটা তুলিয়া লইয়া বাটিটা আগাইয়া দিল—মিনতি ও অসীমাকে। তোমরা বস, আমি আস্‌ছি। স্যাণ্ডেলটা পায়ে দিয়া শুক্লা ওপরে উঠিয়া গেল।

মিনতি ও অসীমা খানিক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। শুক্লা ফিরিয়া আসিল—ছয়টি সোনার চুড়ি, একটি সোনার হার ও দুইটি

কানের দুল লইয়া। অসীমার হাতে দিল—পর অসীমা। মিনতি—ওকে পরিয়ে দাও।

অসীমা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে,—বুঝিয়া শুক্লা বলিল, লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। তোমরা আমার ছোট বোন্। আমার অনেক রয়েছে—শুধু বোঝা। তাই মাত্র দু'একটা ছোটখাটো দিলাম—পর।

একখানা কাগজে দু'ছত্র লিখিয়া বেয়ারাকে আদেশ করিল, বিমলবাবু……।

বিমল আসিয়া হাজির হইতেই সম্মুখে দেখিল, অসীমা। বোধ হয় বিমল ঘরে ঢুকিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল—নিজেকে সাম্‌লাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

সুবেশা অসীমাকে কিন্তু এই রকম সুন্দরভাবে দেখিবার সৌভাগ্য ইহার আগে বোধ হয় বিমলের হয় নাই।

বিমল নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্যে ডেকেছেন?

শুক্লা বলিল, বসুন, বল্‌ছি। শুক্লা কখনোই ভাবিয়া চিন্তাইয়া কথাকে ফেনায় না। মনের খেয়াল—যখন যাহা উদয় হয়—তখনি তাহা করিয়া ফেলে,—সে ভালই হউক আর মন্দই হউক। শুধু কেহ যদি প্রতিবাদ করে—তাহা হইলেই অন্য রূপ ধারণ করে। আর, কেহ যদি তাহাকেই 'বড়' করে—প্রাণপাত করিতেও সে কুণ্ঠা করে না।

শুক্লা স্পষ্ট কথায় বিমলকে বলিল,—আপনাকে আমি অনুরোধ ক'রছি—সামনের ১১ই তাঃ—অর্থাৎ আর সাতদিন পরে—অসীমাকে আপনার বিয়ে ক'রতে হবে। আপনার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই—আপনিই তাঁকে জানান। এ বিয়ে আমি দেবোই। কাজেই, যেটুকু আপনার প্রাপ্য—আমিই বিবেচনা ক'রবো। আশা করি তাতে আপনার বাবার অমত হবে না। বিমল আমৃতা আমৃতা করিতে লাগিল।

সবারি অজ্ঞাতে অসীমা একবার বিমলের মুখের পানে চাহিল। অর্থ বোধ হয়—বড়লোক বন্ধুর ক্ষমতা দেখ্‌লে তো ?

বিমল ধীরে ধীরে দু'টি কথা বলিল,—বাবাকে আমি এখুনি 'তার' ক'রে দিচ্ছি—আর আমার ধারণা, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি যাবেন না।

শুক্লার মুখে এক ঝিলিক হাসি খেলিয়া গেল! সকলেই পয়সার সম্মান রাখে—দু'দিন পূর্ব্বেও বিমল পিতার সুবোধ পুত্র ছিল!

সকলেই চলিয়া গেল—শুক্লা বসিয়া রহিল……। কাঞ্চী কোথা হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া শুক্লার চুলগুলি খুলিয়া আঁচ্‌ড়াইতে বসিয়া গেল।

কি ভাবিয়া শুক্লা জিজ্ঞাসা করিল, কাঞ্চী, তুই বিয়ে ক'রবি ?

কাঞ্চী লজ্জাবনত মুখে শুধু মুখ দিয়া শব্দ করিল,—ধেৎ।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা শুক্লা শুইয়াছিল—কাঞ্চী বসিয়া গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাইতেছিল। মিনতি অদূরে বসিয়া অসীমার বিবাহের "ছিরি" গড়িতেছিল—বিমলের পিতা নিজে আসিয়া শুক্লার নিকট সম্মতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—এই বাড়ী হইতেই বিমলের বিবাহ হইবে। আর অসীমার পিতা গোবর্দ্ধনবাবু, শুক্লাকে কি বলিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না ;—এ যেন স্বর্গ হইতে দেবকন্যা নামিয়া আসিয়াছে তাহাকে উদ্ধার করিতে।

শুক্লা গোবর্দ্ধনবাবুকে বাড়ীখানি মেরামত করিতে কিছু টাকাও দিয়াছে এবং নাবালক ছেলে দু'টিকে ভালভাবে পড়াইবার জন্য তাহাদের

'ষ্টেট' হইতে মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। দলে দলে দুঃখী প্রজার দল আবেদন নিবেদন লইয়া আসিতেছে—রাজকুমারী শুক্লা দেবীর কাছে। শুক্লা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিতেছে—প্রজাদের সুখ, সুবিধার।

শুইয়া শুইয়া শুক্লা বোধ হয় ভাবিতেছিল—জগতে শুধু তাহারি কেহ নাই—তাহার সুখ, সুবিধার খোঁজ লইবার। দরকার হয় নাই তাহার আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও—আর যেন নাও হয়। মা আবার বলেন,—শুক্লার জন্ত তিনি সর্ব্বদা চিন্তিত থাকেন—পাছে যদি সে ফের বিপথে যায়। শুক্লার ভাবিয়া হাসি পায়—মায়ের কাল্পনিক চিন্তা দেখিয়া।

মাতঙ্গিনী দেবী আসিয়া শুক্লার কাছে বসিলেন,—হ্যাঁরে খুকী, আজ তো বিকালে কিছু খেলিনে? শরীর ভাল আছে তো? শুক্লা মাতঙ্গিনী দেবীকে পিসিমা বলিয়া ডাকিত।

না পিসিমা, শরীর তো খারাপ হয়নি, ভাল আছি।

পিসিমা বলিলেন, হ্যাঁরে খুকী, নাত-জামাইকে একখানা চিঠি লিখে দে—একবার আসুক। আমি বুড়ো হয়েছি, কবে আছি কবে নেই—একবার তোদের জোড়ে দেখি।

শুক্লা অন্তমনস্ক হইয়া জবাব দিল—সে তো ভারতবর্ষে নেই—বিলেতে আছে। আমাকে যাবার জন্তে লিখেচে। আমি ভাব্ছি, যাবো।

পিসিমা বলিলেন, ত্যাখো! বউ আমায় কিছু জানায়নি! এখানকার লোকে একবার দেখ্তে চায় জামাইকে। তা' বল্তে নেই, ভগবানের দয়া, আমরা হ'লাম রাজ-বংশের লোক; আমাদের জামাই হ'ল গে' রাজা মানুষ। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে খুকী, তারা কেমন লোক? বলি, তা'দের অবস্থা তোর বাপেদের মতন তো?

শুক্লা বলিল, না—এতখানি নয়।

বৃদ্ধা বেশ খুশি হইলেন,—তাঁহার বাপের বংশের সমতুল্য নয়—ভাবিয়া। শুক্লাও মনে মনে হাসিল, পিসির মর্য্যাদা-বোধ দেখিয়া। কি দাম্ভিক! তাহারি বাপের পিসি তো!

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন, খুকী, আমার একটা ইচ্ছে আছে; বৈশাখ মাসে পুকুর প্রতিষ্ঠা ক'রবার।

শুক্লা বলিল, বেশ তো। তাহার মনে পড়িয়া গেল, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মায়ের ঠাকুর সাজাইবার ভার লইয়াছিল সে। প্রতুলও কত সাহায্য করিয়াছিল। আজ কোন কিছু উৎসব সমারোহের মাঝে তাহার পাশে দাঁড়াইবার কেহ নাই। একাকী চলিবার সঙ্কল্প লইয়া সে বাহির হইয়াছে সত্য—কিন্তু সে একাকীত্ব যে এমন সহনাতীত তা' কে জানিত।

... ...

ভণ্টু শিউড়ীতেই ছিল। গৌরী চলিয়া গিয়াছে। বিমলার শরীর ভাল নয়। দুর্গাবতী শোকে, দুঃখে কেমন যেন হইয়া গিয়াছেন। ভণ্টু, ভারতীর মেয়ের নাম রাখিয়াছে 'স্বপন'। শ্যামলাল কাশী হইতে মাকে একখানি চিঠি দিয়াছে। স্বপনের শরীর ভাল না থাকায় কেবল কাঁদিতেছিল। ভণ্টু বসিয়াছিল—দুর্গাবতীও স্বপনকে কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন।

হঠাৎ শুভ্র বস্ত্রাঞ্চলে দেহ ঢাকিয়া রমা আসিয়া লুটাইয়া পড়িল—দুর্গাবতীর পায়ের কাছে।

দুর্গাবতী খুকীকে শোয়াইয়া দিয়া রমাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভণ্টু নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে রমা একটু স্থির হইল।—কি ক'রবো জ্যাঠাইমা,

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রমা চাহিল দুর্গাবতীর পানে,—আমার যে কেউ থাক্‌লো না। শ্যামদা, তিনিও বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেলেন।

দুর্গাবতী দেখাইয়া দিলেন ভণ্টুকে.—ওই তোমার ভাই!

সংকোচ পরিত্যাগ করিয়া ভণ্টু রমার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল —দিদি, রমা, বোন্। যদি প্রয়োজন বোঝ, ছোট বোনের দাবি নিয়ে জানিও—দুর্ভাগ্যের বোঝা বইবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।

রমাও কোনপ্রকার সংকোচ বোধ না করিয়া বলিয়া ফেলিল,—দাদা, আমার স্বামীর ইচ্ছা ছিল—এই গ্রামের স্কুল সংলগ্ন ওই বড় মাঠটায়—একটা কলেজ গড়ে' তোলার, কিন্তু তাকি সম্ভব?

একে একে সব কথাই রমা ভণ্টুকে বলিয়া গেল।

ধীরভাবে সমস্ত কথা কান দিয়া শুনিয়া ভণ্টু বলিল,—দিদি, তোমার তো আর শোক করা চলে না। কতো বড় লোকের সহধর্ম্মিণী তুমি! বড় কাজের জন্য তোমার স্বামী রেখে গেছেন তোমাকে বড ক'রে জগতের মাঝে তুলে ধর্‌বার জন্যে! অসম্ভব ব'লে কিছু নেই। তোমার ইচ্ছা ও আগ্রহ যদি প্রবল হয়—সে সফল হবেই। তোমার অন্তরে যেটি জেগেছে—সেই ইচ্ছাই তোমার এই সৎ কার্য্যে সাহায্য ক'রবে।

রমাকে এমন করিয়া তো কেহ বোঝায় নাই। সানন্দে রমা স্বপনকে বুকে তুলিয়া লইল—দাও জ্যাঠাইমা, তোমার ছুটি। দুর্গাবতী তবুও খানিকটা নিশ্চিন্ত হইলেন!

জয়াদেবী ও মাধব রায় একটু শান্তি পাইলেন। ভণ্টু বিনোদের সঙ্গে যুক্তি করিতে লাগিল—কলেজ সম্বন্ধে। বিনোদের সঙ্গে ভণ্টুর বেশ মেলামেশা হইয়া গিয়াছে। বিনোদ মাঝে মাঝে আসে।

সেদিন সকালে বিনোদ পত্রিকাখানি খুলিয়া পড়িতেছিল, হঠাৎ ভণ্টুর নজর পড়িল—রাজকুমারী শুক্লার ছবির প্রতি। বিনোদ ভাল করিয়া পড়িয়া শুনাইতে লাগিল—কি অপূর্ব্ব দানের কথা! রমা শুধু বলিল—কি সুন্দর দেখ্‌তে। ভণ্টু অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া লইল। পারত-পক্ষে সে শুক্লার কথা ভাবিত না, নিজেকে সে তাহার নিকট হইতে বহু দূরেই সরাইয়া রাখিয়াছিল কিন্তু তথাপি আজ তাহার প্রসঙ্গ মনের অবচেতনার মাঝে তাহার স্বামীত্বের ক্ষীণ অধিকার যেন একবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। সকলের অলক্ষ্যে ভণ্টু একবার ছবিখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, কিন্তু তাহার পর সে আর ঘরে থাকিতে পারিল না, কি এক কাজের ছল করিয়া উঠিয়া গেল। বাহিরে কেহ ছিল না, থাকিলে দেখিতে পাইত—কি এক আর্ত্ত-বেদনায় তাহার চক্ষু দু'টি লাল হইয়া উঠিয়াছে।

... ...

ইহার পর দীর্ঘ সাতটি বছর পার হইয়া গিয়াছে। ধরণীর উপর দিয়া কত আশা, আনন্দ—ঝড়-ঝাপটা বহিয়া গিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে কত কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

ভণ্টুর মা ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভারতীর শোক, অনুপমের শোক, আস্তে আস্তে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। রমার একটি ভাই হইয়াছে। আঁতুড়ঘরেই জয়াদেবী নব-জাত শিশুকে রমার কোলে তুলিয়া দেন। দু'বছরের খোকন রমাকেই জানে। গ্রামে বড় কলেজও হইয়াছে—নাম—'অনুপম কলেজ।' নব প্রেরণায় মাধব রায় আবার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। জগতে যে যায়—সেই চলিয়া যায়। শোকের আয়ু অল্প—ক্ষতির পরিমাণ ক্রমেই সহ্য হইয়া যায়। ভারতীর খপন বেশীর ভাগ সময় রমার কাছেই থাকে। দুর্গাবতী

ক্রমশঃই স্থবির হইয়া পড়িতেছেন। বিনোদ নিজে কলেজের অধ্যক্ষ পদ এবং ভণ্টু কলেজ সম্বন্ধীয় যাবতায় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে। মাধব রায়ের সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা কলেজকে দান করিয়াছেন। রমা কোন গতিকে দিন অতিবাহিত করিয়া যাইতেছে—দুঃখের সাথী খোকন ও স্বপনকে লইয়া। শ্যামলাল রামকৃষ্ণ মিশনে গুরুদেবের মন্ত্র-শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 'শ্যামানন্দ' আখ্যা লাভ করিয়াছে। গুরুভাইদের সঙ্গী হইয়া কোথায় দূরদেশে থাকে—কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। কদাচিৎ চিঠিপত্র দেয়, তবে বৎসরান্তে ৺বিজয়ার পর একবার আসিয়া বাহির হইতেই মায়ের পদধূলি লইয়া আবার চলিয়া যায়।

ভণ্টু ও শ্যামলালের বাড়ীর নিকটে ভণ্টুর একান্ত ঐকান্তিকতায় 'ভারতী-আশ্রম' গড়িয়া উঠিয়াছে। আশ্রম গৃহে ঢুকিতেই ভণ্টুর যত্নে আঁকা ভারতীর তৈল-চিত্রখানি মর্ম্মর আসনে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভণ্টু কলিকাতায় মধ্যে মধ্যে যাওয়া আসা করে। বাহাদুর দোকান করিয়াছে। একটি ভাল রেডিও-সেট্ কিনিয়া দোকানে রাখিয়াছে। বাহাদুরকে ভণ্টু কাজ শেখায়। প্রত্যেক মাসেই বড় বড় জায়গা হইতে অয়েল পেন্টিং কি ভাল ছবি আঁকিবার অর্ডার পায় ভণ্টু। ভারতীর ছবি একটি প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান পাইয়াছিল এবং অনেকে বহুমূল্যে ক্রয় করিতে চাহিয়াছিল—ভণ্টু কিন্তু রাজী হয় নাই। উপস্থিত পয়সার কোন অভাব নাই ভণ্টুর, তবে ভারতীর আশ্রমটিকে বাড়াইবার জন্য যা' কিছু প্রয়োজন।

গুক্লার দিন ঠিক একভাবেই চলিয়া যাইতেছে। রাণীমা তো এক রকম মানুষের সঙ্গে কথা বলা ছাড়িয়া দিয়াছেন, বলিলেও হয়। ইহার

মধ্যে আবার কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া তিনি উর্ম্মির বিবাহও দিয়া দিয়াছেন। অরূপও বেশ ভালভাবে বি, এ পাস করিয়াছে। শুক্লা ও অরূপ ঠিক করিয়াছে সাম্‌নের মে মাসে তাহারা ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইবে। অরূপ বলে, প্রথমে দিন কতক সুইজারল্যাণ্ডে কাটাইয়া তাহার পর অন্যান্য দেশে যে সব দেখিবার জিনিস আছে, দেখিলেই চলিবে।

কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য্য, সেদিনকার সেই উর্ম্মি কেমন পাকা গিন্নীর মত টক্‌টকে লালপাড় শাড়ি পরিয়া সিঁথিতে জ্বল্‌জ্বলে সিঁদুর আঁকিয়া স্বামী নির্ম্মলের সেবা করিয়া যায়। শুক্লা তো হাসিয়াই অস্থির!

শুক্লাদের বাড়ীর খানকতক পরেই উর্ম্মির শ্বশুরবাড়ী। অরূপের জন্মদিন উপলক্ষে সেদিন বাড়ীতে একটু ধুমধাম ছিল। নির্ম্মল কোন কাজে বাহিরে গিয়াছিল, তাহার আসিতে দেরি হইবে। আহারের সময় সকলে একত্রে আহারে বসিল, কিন্তু উর্ম্মি বসিল না। অনেক জেদা-জেদির পর তবে শুক্লা মূল রহস্য জানিতে পারিল, নির্ম্মলের খাওয়া না হইলে উর্ম্মি খাইবে না।

শুক্লার হাসিতে বিব্রত হইয়া উর্ম্মি জবাব দিল,—বা রে, তাই নাকি খায়? স্বামীর আগে মেয়েমানুষকে খেতে নেই যে! মাকে জিজ্ঞেস কর না মশাই, মাও জানেন।

উর্ম্মির কথায় শুক্লা যেন নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইল। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্য।

—কিন্তু আজ তুমি যেতে পাবে না ডোরা, এখানে থাক্‌তে হবে—কথা কয়টি বলিয়া শুক্লা সহাস্যে উর্ম্মির মুখের দিকে চাহিল।

আঁচলের খুঁট্ আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে লজ্জানত মুখে উর্ম্মি জবাব দিল,—তা কি ক'রে হবে! আমি তো ব'লে আসিনি।

উর্ম্মিকে লইয়া শুক্লার যেন পুতুল খেলা হইয়াছে। কি মজাই না লাগে শুক্লার উর্ম্মিকে রাগাইতে।

শুক্লা বলিল,—বেশ তো, সেজন্যে তোর ভাব্‌তে হবে না—আমি ফোন্‌ করে দিচ্ছি! আর তা' ছাড়া নির্ম্মল তো আস্‌বেই একবার, তা'কেই বলে দেবো।

—না ভাই দিদি, লক্ষ্মীটি, আজ ছেড়ে দাও। অন্যদিন বরং আমি নিজেই আস্‌বো।

রাগের ভান করিয়া শুক্লা বলিল,—থাক্‌, তোমার আর দয়ায় কাজ নেই। তার চেয়ে আমার কাঞ্চীই ভাল।

দিদির ভাব দেখিয়া উর্ম্মি বিব্রত হইয়া উঠিল। কাতর কণ্ঠে বলিল,—সত্যি বিশ্বাস কর, ঠিক থাক্‌তাম দিদিভাই। কিন্তু জানো, 'ও' বলে আমি না থাক্‌লে ওর নাকি ঘুম হয় না—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই উর্ম্মি সারিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—ভারি ভীতু 'ও'! আমার সাহস খুব কিনা, তাই।

একটু থামিয়া আবার বলিল,—আমি এত বড় হয়ে গেছি, দেখ্‌লে মাষ্টার মশায়েরও খুব আনন্দ হ'তো—না দিদি ভাই?

শুক্লা কতকটা অন্যমনস্কভাবেই বলিল,—তা হতো—হয়তো। পর মুহূর্ত্তেই সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। শুক্লা চলিয়া গেলে উর্ম্মি এই ভাবিয়া দুঃখিত হইল যে মাষ্টার মশায়ের নাম করিয়া সে কি কোন অন্যায় করিয়াছে, নতুবা দিদিভাই অমনভাবে চলিয়া গেল কেন?

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নীলা কাশী গিয়াছে। সেখান হইতে শুক্লাকে চিঠিতে জানাইয়াছে,—যদি সুবিধা হয় ইউরোপ যাবার আগে যে কোন

সময় আমার সঙ্গে দেখা করো। আবার কতদিন হয় তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, সেইজন্যে তোমাকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা হয়। আমি এখন কিছু দিন এখানেই থাকবো।

বৈশাখ মাস। ইহারই মধ্যে বেশ গরম হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। কাশীতে বোধ হয় রীতিমত 'লু' চলিতেছে। কিন্তু এ' ছাড়া পিসিমণির সঙ্গে দেখা করারও আর কোন সুযোগ সুবিধা হইয়া উঠিবে কিনা, কে জানে! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শুক্লা অবশেষে যাওয়াই স্থির করিল। সঙ্গে শুধু কাঞ্চী, আর কোন লোককে সে ইচ্ছা করিয়াই সঙ্গে লইল না।

কিন্তু কাশীতে আসিয়াই শুক্লার চক্ষুস্থির! পিসিমণি চলিয়া গিয়াছেন, লোকজন কেহই নাই। দারোয়ান শুধু একখানি চিঠি দেখাইল শুক্লাকে। পিসিমণির শ্বশুর মারা গিয়াছেন, সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাহাকে যাইতে হইয়াছে। দারোয়ানকে বলা ছিল, যদি শুক্লা আসে, তবে চিঠিখানা যেন তাহাকে দেয়।

শুক্লার এতখানি জীবনে আজ এই প্রথম সে নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করিল। একটা ঝি চাকর পর্য্যন্ত সঙ্গে না আনিয়া কি বোকামিই না সে করিয়াছে! নিজের মনে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগিল শুক্লা। তাহা ছাড়া ট্রেন জার্নিতে শরীরের অবস্থা এমন, যে কাল্‌কের ট্রেনেই যে রওনা হইবে সে কথাও ভাবিতে তাহার ভয় করে।

বিশ্বনাথের দুয়ারে আসিলে মানুষের সকল দুঃখের—সকল কামনার ...কি অবসান হয়। শুক্লা ভাবে—তাই কি? কিন্তু কে এ প্রশ্নের ...াব দেবে! উদাস চোখে বাহিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শুক্লা

ভাবে—তাহার মনেও কি কোন কামনা বাসা বাঁধে নাই কখনো। হঠাৎ শিহরিয়া উঠে শুক্লা! একি! কি কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল আজ! কি ভাবিতে কি ভাবিয়া বসিল শুক্লা! রাজকুমারী শুক্লার দুর্জয় অভিমানের পাষাণদুর্গ আজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে নাকি! আজ অকারণে মনের এই অবাধ্যতার কথা ভাবিয়া শুক্লার যেন হাসি পাইল।

অসহ্য গরমের হল্‌কা আসিয়া গায়ে বেঁধে। ভাবিল কোনও রকমে রাত্‌টা অন্ততঃ কাটাইতে পারিলে কালই না হয় ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু মনের ইচ্ছা তাহার মনেই থাকিল। সেই রাত্রেই শুক্লা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল।

'ভারতী আশ্রম' বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। অনেক অনাথ অসহায় ছেলেমেয়ে বেশ সম্মানের সঙ্গে মানুষ হইতেছে সেখানে। সংসারের পরিত্যক্তা নারী এবং নামগোত্রহীন শিশুদের জন্য আশ্রমের দুয়ার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। রমা নিজে ইহাদের দেখাশুনা করে। রমা ও ভণ্টুর সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। দুই ভাই বোনে ভারতীর অপূর্ণ কামনার বোঝা মাথায় লইয়া আত্মপ্রসাদের অপূর্ব্ব গরিমায় আত্মহারা!

অনুপম কলেজের ভার লইয়াছে বিনোদ নিজে। সেও এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। রমার মনের খুশি যেন উপ্‌চিয়া পড়ে। সে ভাবে—এত আশা, এত আনন্দ ছিল কোথায়! এক একবার তাহার মনে হয়, অভাগী ভারতীর মরিয়াও এত সুখ! রমার চক্ষু দু'টি অশ্রুসজল হইয়া উঠে,—পোড়ারমুখী খুব জব্দ ক'রে পালালো।

স্বপন ও খোকন পাশাপাশি বড় হইয়া উঠিতেছে। শ্যামদা একখানা চিঠিতে ভণ্টুকে জানাইয়াছেন, এলাহাবাদ মঠে তাঁহার গুরুদেব অবস্থান করিতেছেন। যদি ভণ্টু সময় করিয়া মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য একবার

দেখা করিয়া যায়, তবে খুব ভাল হয়। গুরুদেবের একখানা ছবি আঁকার দরকার।

রমা ও বিনোদের উপর সকল ভার ছাড়িয়া দিয়া ভণ্টু এলাহাবাদ গিয়াছিল। সেখানে কিছুদিন লাগিল ছবি আঁকায়। তারপর এলাহাবাদ হইয়া দুই একদিন এদিক সেদিক ঘুরিয়া একেবারে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত। ভণ্টুর ইচ্ছা, বাড়ী ফিরিবার পথে একবার বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া কাশী সেবাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সচ্চিদানন্দ স্বামী—ভণ্টুর পূর্ব্বপরিচিত। তাহার বিবাগী মনে আজ বৈরাগ্যের ছোঁয়া লাগিয়াছে। তাই স্বামীজীর শুভ আশীর্ব্বাদের জন্যও ভণ্টুর অন্তরিন্দ্রিয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কাশীতে ব্যাপক আকারে বসন্ত দেখা দিয়াছে। কাশী সেবাসঙ্ঘের লোকেদের মধ্যে সর্ব্বদাই যেন একটা ব্যস্ততার ভাব, তাহারা সকলেই দুর্গত পীড়িতদের শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তিক্ত মধ্যাহ্ন অসহিষ্ণু হইয়া ফাটিয়া পড়িবার উপক্রমে গুমরাইয়া উঠিতেছে। সূর্য্য যেন ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপের বহ্নি ছুড়িয়া মারিতেছে ধরণীর উপর। সেবা-সঙ্ঘের কেহই আশ্রমে নাই, সকলেই সেবাকার্য্যে বাহির হইয়া গিয়াছে। কুটীরের মধ্যে কেবল স্বামীজী ও ভণ্টু দুইখানি পৃথক্ আসনে বসিয়া বাক্যালাপে রত।

ভণ্টুকে দেখিলে মনে হয়, সে যেন বিশেষভাবে চিন্তামগ্ন। কিছুক্ষণ আত্মসমাহিত থাকার পর স্বামীজী বলিলেন—'না বাবা, সন্ন্যাস তোমার নয়।'

ঈষৎ প্রতিবাদের সুরে ভণ্টু বলিল,—কিন্তু, আমি যে মন স্থির করে' ফেলেছি। আর তা' ছাড়া—

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীজী ভণ্টুর দিকে চাহিলেন।

ভণ্টু বলিল,—তা' ছাড়া, সংসারে আমার কোন অবলম্বনই তো নেই। আমার ইচ্ছা, আতুর অসহায়ের সেবায় আমি আমার বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো', প্রভু।

মৃদু হাসিয়া স্বামীজী উত্তর দিলেন,—তা' হয় না, বাবা। তুমি সংসারকে না চাইলেও সংসার যে তোমাকে তোমার অলক্ষ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি তোমার অদৃষ্টচক্র ফেরাতে চাও কোন শক্তিতে? বিশেষ করে' সেবা ধর্ম্ম তো সন্ন্যাসের অঙ্গ নয়।

ভণ্টু কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কে একজন খবর দিয়া গেল বাঙ্গালীটোলায় এক ভদ্রমহিলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার সেবার কেহই নাই। স্বামীজী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলে ভণ্টু নিজেই এই সেবার ভার লইতে প্রস্তুত হইল এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া ও বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া অবিলম্বে বাহির হইয়া গেল।

অল্প সন্ধানেই বাড়ী মিলিয়া গেল। বিরাট অট্টালিকা। ভণ্টু দ্বিধাভরে উন্মুক্ত দরজার ভিতরে উকি দিয়া চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। এত বড় বাড়ী—সব ফাঁকা, কেমন যেন একটা থম্‌থমে নিস্তব্ধ ভাব!

ভণ্টু কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

সামনেই হলঘর। তাহার পরেই একটি কক্ষে বিছানার উপর কে যেন শুইয়া আছে। আর বিছানার পাশেই—ভণ্টু চম্‌কিয়া উঠিল। কে ও। ভণ্টু ভাবিল সে কোথায় আসিয়াছে। কিন্তু এও কি সম্ভব। তাহার মুখ মড়ার মত সাদা হইয়া গেল।

বিছানার পাশে বসিয়াছিল কাঞ্চী। শুক্লাকে জল খাওয়াইবার জন্য হাত বাড়াইয়া কাঁচের গেলাসটা লইবা মাত্র কাঞ্চী দেখিতে পাইল ভণ্টুকে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল আর সেই মুহূর্ত্তে হাত হইতে গেলাসটা সশব্দে মেজেতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল।

ভণ্টু ডাকিল,—কাঞ্চী।

ভণ্টুর ডাকে কাঞ্চী ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—

মাষ্টারবাবু! আপনি এখানে কি করে' এলেন মাষ্টারবাবু!

ভণ্টু ব্যগ্রভাবে বলিল,—সে সব কথা পরে হবে, এখন ব্যাপার কি বলতো?

কাঞ্চী জবাব দিল,—ভগবান্ আপনাকে খুব সময়ে আনিয়েছেন মাষ্টারবাবু। দিদিসাহেবা তো প্রলাপের ঘোরে আপনারি খোঁজ কর্‌ছিল শুধু।

দিদিসাহেবা! শুক্লা! ঘরে ঢুকিতে গিয়া ভণ্টু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কি অসুখ শুক্লার?

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কাঞ্চীর দিকে চাহিল ভণ্টু।

কাঞ্চী বলিল,—দিদিসাহেবার আজ তিন দিন খুব জ্বর, ক্রমাগত ভুল বক্‌ছে, আর গা' ময় বসন্তের গুটি বেরিয়েছে। আমি একা, আর কেউ নেই। দারোয়ানটা পর্য্যন্ত ভয়ে পালিয়েছে। দিদিসাহেবাকে একা রেখে কোথাও যেতে পারিনি মাষ্টারবাবু। বাড়ীতে একটা খবরও দিতে পারিনি। এখন আপনি এসেছেন, যা' কর্‌তে হয় করুন।

কিন্তু কি করিবে ভণ্টু, তাহা তো সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। নিরালা ঘরে একাটি বসিয়া রাজকুমারী শুক্লার

পরিচর্য্যা করা—অদৃষ্টের এ যে কি নিষ্ঠুর পরিহাস, ভণ্টুর অন্তর-দেবতাই তাহা জানেন।

ভণ্টু একবার ভাবিল, ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু—মনুষ্যত্বের—এই অবমাননায় তাহার বিবেক সায় দিতে চাহিল না। সে যে সেবাব্রতী—সেবাই যে তাহার জীবনমরণের সাধনা। সে তো শুধু সেবা করিতে আসিয়াছে, নিষ্কাম ভাবে সেই সেবাই সে করিয়া যাইবে, তবে কেন এ দুর্ব্বলতা তাহার।

কাঞ্চী ডাকিল—মাষ্টারবাবু!

কাঞ্চীর মুখের পানে অর্থহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ভণ্টু বলিল,—চল।

ভণ্টু ধীরে ধীরে গিয়া দাঁড়াইল শুক্লার রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে। রাজকুমারী শুক্লা! তাহার এই পরিণাম! শুক্লার সংজ্ঞাহারা বিবশ দেহ ফুলিয়া উঠিয়াছে, সারা অঙ্গে ছড়ানো ছোট ছোট ফোস্কাগুলি—মুক্তার মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। ভণ্টু শুক্লার উত্তপ্ত ললাটে তাহার হাতখানি রাখিয়া বুঝিল জ্বর তখনো প্রবল। ভণ্টু দেখিল শুক্লার রোগপাণ্ডুর মুখে স্পষ্ট বেদনার চিহ্ন। কাঞ্চীর একার সাধ্য ছিলনা শুক্লার এই অবস্থায় তাহাকে সামলানো। বিলাসিনী শুক্লার সযত্ন সংবদ্ধ কুঞ্চিত এলানো বেণীটি ধূলায় লুটাইতেছে, ভণ্টু তাহা সাবধানে তুলিয়া ধরিয়া বিছানার এক পার্শ্বে রাখিয়া দিল।

ভণ্টু ভাবে, কেন এমন হইল! সে তো মনের মাঝে ভুলিয়াও শুক্লার অমঙ্গল কামনা করে নাই। শুক্লা আবাল্য রাজ-ঐশ্বর্য্যে পালিত, তাহাতে ভণ্টুর তৃপ্তি ছিল। মুখ ফুটিয়া সে কোনদিন কাহারো কাছে নিজের ব্যর্থতার অভিযোগ করে নাই, মনের অন্তস্তলেও তো সে কোন কিছুর প্রত্যাশা রাখে নাই—শুধু চাহিয়াছে শুক্লা সুখে থাক!

শুক্লাকে এত কাছে নিবিড়-ভাবে পাইয়া ভণ্টুর মনের ছদ্ম যবনিকা খসিয়া পড়িল। ভণ্টু দেখিল শুক্লার ঐ সুন্দর মুখ, ঐ এলানো বেণী আজও যে সে তাহার অন্তরপটে আঁকিয়া রাখিয়াছে। সে বেশ বুঝিতে পারিল শুক্লাকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়া সে কেবল নিজেকেই বঞ্চনা করিয়াছে। শুক্লার ঐশ্বর্য্য তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহার দৈন্য তাহাকে কাছে টানিতে লাগিল।

কাঞ্চীকে ভাল করিয়া ঘরদোর পরিষ্কার করিতে বলিয়া ভণ্টু গিয়াছিল রাণীমাকে 'তার' করিতে। ফিরিয়া আসিয়া হাসিমুখে কাঞ্চীকে বলিল—যাক্ এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কাঞ্চী বলিল,—কি মাষ্টারবাবু!

—তোমার দিদি সাহেবার মাকে 'তার' করে এলাম, কাঞ্চী!

ভণ্টুর কথায় কাঞ্চী বিশেষ ভরসা পাইল না। তাহার ভাবনা বর্ত্তমানের। ভণ্টু আশ্বাস দিল, কাঞ্চী তুমি ভয় পেয়োনা আমি তো রয়েছি, তা'ছাড়া মাও নিশ্চয় দু'একদিনের মধ্যে এসে পড়্বেন। কিন্তু রাণীমা আসিলেন না। প্রত্যুত্তরে তিনি ভণ্টুকে 'তার' করিয়া জানাইলেন তুমি যখন ওখানে রয়েছ, তখন আমার যাবার কোন প্রয়োজন দেখিনা। ওর চিকিৎসার জন্যে দু'শো টাকা পাঠিয়ে দিলুম, পরে আরও পাঠাবো। আজ আমার যাওয়ার চেয়ে ওর পাশে তোমারই থাকার প্রয়োজন বেশী। হয়তো ভগবানেরই তাই ইচ্ছে, তা' না হ'লে আজ তিনি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন কেন? আমি আশীর্ব্বাদ করি সে যেন ভাল হ'য়ে ওঠে আর দুঃখের ভেতর দিয়ে তোমাকে চিন্‌তে পারে।

ভণ্টু রাণীমার জবাব পাইয়া বুঝিতে পারিল যে—কি গভীর বেদনা বুকে চাপিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ কল্যাণ কামনার অভিপ্রায়েই তিনি এমন সঙ্কট মুহূর্ত্তেও ছুটিয়া আসিলেন না।

আজ বড় বেশি করিয়া মনে পড়িতে লাগিল ভারতীর কথা—ভারতীর নিষ্পাপ মনের সরল আশীর্ব্বাদ। মৃত্যুকালে ভারতী বলিয়া গিয়াছে—'সেই শুভদিনটির আশায় আমার আত্মা প্রতীক্ষা করে' থাকবে।' ভণ্টুর চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া আসিল।

ভণ্টু চাহিল শুক্লার রোগক্লিষ্ট মুখের পানে। কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন তাহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইতেছে। ভণ্টুর হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। না, এ ভাবে সে শুক্লাকে যাইতে দিবে না—কখনোই না।

এক এক সময়ে কি এক বিভীষিকা দেখিয়া শুক্লা শিহরিয়া উঠিতেছে। ভণ্টুর মনে হয় মৃত্যু যেন শুক্লার শিয়রে বসিয়া ভয়াল ভ্রূকুটি হানিতেছে, অমনি সে ব্যস্ত হইয়া তাহার দু'টি বাহুডোরে শুক্লাকে আগ্‌লাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। মৃত্যুকে সে পরাস্ত করিবে। শিবের রাজ্যে বাস করিয়া ভণ্টু বড় আশায় বুক বাঁধিয়া শুক্লার আড়ষ্ট শির কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। এমনি ভাবেই বোধ হয় দেবাদিদেব মহাদেব—সব কিছু পিছনে ফেলিয়া সতীর প্রাণহীন দেহ বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

আজ পাঁচদিন পাঁচ রাত ধরিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভণ্টু একভাবে যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে—এই আশায় যদি শুক্লাকে মৃত্যুর দুয়ার হইতেও ফিরাইয়া আনিতে পারে।

কিন্তু শুক্লা যদি নাই ফেরে? তবে কি সে বৃথাই জীবনের যত গ্লানি, যত পরাজয় বহিয়া মরিবে? আজ শুক্লার কেহ নাই। জীবনে যাহারা তাহার আত্মীয় বন্ধু ছিল, আজ তাহারা কোথায়? আজ যে শুক্লার কেহ নাই, তাহার নিজেরও আজ কাহাকেও প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন শুধু ভণ্টুকে, তাই তো সে বিধাতার ইঙ্গিতে এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

সহসা ভণ্টুর শীতল করস্পর্শে শুক্লার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মুদিত চক্ষে শুক্লা প্রশ্ন করিল,—কে তুমি? কে আমায় এত যত্ন ক'রছো?

ভণ্টু কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। কত কথা—একে একে ভণ্টুর মনে জমাট বাঁধিতে লাগিল। মনে পড়িল, দর্পিতা অভিমানিনী রাজকুমারী শুক্লা কোনদিনই তো তাহাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করে নাই। তবে কোন্ অধিকারে সে—

ভণ্টুর আহত অভিমান রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শুক্লার যে কমনীয় প্রতিচ্ছবি তাহার মনের দর্পণে ভাসিয়া উঠিতেছিল, তাহা শুধু ক্ষণিকের জন্য তরঙ্গিত হইয়াই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথায় কোন্ অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল।

শুক্লা ক্ষীণকণ্ঠে আবার বলিল,—কে তুমি, বল্‌লে না তো?

গম্ভীরকণ্ঠে ভণ্টু উত্তর দিল,—আমি ভণ্টু। তোমার অসুখের খবর পেয়ে শুশ্রূষা করতে এসেছি। বাড়ীতেও তোমার মায়ের কাছে 'তার' করেছি, রাজকুমারী।

ম্লান হাসিয়া শুক্লা বলিল,—ওঃ, এখনো অভিমান!—যাক তুমি তা' হ'লে এসেছ—আঃ!

শুক্লা পরমতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—কিন্তু 'তার' আবার কেন? তার তো কোন দরকার ছিল না।

ভণ্টু চুপ করিয়া রহিল।

শুক্লা বলিল,—আচ্ছা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করবো?

প্রত্যুত্তরে ভণ্টু বলিল,—তুমি অসুস্থ। আজ আর বেশী কথা নাই বা বল্‌লে।

শুক্লা বলিল,—না না, আর আমার কোন অসুখ নেই! তুমি দেখো, এবার থেকে আমি ভাল হয়ে উঠ্‌বো।

ভণ্টু বলিল,—বেশ, কি বল্‌তে চাও বলো।

ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া শুক্লা বলিয়া গেল,—আমি তোমার ওপর যে ব্যবহার করে' এসেছি, তার পরে আর তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌তে পারো না, না?

ভণ্টু কি বলিতে গেল. কিন্তু বাধা দিয়া শুক্লা বলিল,—দাঁড়াও, আমাকে সব কথা বল্‌তে দাও আগে। একটু থামিয়া আবার বলিল,—বিয়ের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত্তে আমার মনের মধ্যে কি ঝড় বয়ে গেছে—সে কথা তুমি জাননা। অহরহ মনে মনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে' আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি—তবু তোমাকে কোনদিনও ভুল্‌তে পারি নি। তবে এ আশা আমার চিরকাল ছিল—একদিন আমি জয়ী হবো, তোমাকে আবার ফিরে পাবো। এইবার বল, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ।

ভণ্টু যেন শুক্লার প্রত্যেকটি কথা—ওজন করিয়া দেখিতেছিল। প্রত্যুত্তরে অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে ভণ্টু বলিল,—ক্ষমা তোমাকে আমি অনেক আগেই করেছি শুক্লা। আর সত্যি দেখ্‌তে গেলে তোমার তো কোন দোষই ছিল না। আমি চিরকাল জান্‌তাম্‌, এখনও জানি—আমি সর্ব্বরকমে তোমার অযোগ্য, সুতরাং তুমি যদি আমায় স্বামী বলে গ্রহণ করতে না পেরে থাক, তবে সে দোষ তো তোমার নয়।

ব্যস্ত হইয়া শুক্লা বলিল,—দোহাই তোমার—আর ও কথা বলো না। মেয়েমানুষের ও কথা শোনাও পাপ। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও তো খুবই হলো। ভুল যদি আমি করেছিলাম তবে তোমার স্বামীর দাবি নিয়ে জোর করে' কেন সে ভুল আমার ভেঙে দিলেনা?

ভণ্টু বলিল, কিন্তু আমি তো আর সংসারে ফির্‌বো না শুক্লা। সংসারের কথা ভাব্‌লে মনে হয়, সে যদি আবার আমার সঙ্গে প্রতারণা করে!

শুক্লা অশ্রুসিক্ত চ'ক্ষে জানালার বাহিরে দূর আকাশের দিকে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল! পরে বলিল, তাহ'লে কি ক'রবে?

"আমি সেবা ক'রবার ভার নিয়ে বেরিয়েছি শুক্লা। বউদির নামে আশ্রম গ'ড়েছি—সেইটিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে আমায়।"

শুক্লা ম্লানমুখে ভণ্টুর দিকে চাহিয়া অসহায়ের মত বলিয়া উঠিল, সেখানে কি আমার জন্যে এতটুকু জায়গা তুমি দিতে পারবেনা?

শুক্লার মুখের দিকে চাহিয়া ভণ্টু আর 'না' বলিতে পারিল না। বলিল, পারবো, কিন্তু তুমি কি অত কষ্ট সহ্য ক'রতে পার্‌বে শুক্লা!"

শুক্লার অধরে একটু ম্লান-হাসি ফুটিয়া উঠিল। বহুক্ষণ এইরূপ কথাবার্তা কহিতে কহিতে সে ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "না পারি তাড়িয়ে দিও!"

ভণ্টু শুক্লার কথা শুনিয়া বেদনাহত হইয়া উঠিল। অসীম সহানুভূতি লইয়া সে শুক্লার শয্যাপার্শ্বে গিয়া তাহার হাতদুটি চাপিয়া বলিল, তোমাকে কি আমি কোনদিন ফেল্‌তে পারি শুক্লা! তুমি জাননা, বউদি তোমায় কি ভালবাসতো। যাবার সময়ও তিনি বলে গেছেন যে, "এই শুভদিনটির জন্যে তাঁ'র আত্মা প্রতীক্ষা করে' থাক্‌বে।"

শুক্লা ও ভণ্টুর চোখ ভরিয়া জল আসিল; বহুক্ষণ উভয়ে মৌন হইয়া রহিল। মনে হইল ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে সেই মহিমময়ীর আত্মা যেন সত্যই ঘরের মধ্যে নামিয়া আসিতেছে।

দরজার বাহিরে স্পষ্ট কাহার তনুর ছায়া দেখা গেল।

উত্তরে বিস্মিত হইয়া সেইদিকে চাহিতেই দেখিল রাণীমা কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পিছনে অরূপ দাঁড়াইয়া।

ভণ্টু সচকিত হইয়া শুক্লার হাত ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উঠিয়া গেল।

রাণীমা নীরবে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শেষ